দীপপুঞ্জ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

পুস্তকালয়

২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা

সুসাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ

বন্ধুবরেষু

দেশ পত্রিকায় **'হরিবংশ'** নামে যে উপন্যাস বেরিয়েছিল
তাই বহু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে বর্তমানে
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল।

দীপপুঞ্জ

নোট আর কাঁচা টাকায় ভরতি পাটের থলেটা সাবধানে কোমরের নীচে গুঁজে সুবল কেবল বারাণ্ডা থেকে উঠানে নেমেছে আর ও-বাড়ির বুড়ো নবদ্বীপ অনুনাসিক সুরে খেদ করতে করতে এসে উপস্থিত, 'ও বাবা সুবল, তোরা থাকতে এর কি কোন বিচার হবে না? অতবড় সোমত্ত ছেলে কেবল বসে বসে খাবে আর ঝগড়া করবে?'

সুবল ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিরক্ত মুখে বলল, 'বাজারের যে বেলা হয়ে গেছে জ্যেঠামশাই।'

বুড়ো নবদ্বীপ কিন্তু পথ আগলেই রইল, বলল, 'বাজারে তো বাবা আমিও যাব, তার আগে তুই একবার চল, দেখে আয় কাণ্ডটা।'

বিষয়টা অবশ্য কৌতুকের। নবদ্বীপের ছেলে মুরলী নবদ্বীপকে মানছে না। নবদ্বীপ পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে ধনী, সমাজের একজন মোড়ল। তার দুর্বৃত্ত ছেলে তাকে গ্রাহ্য করছে না। আর এতলোক থাকতে নবদ্বীপ এসেছে সুবলের কাছে, সমাজে আজও যার কোন প্রতিষ্ঠা হয়নি, গঞ্জে খোলা জায়গায় চট পেতে বসে এখনও যাকে হলুদ আর শুকনো লঙ্কা বিক্রি করতে হয়। মনে মনে রীতিমত আত্মপ্রসাদ অনুভব করল সুবল। অর্থই সব নয়, সহস্র গুণ ধনী হয়েও নবদ্বীপ তার বুদ্ধিকে স্বীকার না করে পারছেনা। মঙ্গলা অবশ্য বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। মেয়ে মানুষ এ সব জিনিষ তার বোঝবার কথা নয়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ যারা তাড়ায় তারাই জানে এতে কি উত্তেজনা, কি আত্মগৌরব। খোরাকটা চিরকাল লোকে

ঘরেই খায়, কিন্তু বীরত্ব আর পুরুষত্ব দেখাতে হয় বনের মোষ তাড়িয়েই।

ঘরের ভিতর ঘন ঘন চুড়ির শব্দে বিরক্ত হয়ে সুবল নবদ্বীপকে বলল, 'আচ্ছা জ্যেঠামশাই, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি এলাম বলে।' তার পর ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে গিয়ে সুবল ধমক দিল, 'কি, অত চুড়ি বাজাচ্ছিলে কেন?'

মঙ্গলা বলল, 'কি আবার। ওই বুড়োর প্যানপ্যান্যানি শুনবার জন্ত তুমি কি বেলা দুপুর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি। বাপ-বেটার যা করে করুক সে কথা তুমি শুনে কি করবে।'

মঙ্গলার এই কর্তৃত্বের ভঙ্গী সুবলের ভারি দুঃসহ লাগে। বউকে যত সে চেপে রাখতে চায়, তত সে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লম্বায় চওড়ায় সুবলকে সে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে যেন তার ধারণা, ক্ষমতায়ও সে ছাড়িয়ে যাবে স্বামীকে!

সুবল ধমকের সুরে বলল 'কি করব না করব তা কি তোমার কাছে শুনতে হবে?'

মঙ্গলা জবাব দিল, 'আমার কথা যখন না শোন, তখনই তো ঠকো। কি দরকার আমাদের বাপ-বেটার বিবাদের মধ্যে যাবার? তোমার জ্যেঠার ছেলে তো আস্ত একটা গুণ্ডা, যত গুণ্ডা আর বদমাসের দল তার পিছনে পিছনে ফেরে। যদি রাতে বিরাতে এক ঘা দিয়ে বসে তখন কি হবে।'

সুবলের পৌরুষে ঘা দিয়ে কথা বলতে বেশ ভালবাসে মঙ্গলা। আর সুবলের হাত নিষপিস করতে থাকে, ইচ্ছা হয় দেয় এক ঘা বসিয়ে। কিন্তু সব সময়ে তেমন সুযোগ হয়ে ওঠে না। নবদ্বীপ ঘন ঘন কাসছে। সুবল সাড়া দিয়ে বলে, 'যাচ্ছি জ্যেঠামশায়।'

সুবল বাইরে এলে নবদ্বীপ বলে 'কি ঠিক করলে বাবা। তোমরা

দশজন থাকতে ও এমন অনাচার কদাচার করবে, বুড়ো বাপকে ধরে ধরে মারবে, এর কোন বিচার তোমরা করবে না?'

সুবল মনে মনে গর্ব বোধ করে। এক অসহায় অথর্ব বৃদ্ধ তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছে,সুবিচার প্রার্থনা করছে। দুর্বৃত্ত পুত্রের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করতে হবে। মঙ্গলা তাকে মানতে না চাইলে হবে কি, সমাজে ক্রমেই সম্মান আর প্রতিষ্ঠা বাড়ছে সুবলের। সরিকী ঝগড়া-বিবাদ মিটাতে সালিশ হিসাবে বুড়োদের সঙ্গে সুবলেরও ডাক পড়ে আজকাল। সামাজিক দলাদলি, দরবারের বৈঠক সুবলকে না হ'লে চলে না; বিয়েতে, শ্রাদ্ধে লোকজন খাওয়াবার সময় জিনিষ-পত্রের অমন ঠিক ঠিক তায়দাদ করতে বুড়োরাও পারে না। চতুর, বুদ্ধিমান হিসাবে ক্রমেই নাম ছড়িয়ে পড়ছে সুবলের। কেবল মঙ্গলাই যেন তা স্বীকার করতে চায় না। না করে না করল, তাতে কিছু এসে যাবে না সুবলের। আর সবাই তো মানে। এই নবদ্বীপ সা সুবলের চেয়ে লক্ষগুণ যে ধনী, যার জোতজমি আছে, মান সম্মান, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির যার তুলনা নেই সেও এসে সুবলের শরণ নিয়েছে, সালিশ মেনেছে, বিচার করতে ডাকছে সুবলকে।

নবদ্বীপ বলল, 'চল বাবা, তুই ওর কাছ থেকে স্পষ্ট শুনে যা —ও চায় কি, ওর মতলবটা কি আসলে। ও কি চায় যে ওকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করি? কথাটা তুই ওর কাছ থেকে শুনে যা বাবা।'

সুবল সান্ত্বনার সুরে বলে, অত হতাশ হচ্ছেন কেন জ্যেঠামশায়, চিরকাল কি আর মানুষ একরকম থাকে, একদিন না একদিন শোধরাবেই।'

নবদ্বীপ উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়, 'শোধরাবে! শোধরাবে কি আর আমি মলে? ওর নিজের বয়সই কি কম হল নাকি? চল্লিশের

কাছাকাছি গেল না? মেয়ের বয়সই তো হোল বার তের বছর। অত বড় মেয়ের সামনে ও যা সব কেলঙ্কারি করে, লজ্জায় আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে বাবা।'

নবদ্বীপের বড় টিনের ঘরটা ভেঙে রাজমিস্ত্রীরা পাকা কোঠা তৈরী করছে। বাড়িতে ঢুকে সেই দিকেই আগে চোখ পড়ল সুবলের। এসব দেখলে অবশ্য কারো মনে করা শক্ত যে, নবদ্বীপের চিত্তে একটুও সুখ নেই; আর ছেলের দুর্ব্যবহারে তার মুহুর্মুহু গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু নবদ্বীপ তেমনি সখেদে বলে যেতে থাকে, 'কিছু দণ্ড ছিল, কিছু দেনা ছিলাম রাজ-মিস্ত্রীদের কাছে আর জন্মে, তাই এসব করবার দুর্বুদ্ধি হয়েছে। নইলে আমি কি বুঝতে পাচ্ছি না যে চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা ইটও দালানের থাকবে না, সব ও ওড়াবে। আমি কিন্তু ঠিক ক'রে রেখেছি সুবল, একটা কাণাকড়িও ওকে আমি দিয়ে যাব না। বাড়িঘর বিষয়সম্পত্তি সব আমি কোন সৎকাজে দান ক'রে যাব, পরকালের কাজ হবে তাতে।'

পূবের ভিটেয় আর দক্ষিণের ভিটেয় ছোট ছোট দুখানা টিনের ঘর। যে ঘরটা ভেঙে দালান হচ্ছে তার সমস্ত জিনিষপত্র এনে এই দু'ঘরে ঠাসা হয়েছে। পূবের ঘরই সবচেয়ে বেশী বোঝাই হয়েছে জিনিষপত্রে। বাকি যে স্থানটুকু আছে দক্ষিণ দিকে সেখানে ছোট একটা তক্তপোষ পাতা নবদ্বীপের জন্য। মাদুরটা শুধু এখন পাতা রয়েছে, বিছানাটা সযত্নে একধারে গুটানো। তক্তপোষের নীচে নবদ্বীপের তামাক খাবার সরঞ্জাম। ঘরে ঢুকে নবদ্বীপ নিজেই তামাক সাজতে বসল। সুবলের দিকে তাকিয়ে দক্ষিণের ঘরের দিকে ইসারা ক'রে বলল, 'দেখ গিয়ে ও ঘরে ইঞ্জিচেয়ারে

হেলান দিয়ে বাবুর নভেল পড়া হচ্ছে, আর ওই বয়স্থা মেয়েটার সামনে বউর সঙ্গে এই দিনের বেলায় কষ্টি-নষ্টি করছে। যত অনাচার কদাচার—দুচোখে যা দেখতে পারিনে তাই। আরে হারামজাদা, বউকে অতই যদি ভালোবাসিস, তবে অস্থানে কুস্থানে গিয়ে এত কেলেঙ্কারি করিস কেন! কেন আমার টাকার এমন সর্বনাশ করিস! বউটাও দিনের পর দিন এমন ভালোমানষেতি আর ঠ্যাকারেপনা করে যে, দেখে আমার পায়ের তলা জলে যায়। যত বয়স হচ্ছে তত যেন ওদের ঠ্যাকার বাড়ছে। ইচ্ছা করলে ওই বউ-ই কি ওকে ফেরাতে পারতো না, স্বভাব জোর করে বদলাতে পারতো না ওর? তোর [illegible] মরে বেঁচেছে, আমি বুড়ো মানুষ আমি আর কি করব বল, লজ্জা হয়। তোর বউর মত অমন শক্ত জবরদস্ত মেয়েমানুষ যদি হ'ত আমার পুতের বউ তাহলে কি ছেলে আমার এমন বয়ে যেতে পারে?'

কথাটা কেমন যেন কানে এসে খট্ করে বাজল সুবলের। তার স্ত্রী যে বেশ শক্ত মেয়েমানুষ, একথা পাড়ায় আর কারো জানতে বাকি নেই। একথা নিয়ে পাড়ায় বোধ হয় খুব আলোচনাও চলে। সুবলের কেন যেন মনে হয়—শক্ত আর বুদ্ধিমতী স্ত্রী থাকা সত্যি সত্যি খুব গর্বের কথা নয়। স্ত্রীর প্রশংসার মধ্যে যেন নিজের নিন্দা প্রচ্ছন্ন থাকে। সুবলের মনে ভয় হয় মাঝে মাঝে, তার সম্বন্ধে লোকে কি মনে করে? তারা কি সন্দেহ করে যে সুবলের বুদ্ধি মঙ্গলার কাছ থেকেই ধার করা? স্ত্রীর সুখ্যাতি যে বোকার মত কেন মানুষ কামনা করে সুবল তা বুঝে উঠতে পারে না। স্বামীর গৌরবে স্ত্রীর গৌরব বটে, কিন্তু স্ত্রীর গৌরবে স্বামীর গৌরব বাড়ে না। নমঙ্গলার খ্যাতির কথা শুনে ভয় হয় সুবলের, ঈর্ষায় মুখ তার কালো হয়ে যায়। এর চেয়ে একজন রোগাটে আর বোকা স্ত্রী

যদি থাকত সুবলের, তাহলে যেন সে বেশী সুখী হ'ত, সমাজের কাছে আরো মান থাকত তার।

নবদ্বীপ এতক্ষণ অনন্যচিত্তে হুঁকো টানছিল তামাকটা ভালো করে ধরিয়ে নেওয়ার জন্য; আগুনটা কলকির ওপর দপ করে জ্বলে উঠতেই আস্তে আস্তে কয়েকটা টান দিয়ে হুঁকোটা নবদ্বীপ সুবলের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'রেখে দাও সুবল,'

সুবল বারাণ্ডায় হুঁকো রাখতে চলে গেল।

বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে সুবল হুঁকো টানছে—ও-ঘরের জানালা দিয়ে দৃশ্যটা চোখে পড়তেই মুরলী সোল্লাসে বলে উঠল, 'আরে সুবলদা যে! কি ছাই বাজে তামাক টানছ বসে বসে, ভালো সিগারেট আছে, এস, এস।'

থামে হুঁকোটা ঠেস দিয়ে রেখে সুবল যেতে যেতে বলল, 'আসছি।'

মুরলী বাড়িতেও বেশ সেজেগুজেই থাকে। পরিষ্কার মিহি একখানা ধুতি তার পরণে, দামী টুইলের একটা হাফ-সার্ট গায়ে, দেখে মনে হয় এইমাত্র তার ইস্ত্রি ভেঙেছে। দাড়ির একটু অঙ্কুরও দেখা যায় না তার মুখে। নিজে প্রত্যেক দিন সে ক্ষৌরি হয়, তারপর দামী স্নো মাখে। দেখে মনে হয়—সব সময়েই শরীরকে সে প্রসাধনের ওপর রেখেছে। একেবারে কলকাতার ফিটবাবু। এত পরিষ্কার জামা-কাপড় বাইরে বেরুবার সময়ও জোটে না সুবলের। শুধু সুবলের কেন, পাড়ার আর কারই-বা জোটে!

সুবল ঘরে ঢুকতেই মুরলী একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সুবলকে, 'এস এস সুবলদা।'

নিজের অপরিচ্ছন্নতায় সুবল অস্বস্তি বোধ না করে পারছে না। ওর কাছে আসতে না আসতেই যেন ছোট হয়ে গেছে সুবল। আর যাই হোক, কলকাতায় ঘোরাঘুরি করে বড়লোকি

চালটা বেশ শিখেছে। চিটা গুড়ের হাঁড়ি বয়ে বয়ে নবদ্বীপের মাথায় টাক পড়ে গেছে বলে মুরলী যে লম্বা লম্বা চুল পিছনের দিকে উল্টিয়ে রাখবে না তার কি মানে আছে। সুবলের মনে হ'ল, মুরলীর এই বিলাসিতায় নবদ্বীপেরও যেন গোপন প্রশ্রয় আছে, না হলে নবদ্বীপের নিজের রোজগারেরই তো সব টাকা, মুরলী তো এক পয়সাও আয় করে না, বাপের কারবার আজও তো সে মন দিয়ে দেখে না, তবু কেন নবদ্বীপ তাকে এমন করে টাকা নষ্ট করতে দিচ্ছে! কষ্ট হয়ত নবদ্বীপ পায় টাকাগুলির এমন অপব্যয় হওয়ার জন্য, কিন্তু এক ধরণের আনন্দও হয়ত অনুভব করে নবদ্বীপ। বুড়ো-বয়সে দশজনের সামনে বাবুগিরি করতে নিজে তো আর নবদ্বীপ পারে না; কিন্তু মুরলীর পারতে কোন বাধা নেই। আর ইচ্ছা করলেই অমন করে চুল ওল্টাবার সাধ্য নেই টেকো নবদ্বীপের ; ছেলের কালো সুচিক্কণ চুলের জন্য অন্যের কাছে বোধ হয় গর্বই বোধ করে নবদ্বীপ, বাইরে লোকের কাছে যত বিরক্তিই সে দেখাক না কেন।

জিনিষপত্র এ-ঘরে অপেক্ষাকৃত কম। এরই মধ্যে নিজের পছন্দমত ঘরখানাকে সাজিয়েছে মুরলী। থামে থামে নানা রকমের ফটো। কোনটাই ঠাকুর-দেবতার নয় এবং কোন-কোনটার দিকে একেবারেই তাকানো যায় না। অবশ্য না তাকিয়ে যে পারা যায়, তাও নয়। মুরলীর বিলাসিতা আর আড়ম্বরে নিজেকে ভারি দীন মনে হ'তে থাকে সুবলের। এমন লোককে কি করে বলা যায়, যাও দোকানে গিয়ে বসো, ঘাটো গিয়ে তামাকের পাতা। এমন সাজসজ্জা-ওয়ালা বড়লোকের সামনে ও-কথা উচ্চারণ করতেই তো মুখে বেধে যায়। অর্থই সব। মুরলীর মত অর্থবান হতে না পারলে এবং চেহারায়, বাড়িঘরে, আচারেব্যবহারে অর্থের চাকচিক্য অমন করে ফোটাতে না পারলে মুরলীকে সে একটা কথাও বলতে পারবে

না, যতই সে স্পষ্টবক্তা হোক, বুদ্ধিমান সালিশ হিসাবে যতই তার নাম থাক পাড়ায়।

মুরলী সবুজ সেলুলয়েড়ের কেস থেকে সিগারেট বার করে, 'ধরাও সুবলদা, তারপর ব্যাপার কি। বুড়ো বুঝি সাত সকালে সালিশীর জন্য টেনে এনেছে তোমাকে?'

সুবল বলে, 'সালিশী আবার কি, দোকান পসার এখনো যদি বুঝে সুঝে না নাও তবে আর নেবে কবে, বুড়ো মানুষ কষ্টও তো হয়।'

মুরলী বলল, 'কষ্ট না ঘোড়ার ডিম। কষ্ট বুড়োর বাজারে একদিন না গেলেই বরং বেশি হয়, পেটের ভাত হজম হতে চায় না। আমার কথা বলো না, আমি গেলেও জ্বালা, না গেলেও জ্বালা। না গেলে বলবে, বসে বসে খাচ্ছিস, গেলে এক সময়ও চোখের আড়ালে যাবে না, কেবলি সন্দেহ করবে টাকা সরাচ্ছি, সিন্দুক উপুড় করে ঢালছি রাঁড়ের পায়ে। তার চেয়ে এই বেশ আছি। দিব্যি খাই দাই ঘুমোই, তাসপাশা খেলি, চমৎকার সময় কাটে। এমন আরামের কথা তোমরা কেউ ভাবতেও পারো না।'

আরাম! সুবল ঘৃণা করে এই জীবনকে। অলস অকর্মণ্য ভাবে কেবল বাপের পয়সায় বসে বসে খাওয়া সুবল দু চোখে দেখতে পারে না। লোকেও তো ভালো বলে না মুরলীকে। আড়ালে সবাই তো নিন্দা করে। বলে, বাঘের পেটে বাগডাসা। কিন্তু শুকনো লঙ্কার বস্তা মাথায় নিয়ে দুপুর রাত্রে দু মাইল দূরের কুমারগঞ্জের বাজার থেকে ফিরে আসতে আসতে অনেকদিন মুরলীর উপর সুবলের ঘৃণার চেয়ে হিংসাই বেশি হয়, সাধ যায় বাগডাসা হ'তে।

মুরলী আবার বলে, 'যাও কাজে যাও সুবলদা, ও বুড়োর কথায় কান দিয়ে লাভ নেই।'

সুবলের কোন তিরস্কার উপদেশ ব্যঙ্গ বক্রোক্তি যেন গায়ে মাখবে না মুরলী। তার এই হাসি, এই ধরণের ঠাণ্ডা মেজাজ সবচেয়ে দুঃসহ লাগে সুবলের। এর চেয়ে যদি চটে উঠত মুরলী, যদি গরম হয়ে তর্কবিতর্ক করত তা হলেও সুবলের যেন মান থাকত; কিন্তু মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে মুরলী যেন এই কথাই প্রমাণ করে দিল যে সুবলের সমালোচনায় কিছুই যায় আসে না তার। সুবলের হস্তক্ষেপ এতই অবান্তর, এতই ছেলেমানুষের মত যে তাতে মুরলীর কান না দিলেও চলে। মুরলীর এই নীরব অবজ্ঞার সামনে নিজেকে সুবলের নিতান্তই অসহায় মনে হ'তে থাকে। অথচ সুবলের চেয়ে অন্তত তিন চার বছরের ছোট হবে মুরলী। ছেলেবেলা থেকেই সে তাকে দেখে এসেছে। তবু কেন যে তার মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে পারে না সুবল, কেন যে তার তাচ্ছিল্য এমন নিঃশব্দে সে হজম করে যায় তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারেনা। নিজের এই দুর্বল ভীরুতার জন্য নিজের ওপর তার রাগের অবধি থাকে না। অথচ সুবল সত্যি সত্যিই আজকাল আর একটা কেউ কেটা নয়। পাড়ায় একজন সে অন্যতম মাতব্বর। দক্ষিণ পাড়ার বামুন কায়েতরা পর্যন্ত কোন কোন বিষয়ে আজকাল মাঝে মাঝে তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। সেই সুবল কিনা মুরলীর মত একটা লুচ্চা আর চাল্লিয়াৎকে ভয় করে চলে, মুখের ওপর কড়া ধমক দিতে পারে না, কেমন যেন থতমত খেয়ে ঘাবড়ে যায়। নিজের ওপরই দারুণ রাগ হয় সুবলের।

'চল সুবল, বেলা অনেক হয়ে গেছে,' নবদ্বীপ তার ময়লা ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কাপড়ের নীচে লোহার চেনে ঝুলানো বড় বড় কয়েকটা চাবি ঝন ঝন করে উঠল।

হাঁটবার সময়ও এই চাবির শব্দ শোনা যায়। নবদ্বীপ তাকে সত্যিই বাঁচিয়েছে। কুটিল হোক, ধূর্ত হোক এই নবদ্বীপকে সুবল বুঝতে পারে। এর সঙ্গে বেশ মিশতেও পারে সুবল। বয়সের ব্যবধানে কিছু যায় আসে না। নবদ্বীপের সঙ্গে তার কারবারপত্র ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে, সঙ্গে সমান তালে চলতে সুবলের মোটেই অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার ছেলে মুরলীর সঙ্গে কিছুতেই যেন পেরে ওঠে না সুবল। সে তার কয়েক পাতার ইংরেজী বিদ্যা আর ধোপদুরস্ত জামাকাপড় নিয়ে যখন তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকায় তখন চিত্ত জ্বলে যেতে থাকে সুবলের, তবু মুখ দিয়ে কোন প্রতিবাদের ভাষা বেরোয় না।

নবদ্বীপের বাড়ির উত্তর দিকে বিঘা দেড়েক জমিতে ছোট একটু সুপারি আর নারিকেলের বাগান। ভিটাটুকু নাকি ছিল নবদ্বীপের খুড়ো বৃন্দাবনের; তার মৃত্যুর পর নানা ফন্দি খাটিয়ে নবদ্বীপ জায়গাটুকুকে হাত ক'রেছে। বৃন্দাবনের বিধবা স্ত্রী বহু চেষ্টা ক'রেও তা উদ্ধার করতে না পেরে মনের দুঃখে কোন এক বৈরাগীর কাছে গিয়ে ভেখ নিয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা। তারপর নবদ্বীপের নিজ হাতে রোয়া নারিকেল গাছগুলি এত বড় বড় হয়েছে যে সে সব গাছে উঠতে সকলে সাহস করে না সব সময়। এই বাগানের ভিতর দিয়েই বাড়ি থেকে বেরুবার পথ। তারপরই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা শুরু হয়েছে। সুবলকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের ভিতর ঢুকে চার দিকে একবার সন্তর্পণে তাকিয়ে নবদ্বীপ ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর বললে কি নবাব।'

নবদ্বীপের এই ভঙ্গী দেখে সমস্ত শরীর যেন জ্বলে গেল সুবলের। সুবল যে কিছুই বলতে পারে নি, 'নবাবকে' শাসনের জন্য একটি আঙুলও যে তুলতে পারে নি, নবদ্বীপ তা বুঝতে পেরেছে। এ

সম্বন্ধে কোন সংশয়ই নেই সুবলের। তবু নবদ্বীপ এমন ভান করছে কেন? সুবলের মনে হোল নবদ্বীপ নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছে আর বলছে—কি খুব তো চোটপাট ক'রে এসেছিলে, এখন কি হলো, একটা কথাও কি বলতে পারলে আমার ছেলেকে? নবদ্বীপকে যে তার ছেলে মানে না, অপমান করে, সে কথা যেন ভুলেই গেছে নবদ্বীপ। হবু মোড়ল সুবলকে যে কোন কথাটি না ব'লে নাকাল হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে এতেই যেন নবদ্বীপের আনন্দ। সুবলের মনে হোল এই যে সন্তর্পণে নবদ্বীপের ফিস্ ফিসানি এ যেন সুবলকেই ব্যঙ্গ করা, সুবলেব ব্যর্থ মাতব্বরিকেই মুখ ভেংচানো।

নবদ্বীপের সুপারির বাগান ছাড়ালেই ডিষ্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে উত্তরে কুমারগঞ্জের বাজারে। পাড়ার অন্যান্য ব্যবসায়ীরা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। নবদ্বীপরা রাস্তায় পড়তে না পড়তেই দলটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবল বলল, 'দেখেছেন কত বেলা হয়ে গেছে? আজ একেবারে সকলের পিছনে পড়েছি আমরা। একটু জোর পায়ে হেঁটে চলুন জ্যেঠামশাই।'

নবদ্বীপ একটু হাসল, বলল, 'তোর কি বাপু, তুই তো বলেই খালাস। এই বয়সে এখনো যে হেঁটে চলে বেড়াতে পারছি এই তো তোদের ভাগ্য। একবার বয়সটা আমার মত হোক তখন দেখব কত জোরে চালাতে পারিস পা।'

নিজের বয়সকে নবদ্বীপ আজকাল দু'এক বছর বরং বাড়িয়েই বলে; বার্ধক্যের ভঙ্গীকে বাড়িয়ে দেখায় তার চেয়েও বেশী। অথচ এমন এক সময় ছিল যখন লোকের কাছে নিজের বয়সকে আসল বয়সের চেয়ে দুতিন বছর কম বলে প্রমাণ করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি ছিল না

নবদ্বীপের। কিন্তু এখন বয়স যখন বেড়েই গেছে, বার্ধক্যের চিহ্ন যখন দেখা দিয়েছে সর্বাঙ্গে, তখন বয়সকে স্বীকার করাই ভালো। বয়সের কথা উল্লেখ করে যখন যা পাওয়া যায়—কোথাও বা শ্রদ্ধা, কোথাও বা অনুকম্পা, আজকাল আদায় করতে চায় নবদ্বীপ।

খানিকটা পথ এগুতেই ভ্রুকুঞ্চিত করে নবদ্বীপ একটু থমকে দাঁড়াল। সুবল বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার কি হোল জ্যেঠামশাই।'

নবদ্বীপ বলল, 'দেখ্‌তো সুবল, কে আসছে, আমাদের বিনোদ না?'

সুবল বলল, 'তা ছাড়া আবার কে। দেখছেন না, মাথায় রঙীন চাদর জড়ানো, কাঁধে খোল, গলায় ফুলের মালাটাও ভুলে ফেলে আসেনি। পিছনে আবার বোধ হয় একজন সাকরেদও জুটিয়ে এনেছে। এদিকে উনানে তো হাঁড়ি চড়ে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিনোদের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সুবল আর নবদ্বীপের।

'ভালো আছেন রাঙা কাকা? ভালো তো সব পাড়ার?'

বিনোদ সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল নবদ্বীপকে।

নবদ্বীপ হেসে ঘাড় নাড়ল।

কিন্তু বিনোদের এই ধরণধারণে রীতিমত রাগ হয় সুবলের। পাঁচ সাত দিন বিনোদ গ্রামে ছিল না। জেলা শহরের কাছাকাছি গোঁসাইগঞ্জে গিয়েছিল কীর্তন গাইতে। মাঝে মাঝে এমন প্রায়ই সে যায় এখানে ওখানে। কিন্তু ফিরে এসে এমন ভাব দেখায়, যেন সে বহুদূরে বহুকাল বাস করে দেশে ফিরেছে। এমন দূরে থেকে ওপর ওপর ভাবে কথা বলে বিনোদ, যেন সে এদের একজন নয়। খুব বড় রকমের চাকরী-বাকরী করে, খুব যেন একটা সম্মানী লোক। অন্য সকলের মত সে যেন একজন সাধারণ মানুষ নয় পাড়ার। ওর ভাবভঙ্গী দেখে হাসিও পায়, আবার রাগও হয়

সুবলের। না হয় গলায় একটু মেয়েলি মিষ্টত্বই আছে, কিন্তু তাই বলে কি সব সময়েই 'সখী ধর ধর' ভাবে থাকতে হবে?

বিনোদ বলে, 'আচ্ছা আমরা তাই এগুই সুবল। তুমি তো যাচ্ছ দোকানে। সন্ধ্যার দিকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এস কিন্তু।'

সুবল জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

বিনোদ সলজ্জ হেসে বলে, 'এই একটু আসরের মত বসাবার ইচ্ছে আছে। এই যে আমার সঙ্গের লোকটিকে দেখছ, অমন চুপচাপ ভালোমানুষের মত থাকলে হবে কি, একটি খাঁটি জহরৎ। হাত ভারি মিঠে। জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি, আসতে কি চায়।'

লোকটি লজ্জায় বিনয়ে একেবারে ভেঙে পড়বার মত হয়ে বলল, 'না না কিছু বিশ্বাস করবেন না দাদা, ভারি বাড়িয়ে বলবার অভ্যাস বিনোদদার।'

বিনোদ বলল, 'সত্যিই বাড়িয়ে বলছি কিনা সন্ধ্যার সময়েই তার পরিচয় পাবে। একটু সকাল সকালই এসো সুবল, আসবেন কিন্তু রাঙা কাকা।'

নবদ্বীপ বলল, 'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।'

খানিকটা এগিয়ে নবদ্বীপ বলল, 'ছেলেটি কিন্তু বেশ, কথাবার্তায় ভারি বিনয়ী। আর কী মিষ্টি স্বভাব। আমার বেশ লাগে। ওর বাবাও ছিল অমনি। বয়সে বড় হলে কি হবে, আমার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতে সাহস করত না। বিনোদও হয়েছে তেমনি। একটু সকাল সকালই ফেরা যাবে বরং, কি বল সুবল। অনেক দিন বাদে একটু নামগান শুনবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

সুবল কোন জবাব দিল না। ইদানীং নবদ্বীপের ধর্মে-কর্মে বড় মতি দেখা যাচ্ছে। সাতখোপ কবুতর খেয়ে বিড়াল তপস্বী সেজেছে।

ঘরে বিনোদ যখনই ফিরে আসে তখনই খানিকটা মাতামাতি

না করে ছাড়ে না। সুবলের মনে হয় এটা ওর নিজেকে জাহির করবার চেষ্টা। পাড়ায় খোল বাজাতে, গান গাইতে সবাই কিছু না কিছু পারে। তার মধ্যে বিনোদের না হয় গলাটা একটু বেশি মিষ্টি, হাতটা একটু পরিষ্কার, কিন্তু তাই বলে সেটা কি এমনভাবে যখন তখন ঢাক পিটিয়ে বলে না বেড়ালে নয়? শুধু মিঠে হাত আর গলার জন্যই নয়, মিষ্টি স্বভাবের জন্যও বেশ খ্যাতি আছে বিনোদের। সে যে সচ্চরিত্র, ভালো মানুষ একথা সবাই বলে। ও বাড়ির বিষ্টু খুড়ো বিনোদের প্রশংসায় সব চেয়ে উচ্ছ্বসিত। পূর্ব-জন্মের সাধনা আর সুকৃতি না থাকলে নাকি এমন গুণী হওয়া যায় না। আর এসব গানবাজনা উঁচুদরের জিনিষ। উঁচু মন, সৎস্বভাব, ভগবদ্ভক্তি এ সব না থাকলে অমন নাকি হতে পার না কেউ। ভিতরে ভিতরে সত্যিই নাকি একজন বড় রকমের সাধক এই বিনোদ। সুবল লক্ষ্য করেছে, বিনোদকে ছেলেবেলা থেকে সবাই যখন সাধু আর ভালমানুষ বলত তখন খুব যে একটা ভয় আর শ্রদ্ধা করত বিনোদকে তা নয়। বরং খানিকটা ঠাট্টা, খানিকটা অনুকম্পার ভাবই মিশান থাকত এইসব বিশেষণের মধ্যে। এমন কি বিনোদ নিজেই তাতে চটে উঠত অনেক সময়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবই এখন সয়ে গেছে বিনোদের। এখন এসব তার প্রশংসা বলেই সে ভাবে। এবং নিতান্ত মিথ্যা ভাবে না। শুধু ঠাট্টাই নয়, আজকাল লোকে তাকে খানিকটা ভক্তিশ্রদ্ধাই করে। সজ্জন সচ্চরিত্র বলতে বিশেষভাবে আজকাল বিনোদকেই বোঝায়। পাড়ার ফচকে ছোড়ারা তাকে দেখলে একটু সঙ্কুচিত হয়, এমন কি মুরলী পর্যন্ত বিনোদের সামনে কথাবার্তায় বেশ সংযত হয়ে ওঠে।

সুবল ভেবে পায় না, পাড়ার সবাই বিনোদের প্রশংসায় সত্যিই এমন পঞ্চমুখ কেন? বিনোদের সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, তার

বিষয়বুদ্ধির অভাবটাও কি তার গুণ, তার ভালোমানুষির পরিচয়? সংসারে বোকা কি উদ্ভট পাগলাটে গোছের কিছু একটা না হলে কি ভালোমানুষ হওয়া যায় না? না হলে বিনোদের স্বভাব চরিত্রের প্রশংসাই বিশেষভাবে এমন ক'রে করে কেন লোকে? পাড়ায় আরো তো পাঁচজন আছে যারা চোরও নয়, বদমাসও নয়, কিন্তু তারা যেন লোকের চোখেই পড়ে না। বৈষয়িক বুদ্ধি যদি এমন মন্দই হয় তা হলে যখন তখন সুবলের অত ডাক পড়ে কেন? কেন মামলা-মোকদ্দমা, ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে লোকে সুবলের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করতে আসে? বিনোদের কাছে গেলেই পারে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সুবলকে না হলে লোকের চলে না, আর প্রয়োজনটা ফুরিয়ে গেলেই সেটা খারাপ হয়ে দাঁড়ায়। তখন বিনোদের খোলের মিঠে আওয়াজ শুনতে লোকের মন আকুলি বিকুলি করতে থাকে।

বৈষয়িকতায়, কূটবুদ্ধিতে সুবল দ্বিতীয় নবদ্বীপ সা হয়ে উঠছে এমন একটা ধারণা যে লোকের মনে আছে তা সুবলের টের পেতে বাকি নেই। কিন্তু সংসারে ঠকে যাওয়াই যদি ভালোমানুষ আর মহত্তের লক্ষণ হয়, তাহলে সবাই ঠকতে এত ভয় পায় কেন? ওরা যখন বিনোদ সম্বন্ধে এমন মুগ্ধভাবে প্রশংসা করে, তখন সুবল ব'লে যে একটি লোক আছে, যার খোলে তেমন মিঠে হাত নেই, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে পরিষ্কার মাথা, যা তাদের বিপদেআপদে রক্ষা করে একথা লোকের যেন খেয়ালই থাকে না। সুবলের কাছে যে তারা কত রকমে কত উপকার পায় সে কথা সবই যেন তারা ভুলে যেতে চায়। বিনোদের তুলনায় সুবল যেন একেবারেই তখন অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে তাদের কাছে।

কিছু দূর থেকেই কুমারগঞ্জের বাজারের অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা

যায়। দূরে থেকে অবশ্য হট্টগোলকে গুঞ্জনের মতই মনে হয়। কাছে গেলেই পরিষ্কার বোঝা যায় তা গুঞ্জন নয়। মাছের বাজারটা সব চাইতে আগে হওয়ায় গোলমাল আরো বেশী ক’রে কানে আসে। বাজারে ঢুকেই নবদ্বীপ আর সুবল দুটো আলাদা গলি দিয়ে যে যার দোকানের দিকে চলে যায়। পরস্পরের কাছে মৌখিকভাবে বিদায় নেবার প্রয়োজনও তারা বোধ করে না।

২

পুরোনো বাড়ির বড় পুকুরটার থাকার মধ্যে এখন শুধু পৌরাণিক কিংবদন্তীই আছে। বর্ষার সময় ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় জল খুব সামান্যই থাকে। আর জলের চেয়ে বেশী থাকে বড় বড় পানা। তাছাড়া মেয়েদের ব্যবহারের উপযোগিতাও আর এ পুকুরের নেই। বসতি সরে গেছে পশ্চিমের দিকে। পূবের দিকটা আজকাল একেবারেই ফাঁকা দেখায়। পূব-পারে গদাই সা’র বাড়ি তবু খানিকটা আব্রুর কাজ করত। কিন্তু ক’ বছর হোল শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে সেও উঠে গেছে এখান থেকে ; যাওয়ার সময় ঘরখানা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গেছে। শোনা যায়, আগেই ওপাড়ার হরেন বোসের নামে ভিটা সে কওলা ক’রে দিয়ে টাকা নিয়ে রেখেছিল। এখন পুকুরঘাট থেকে সোজাসুজি একেবারে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নতুন রাস্তা চোখে পড়ে, আর তার পর দেখা যায় মাঠ।

পুকুরটা পাড়ার মধ্যে সুবলের স্ত্রী মঙ্গলারই বেশী কাজে লাগে। ময়লা কাপড়-চোপড় কাচবার জন্য পনের-কুড়িখানা বাড়ি ডিঙিয়ে তাকে আর খালের ঘাটে যেতে হয় না। অনেকদিন এই পুকুরে সে কোন রকমে স্নানটাও সেরে নেয়। মঙ্গলার এই সুবিধার জন্য আজকাল অনেকেরই চোখ টাটায়। তার দেখাদেখি বনবাদাড় বাঁশঝাড় ভেঙে নিধিরাম সা’র বাড়ির বউরাও ইদানীং এ পুকুরে

আসতে আরম্ভ ক'রেছে। কিন্তু যেটুকু জল আজকাল এ পুকুরে থাকে তা বলতে গেলে মঙ্গলার জন্যই। শুকনোর সময় মঙ্গলাই ঘরদোর নিকোবার জন্য এই পুকুর থেকে ঝাঁকা ভরে মাটি কেটে নেয়। সেই সব গর্তের মধ্যেই জল এক-আধটু থাকে। কিন্তু এই মাটি নেওয়ার জন্যও কি কম ঝগড়া ক'রতে হয় পুরোনো বাড়ির সোনাখুড়ির সঙ্গে! সোনাখুড়ির চাইতে তার মেয়ে আলতা হয়েছে আরও এক কাঠি বাড়া। পুরোনো বাড়িতে এখন এই মা আর মেয়েই আছে, আর তাদের সম্পত্তির মধ্যে আছে এই পুকুর। পুকুরের অংশ আছে সুবলেরও। অথচ সোনাখুড়ি আর আলতার ভাবভঙ্গিতে মনে হয় পুকুরটা যেন একা তাদেরই। বহুদিন মঙ্গলা সুবলকে বলেছে—এ ব্যাপারের একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে। এত মামলা-মোকদ্দমা বোঝে সুবল, এতজনকে এত পরামর্শ দেয়, এটুকু কি আর পারে না ; কিন্তু সুবলের যেন জেদ আছে একটা—মঙ্গলা যা বলবে তা সে কিছুতেই শুনবে না।

একটা ঝাঁকায় ক্ষারে দেওয়া কতকগুলি কাপড়-চোপড় কাঁখে নিয়ে কাচবার জন্য বড় পুকুরে এসেছিল মঙ্গলা। নোংরামি তার সহ্য হয় না। ঘরদোর তার নিকানো, ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে থাকে সব সময়, আসবাবপত্রও থাকে বেশ মাজাঘষা সাজানো গুছানো। সুবলের স্বভাবই বরং নোংরা। এ সম্বন্ধে কিছু বললে সুবল জবাব দেয়, 'অমন ফিটফাট পটের বিবি সব সময় সেজে থাকা মেয়েমানুষদেরই পোষায়, পুরুষদের চলে না ; সেই সব পুরুষদের চলে যারা মেয়েমানুষ ঘেঁষা,—যারা প্রায় মেয়েমানুষেরই সামিল।'

পটের বিবি কথাটার মধ্যে একটু খোঁচা আছে। মঙ্গলার যে আজও কোন ছেলেমেয়ে হোল না সেই খোঁচা।

ছেলেমেয়ে না থাকার জন্য ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ যে না আছে

মঙ্গলার তা নয়। এক সময় তাবিজ-কবচ যে যা দিয়েছে তাই সে ব্যবহার করেছে, কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হোলনা তখন সে-সব দূর ক'রে ছুঁড়ে ফেলতেও তার দ্বিধা হয়নি। পাড়াপড়শীরা বলেছে, 'মেয়েমানুষের কি অমন অধীর হলে চলে?' কিন্তু মঙ্গলার স্বভাব ভারি একগুঁয়ে, তাছাড়া পরোক্ষে অহঙ্কারী, দেমাকী বলে যে যেমন সমালোচনাই করুক, সামনে তার রাশভারিত্ব সবাই স্বীকার করে। সন্তানহীনতার জন্য কারো কাছে দুঃখ জানাতে যায় না মঙ্গলা। তবু যেচে যদি কেউ সমবেদনা জানাতে আসে মঙ্গলার কাছে সে মোটেই আমল পায় না। এই জিনিসটাই পাড়ার অনেকের সহ্য হয় না। ছেলেমেয়ে না থাকে না থাক্, কিন্তু তার জন্য হায় আপশোষও থাকবে না—এ কেমন মেয়েমানুষ! একদিন নিধিরাম সা'র মেজ মেয়ে সুশীলা এসেছিল, সঙ্গে ছিল তার তিনটি ছেলেমেয়ে। তাদের হুড়াহুড়ি দাপাদাপিতে মঙ্গলা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করেছিল। এমন দুরন্ত আর চঞ্চল আজকালকার ছেলেমেয়ে, ক' মিনিটের মধ্যে মঙ্গলার ঘরের জিনিসপত্র একেবারে তছনছ করে ফেলল। মুখে হাসি টেনেই মঙ্গলা বলেছিল, 'এত ঝক্কি পোয়াও কি করে ভাই চব্বিশ ঘণ্টা? আমি হোলে তো অস্থির হয়ে যেতাম।'

কিন্তু সুশীলা চালাক মেয়ে, মঙ্গলার মনের ভাব বুঝতে তার দেরি হয়নি। বড় ছেলেটাকে একটা চড়, ছোট ছেলেটাকে একটা ঠোনা মেরে শাসন করে গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'অস্থির তুমি এখনই হয়ে উঠেছ বৌদি, আর ঝক্কির কথা বলছ—ঝক্কি মনে করলেই ঝক্কি। ভগবান মানুষকে মন বুঝেই ধন দেন কিনা।'

ঘাটে পৈঠার বালাই নেই। খেজুর গাছের একটা খণ্ড লম্বালম্বি-ভাবে জল পর্যন্ত ফেলে দেওয়া হয়েছে। আলতার সাহায্যে মঙ্গলা নিজেই কিছুদিন আগে এটাকে ধরাধরি করে এনে এভাবে পৈঠার

ব্যবস্থা করে রেখেছিল। নানা কারণে আলতাদের সঙ্গে এজমালি ঘাটই রাখতে হয়েছে মঙ্গলাকে। পুকুরের উত্তর আর পশ্চিম দিকের পাড় অপেক্ষাকৃত খাড়াই আছে, কিন্তু তা এমন কাঁটা-জঙ্গলে ভরতি যে ব্যবহার করা চলে না। পুব আর দক্ষিণ দিকের পাড় দুটো ধ্বসে ধ্বসে প্রায় একেবারে সমতল হয় গিয়েছে। আলতা আর মঙ্গলা দুজনেই এই দক্ষিণ দিকের ঘাটেই আসে। ক্ষারে দেওয়া কাপড়চোপড়ের ঝাঁকা নিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ রাস্তার দিকে খোলের ঠুং ঠাং আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘাড় ফিরাল মঙ্গলা। বিনোদ যাচ্ছে খোল কাঁধে করে আর তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে কোথাকার কে একজন বিদেশী লোক। মঙ্গলার মনে হোল—ওরাও যেন এদিকে একবার চেয়ে এইমাত্র চোখ ফিরিয়ে নিল। তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা আরও খানিকটা টেনে দিল মঙ্গলা।

'এত লজ্জার বহর কাকে দেখে বউ দি ?'

পিছন ফিরে মঙ্গলা দেখল একখানা এঁটো থালা হাতে নিয়ে আলতাও এসে দাঁড়িয়েছে।

মঙ্গলা একটু যেন থতমত খেয়ে গেল, 'কাকে দেখে আবার।'

আলতা একটু হাসল, 'বল কি! অতবড় ঘোমটা কি তা হ'লে মিছামিছিই টানলে।'

মঙ্গলা ততক্ষণ সামলে নিয়েছে, বলল, 'একেবারে মিছামিছিই বা হবে কেন। ভেবেছিলাম—কালো বদন আর হেরব না।'

আলতার নামের সঙ্গে রঙের মিল নেই। তার ঠাকুরদা মাধব সা বোধ হয় ঠাট্টা করেই এই নামটি রেখেছিল কিংবা আতুর ঘরে প্রথম দিন নাতনির গায়ের রঙ লাল দেখে তার মনে হয়েছিল আলতার মত লাল টুকটুকেই হবে মেয়ের রঙ। কিন্তু বয়স যত বাড়তে লাগল আলতার বদলে আলকাতারার রঙই ফুটে বেরুতে

লাগল তার গায়ে। সমস্ত পাড়ায় এমন কালো আর কুশ্রী মেয়ে দুটি নেই। চোখ মুখ যাই হোক—সাহা পাড়ায় মেয়ে পুরুষ প্রায় সবার রঙই ফর্সা, কিন্তু আলতা এদের মধ্যে বড়রকমের ব্যতিক্রম। শুধু রঙই নয়, শরীরের গড়নটাও আলতার অসুন্দর। যেমন মোটা, তেমনি বেঁটে। বয়স বাইস তেইশের বেশী নয়, কিন্তু দেখলে মনে হয়, তিরিশের ঘরে। পুরুষালি চেহারা, পুরুষালি গলা। তবু কালো কুৎসিত বললে আজকালও আলতার মুখ অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে, আজকালও কথাটাকে সে সহজভাবে নিতে পারে না। কিন্তু সে যে সুন্দর নয়—একথা বুঝবার বয়স তার তো বহু আগেই হয়েছে। তবু কথাটা বলে ফেলে মঙ্গলা বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। ঝগড়ার সময় খুবই ঝগড়া করে মঙ্গলা আলতার সঙ্গে। সামান্য বিষয় নিয়েই ঝগড়া বাঁধে। রান্না করবার জন্য বাঁশের শুকনো পাতা, ঘর নিকোবার জন্য গোবর নিয়ে, পুকুরের মাটি নিয়ে ঝগড়া বেঁধে যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আম-জামের ভাগ নিয়েও কম কেলেঙ্কারী হয় না। এমন মাস যায় না যে মাসে পাঁচ সাতদিন পরস্পরের মধ্যে কথা বন্ধ না থাকে। কিন্তু যখন ভাব হয় তখন আলতাই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সখী মঙ্গলার। বছর পাঁচ-ছয় ছোট হবে আলতা তার চেয়ে, কিন্তু বয়সে আলতাকেই বড় বলে মনে হয়। শক্তিও রাখে সে পুরুষের মত। অসুখে বিসুখে আলতাই আসে পরিচর্যা করতে। মায়ের পেটের বোনের মতো সে তখন শুশ্রূষা করে, কিন্তু ঝগড়া যখন বাধে তখন সতীনের মতই সে শত্রু হয়ে ওঠে। রাগ আর অনুরাগ দুইই আলতার প্রচণ্ড। আলতার মোটা রসিকতাগুলি আগে তেমন পছন্দ করত না মঙ্গলা। কিন্তু শুনতে শুনতে এখন এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে আলতার মুখে ওসব না শুনলেই যেন আর তার ভালো লাগে না আজকাল। বরং অনেক

সময় মঙ্গলাই এখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলতার মুখ থেকে এসব বার করে।

মঙ্গলার পরিহাসটা আলতার মনে এবারও যে না বিঁধেছিল তা নয়, কিন্তু খোটাটা তার নিজের ঢঙে ফিরিয়ে দিতেও দেরি হোল না। মুখখানা গম্ভীর করেই আলতা জবাব দিল, 'সে তো ঠিকই বউদি, অমন সুন্দর পানা মুখ পেলে কালো বদন আর দেখতে চায় কে।'

বিনোদ সাধুকে নিয়ে এই ধরণের রসিকতা আলতার মুখ থেকে শোনা মঙ্গলার অভ্যাস হয়ে গেছে। আগে ভারি রাগ করত মঙ্গলা, গালাগালি করত আলতাকে, কিন্তু আজকাল অনেক সময় এসব কথায় মুচকি হাসে, বলে, 'মরণ তোর,—নিজের সাধটা অন্তের ঘাড়ে চাপাবার ইচ্ছা বুঝি।

আলতা জবাব দেয়, 'মরণ আমার, আমি কি এমনই ক্ষেপেছি যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে যাব। চাঁদপানা যাদের মুখ তারাই চাঁদের খোঁজ করে।'

মঙ্গলা বলে, 'পোড়াকপালী, চাঁদ আমার ঘরেই আছে, তার জন্ত খোঁজ করতে বেরুতে হয় না।'

পাড়ার মধ্যে বিনোদ দেখতে সত্যিই সবচেয়ে সুন্দর। বেশ লম্বা দোহারা চেহারা। রঙ অবশ্ত এ-পাড়ার অনেকেরই ফর্সা, তবু বিনোদের স্নিগ্ধ গৌর বর্ণ বিশেষভাবে চোখে পড়ে। নাক-চোখের গড়নও একেবারে নিখুঁত। কিন্তু বিনোদকে যে মঙ্গলার মনে মনে ভালো লাগে, তা তার রূপের জন্ত নয়, তার মিষ্টি গলা আর মধুর ব্যবহারের জন্ত। বিনোদের সঙ্গে কোনদিনই অবশ্ত কথা বলে না মঙ্গলা, বিনোদেরও এ পর্যন্ত কোন উপলক্ষ্য হয়নি মঙ্গলার সঙ্গে কথা বলবার, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বিনোদকে আলাপ করতে শুনেছে

অনেকদিন সুবলের সঙ্গে। স্বামীর তুলনায় অনেক ভদ্র, অনেক মার্জিত বলে মনে হয়েছে মঙ্গলার। এমন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, আর চমৎকার স্বভাব নিয়ে সুবলের মত খাঁটি ব্যবসায়ী বনে না গিয়ে বিনোদ যে অমন ভক্ত কীর্তনীয়া হয়ে উঠেছে, সে ভালোই হয়েছে। মঙ্গলার মনে হয়, এ ছাড়া অন্য কিছু যেন তাকে মানাত না। অমন নরম মিষ্টি কথায় বিনোদ কি পারত সুবলের মত পাড়ার মধ্যে অমন মোড়লি করতে, উকিল-মোক্তারদের মত অমন বৈষয়িক চাল চালতে, পাইকারদের সঙ্গে কখনও গরমে কখনও নরমে জিনিসপত্রের অমন দরদাম করতে। পাইকারদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলে সুবল, কেউ কোন বিষয়ে পরমর্শ নিতে এলে তার বোকামিতে সুবল কিভাবে রেগে গিয়ে তাকে গালাগালি করতে থাকে, তা ঘরে বসে মঙ্গলা প্রায়ই শুনতে পায়। একেক সময় মঙ্গলা ভাবে, আচ্ছা, সুবল যদি অমন পাকা ব্যবসায়ী না হয়ে বিনোদের মত নামকরা কীর্তনীয়া হোত তাহলে! কিন্তু কল্পনাটা তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দেয় মঙ্গলা, একটুও তার পছন্দ হয় না। দূর, ও-ধরণের স্বামী নিয়ে কি উপায় হোত মঙ্গলার। স্বামী যে সুবলের মত ছাড়া অন্য কারো মত হোতে পারে একথা কিছুতে যেন ভাবতেই পারে না মঙ্গলা। বিনোদের মত অমন নরম, 'ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না' গোছের মানুষ নিয়ে কেউ কি সংসার করতে পারে। বিনোদের স্ত্রী হয়ে মালতীকে কিভাবে কষ্ট পেয়ে মরতে হয়েছে তা কি চোখের ওপরই দেখেনি মঙ্গলা? দুদিন ধরে ঘরে খাবার নেই তো নেই-ই—বিনোদ কোথায় কীর্তনে মেতে রয়েছে, কোন খোঁজই নেই তার। আবার কীর্তন থেকে দু-চার টাকা হাতে নিয়ে যখন বিনোদ ফিরে এল তখন তার স্ফূর্তি দেখে কে। তিন-চারজন ভক্ত সঙ্গে করে সে হয়তো রাত দুপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে। অতিথির উপযুক্ত সৎকারে আদরে

আপ্যায়নে দু-একদিনের মধ্যেই বিনোদের হাতের টাকা নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর অলক্ষ্যে একটু একটু করে শেষ হয়েছে মালতী। বিনোদ আবার বেরিয়ে পড়েছে—তার অন্নের কখনও অভাব হয়নি। কত ভক্ত, কত গুণমুগ্ধ তার এখানে-ওখানে ছড়ানো। কিন্তু এমন দিনও গেছে শেষকালটায় যে মালতী ধার চেয়ে পাড়ার কারো কাছে একটি ক্ষুদকণাও পায়নি। কে ধার দিতে যাবে তাকে যে হাত পেতে নিয়ে ফের হাত উপুড় করে না। তারপর মালতী যখন গুরুতর অসুখে পড়ল তখনো কি বিনোদ একবার খোঁজ নিয়েছে! সে তখন অষ্টপ্রহর, চব্বিশপ্রহরে মত্ত। শেষে অবশ্য একদিন জেলা শহর থেকে মোটরে করে একজন বড় ডাক্তারকে এনে হাজির করেছিল বিনোদ। বিনোদের কীর্তন শুনে এই ডাক্তারও নাকি বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তার যখন এসেছিলেন তখন আর তাঁর করবার মত বিশেষ কিছু ছিল না। মালতীর মৃত্যুর পর তার আত্মার সদ্গতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের অবশ্য কিছু বাকি রাখেনি বিনোদ। আশেপাশের ভক্তদের ডেকে নাম-সংকীর্তন করিয়েছিল; দীঘলকান্দীর নামকরা পাঠক নন্দকিশোর গোঁসাইকে দিয়ে ভাগবত পাঠ করিয়েছিল, বৈষ্ণব এবং কাঙালী ভোজনেও কম ব্যয় হয়নি। এর সব টাকাটাই নাকি যুগিয়েছিল বিনোদের ভক্ত বন্ধুরা।

কাপড় কেচে মঙ্গলা ফিরে এসে দেখে বাইরের দাওয়ায় চুপচাপ বসে রয়েছে বিনোদের মা। কাপড়ের ধামাটা নামিয়ে রেখে মঙ্গলা বলল, 'কি ব্যাপার খুড়িমা, কতক্ষণ এসেছেন? আহা, অমন উবুকো বসে রয়েছেন যে, পিঁড়িখানা টেনে বসলেই তো পারতেন।'

বিনোদের মা বলল, 'তাতে আর কি হয়েছে বউমা, অমন নিকানো

পৌছানো তোমার ঘরদোর, মাটিতে বসতেও সাধ যায়, আবার কারো বাড়িতে তাব বিছানায় বসতেও পিরবিত্তি হয় না। এমন লক্ষ্মী বউ এ গাঁয়ে তো ভালো, দশখানা গাঁয়েও খুঁজে মিলবে না একথা আমি ঢাক পিটিয়ে বলতে পারি।' তারপর একটু থেমে বিনোদের মা এদিক-ওদিক চেয়ে খানিকটা সংকোচের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু বিনোদ আবাব কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে দেখ। পাঁচ-সাতদিন ধরে বাড়িতে আসবার নাম নেই, খোঁজ নেই বুড়ী মা রইল কি মরল। বেলা দুপুরের সময় কোত্থেকে এক লেজুড় জুটিয়ে এনেছে সঙ্গে। বলা নেই, কওয়া নেই, এখন অমি এই দুপরেব সময় কি দিয়ে কি করি বলো ত!'

এমন ঘটনা আজ নতুন নয়। বিনোদের মা যে এই জন্যই এসেছে, তা তাকে দেখেই মঙ্গলা বুঝতে পেরেছিল। তার মুখ শক্ত হয়ে এল। কথাব কোন জবাব না দিয়ে দাওয়ায় দাঁড়ায়েই ঘরের মধ্যে টাঙ্গানো বাঁশের আড়টা থেকে একখানা শুকনো কাপড় হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে নীরবে মঙ্গলা পিছনেব দিকে চলে গেল কাপড় ছাড়তে।

বিনোদের মা চিন্তিত হয়ে উঠল একটু, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল 'চলে গেলে নাকি বউমা?'

মঙ্গলা কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই নির্মমভাবে জবাব দিল, 'চলে আর যাবো কোথায়, দেখছেন না কাপড় ছাড়তে এলাম, বসুন, আসছি।'

একটু পরে মঙ্গলা ফিরে আসতে বিনোদের মা বলল, 'বিনোদই আমাকে পাঠিয়ে দিল তোমার কাছে, বলল আর কারো কাছে গেলে তো কিছু হবে না মা, ও বাড়িব সোনাবউদির কাছ থেকে একবার ঘুরে এস, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোন দিন বন্ধ থাকে না, এই বেলাটা কোন রকমে চালিয়ে দিতে পারলে রাত্রের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মঙ্গলার মুখ একটু বুঝি আরক্ত হয়ে উঠল, 'ছিঃ, আমার কথা বললেন তিনি ?'

বিনোদের মা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মঙ্গলার দিকে, তারপর মিশিরঞ্জিত দাঁত বার করে একটু হেসে বলল, 'তোমার কথাই বলল বউমা। ছেলেকে আমার অমন হাবাগোবা দেখলে কি হয়, সে মানুষ চেনে। কারো মুখের দিকে সে তাকায় না। কিন্তু কার মনে কি আছে—তা তার জানতে বাকি থাকে না।'

মঙ্গলা ভিতরে ভিতরে একটু যেন শিউরে উঠল। তবু একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু খুড়িমা—'

বিনোদের মা বলল, 'ওঃ তোমাকে বুঝি বলিইনি কি দরকার, তা সে কথা কি তোমাকে বলবার দরকার হবে মা ? দুজনের যোগ্য দুমুঠো দুমুঠো—। তোমার কাছে কোন লজ্জার বালাই আমার নেই। আপন জনের কাছে আবার লজ্জা।'

মঙ্গলা ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় রান্না ঘরের পাশে রয়না গাছটার গা ঘেঁষে বিনোদ একটু ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে এসে দাঁড়ালো, 'তুমি এখানে মা, আমি এদিকে পাড়া ভরে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।' ঘোমটা টানবার আগে মঙ্গলা একবার ঘাড় বাঁকিয়ে বিনোদের দিকে না তাকিয়ে পারল না, তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বিনোদের কথায় মঙ্গলার বুকের মধ্যে ধাক করে উঠল। তা হলে এতক্ষণ বিনোদের মা যে সব কথা বলছিল তা সব মিথ্যা। বিনোদ তার মাকে বিশেষ করে মঙ্গলার কাছেই পাঠায়নি, সমস্ত পাড়া ভরেই তাকে সে খুঁজে বেড়িয়েছে এবং অন্য কোথাও না পেয়েই এখানে এসেছে, পাড়ার অন্য কোন বাড়িতে ধার না পেয়ে বিনোদের মাকে যেমন আসতে হয়েছে এখানে। বুড়ি তা হ'লে এতক্ষণ ধরে সব মিথ্যা

কথা বলছিল বানিয়ে বানিয়ে মঙ্গলার কাছে। বিনোদের মা মুখ টিপে একটু হাসল, তারপর বলল, 'কিন্তু বাবা, মিথ্যা হয়রাণ হতে তুই গেলিই বা কেন! আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তা-তো তুই জানতিসই।'

ঘরের মধ্যে মঙ্গলার মুখ ঈষৎ লাল হয়ে উঠল। ছলনাটা তা'হলে বিনোদের মার নয়, বিনোদের নিজেরই। সে যে সোজা-সুজি তার মাকে মঙ্গলার কাছে পাঠিয়েছে ধারের জন্য একথা লজ্জায় সে স্বীকার করতে পারছে না। এত লজ্জা কেন বিনোদের? বিনোদের লজ্জার কথা ভেবে মঙ্গলার নিজেরই যেন লজ্জা করতে লাগল। বিনোদের মার দেরি দেখেই কি বিনোদ এখানে তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে, না অন্য কোন কারণ আছে তার? মঙ্গলা মনে মনে হাসল, তারপর গোঁসাই গোবিন্দকে যেমন সিধে দেয় তেমনি করে বড় একখানা থালায় চাল ডাল, দুটো আনাজ সাজিয়ে মঙ্গলা বিনোদের মার সামনে এনে রাখল। বিনোদের মা ডালা থেকে সেগুলিকে আস্তে আস্তে আঁচলে ঢালতে ঢালতে বলল, 'বাঁচালে বউমা, হাত পাতলে কোন দিন তুমি না করেছ যে আজ করবে? টাকা পয়সা অনেকেরই থাকে বউমা, কিন্তু এমন কলজে থাকে ক'জনের?'

ধার পাওয়ার জন্য বিনোদ কিন্তু মুখে কোন রকম কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করল না, এ সব যেন চোখেই পড়ল না তার। শুধু যাওয়ার সময় বলে গেল, "সন্ধ্যার সময় দয়া করে একটু পায়ের ধুলো দেবেন বউদি। নাম কীর্তনের আসর বসাবার ইচ্ছা আছে। একজন গুণী লোককে ধ'রে এনেছি। শুনবেন কি রকম গলা। যাবেন কিন্তু।'

বিনোদের মা বলল, 'যাবে রে যাবে, তোর আর অত করে বলবার দরকার হবে না। মা আমার কীর্তনের ভারি ভক্ত। গানের সামান্য আওয়াজ শুনলে পর্যন্ত কান খাড়া করে থাকে।'

বিনোদের মার এত বেশি ঘনিষ্ঠতা বিশেষ ভালো লাগে না মঙ্গলার। কেমন যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়, আর বিনোদই বা কি রকম মানুষ, তার মার সামনে মঙ্গলাকে কীর্তন শোনবার জন্য অমন করে নিমন্ত্রণ না করলেই কি হোত না? মনে মনে কী ভেবেছে বিনোদের মা? তার মিষ্টি কথা, মুখ টিপে টিপে হাসা, গায়ে পড়ে অমন সোহাগ দেখান, মঙ্গলার বুঝি খুব ভালো লাগে ভেবেছে? সহ্য করতে পারে না। মানুষ বড় সহজ নয় বিনোদের মা, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করলে মঙ্গলাও ছেড়ে কথা কইবে না, তেমন বাপের ঝি সে নয়।

৩

পুরোনো কর্মচারী নীলকমল ঘর ঝাঁট দিয়ে সমস্ত দোকান ঘরটায় গাড়ুর জল ছিটিয়ে দিল; তারপর গদির পোড়ামাটির বড় লাল দেড়কোর ওপরকার প্রদীপটা জ্বালিয়ে দিল দিয়াশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে। পুরোনো পিতলের ধুনোচিটার রঙ এতো কালো হয়ে গেছে যে পিতলের বলে চেনাই যায় না। খানকয়েক নারকোলের ছোবড়ার খণ্ড ভরে ধুনোচিটাও নীলকমল ধরাল। ধূপের খুঁটিটা থেকে সামান্য একটু ধূপের গুঁড়া ছিটিয়ে দিল ধুনোচির মধ্যে। তারপর গদির তিনটা হাতবাক্সের সামনে ধুনোচিটা বার কয়েক ঘুরাতে ঘুরাতে অনুচ্চস্বরে তিন চারবার বলল, 'হরিবোল, হরিবোল।'

গদির ওপর মাঝখানের বড় হাতবাক্সটা সামনে করে উবুহোভাবে নবদ্বীপ এতক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে নীলকমলের সায়ংকৃত্যের দিকে চেয়েছিল। হরিধ্বনি শুনে নিতান্ত অভ্যাসবশে হাত দুখানা জোড় করে একবার কপালে ছোঁয় । নীলকমল ততক্ষণে এক টুকরো ছেঁড়া খবরের কাগজ দিয়ে রিকেনের চিমনি মুছতে বসেছে।

নবদ্বীপ বলল, 'এ সব আগেই ঠিক করে রাখতে পার না নীলু? এখন চিমনি মুছবে তবে আলো ধরাবে।'

নীলকমলের ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বলল, 'কি করব বড়কর্তা, আমাকে কি একমুহূর্তও বসে থাকতে দেখেন? এখন এসব জিনিসও যদি আমাকে দেখতে হয়—রাখালকে ব'লে ব'লে আমি হয়রাণ হয়ে গেলাম।'

নবদ্বীপ ওকথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'রাখালই তো গেল বুঝি সুবলের ওখানে?'

নীলকমল ঘাড় নাড়ল।

নবদ্বীপের ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যাসন্ধিই বাড়ি ফিরবে আজ। সুবলকে সেকথা বলেও রেখেছিল। কিন্তু সন্ধ্যা উতরে যাচ্ছে অথচ সুবলের দেখা নেই। তার হিসাব-নিকাশ, তহবিল মিলানো আর হয় না। টাকা-কড়ির মুখ এই প্রথম কেবল দেখা আরম্ভ করেছে কিনা সুবল। মত্ততা তো থাকবেই। মনে মনে হাসলো নবদ্বীপ। অবশ্য সুবল যদি বলতো তার দেরি হবে তা হ'লে নবদ্বীপ আর তার জন্য অপেক্ষা করত না। এতক্ষণ প্রায় বাড়ি ধরধর হোত। কিন্তু এখন একা একা যেতে ভালো লাগে না। তা ছাড়া অন্য কারো চেয়ে সুবলকে সঙ্গী হিসাবে পেতেই বেশি ভালো লাগে নবদ্বীপের।

গরহাটবারের দিনগুলিতে বেচাকেনা যা হবার সকালে বাজারের সময়েই প্রায় শেষ হয়ে যায়। বিকালের দিকে দু একজন পাইকার আসে, আসে সমবয়সী অন্যান্য দোকানদাররা, তামাক খায়, পাঁচ রকমের কথাবার্তা বলে, জিনিসপত্রের বাজার দর সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আগে এ সব ব্যাপারে নবদ্বীপের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে বাজারের সবাই তাকে বিচক্ষণ বলে জানে। প্রয়োজনমত অনেকেই তার কাছে এসে বুদ্ধি পরামর্শ নেয়। কারবার

নবদ্বীপের তামাকেরই, কিন্তু এমন কোন জিনিস নেই বাজারে নবদ্বীপ যার খোঁজখবর না রাখে কিংবা ব্যবসা না বোঝে। কিন্তু ইদানীং মাঝে মাঝে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ে নবদ্বীপ, কেমন যেন অন্যমনস্ক বীতস্পৃহ দেখা যায় নবদ্বীপকে। গানবাজনা, কীর্তন, ভাগবত যদি কোথাও হয় কাছে ধারে, নবদ্বীপকে আসরের মধ্যে গিয়ে বসতে দেখা যায়। দেখে মনে হয় সে যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে রস গ্রহণের জন্য, চিত্তবিনোদনের জন্য অন্য কোন অবলম্বন যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে নবদ্বীপ, শুধু কারবারপত্রে তার মন আর যেন আটকে থাকতে চাচ্ছে না। কিন্তু এ ধরণের মনোভাব বেশি দিন থাকে না নবদ্বীপের। হঠাৎ আবার একদিন ব্যবসায়ে তার দ্বিগুণ মনোযোগ দেখা যায়। কাজ-কর্মের শৈথিল্যের জন্য কর্মচারীদের ধমকায়। খুচরো খদ্দেরদের একটা পয়সাও ছাড়তে চায় না।

একটু পরেই নবদ্বীপের ছোকরা কর্মচারী রাখাল এসে ঘরে ঢুকলো। নবদ্বীপ বলল, 'কি বলল, হয়েছে তার ?'

রাখাল জবাব দিল, 'আজ্ঞে বললেন তো আসছি, তুই যা।'

নবদ্বীপ একটু হতাশব্যঞ্জক ভঙ্গী করে বলল, 'তবেই হয়েছে, তার 'আসছি' মানে তো আরো এক ঘণ্টা।'

কিন্তু এক ঘণ্টা লাগলো না, তার আগেই এসে সুবল আজ উপস্থিত হোল। খেয়াঘাটে যাওয়ার পথটায় চট বিছিয়ে হলুদ, আদা, শুকনো লঙ্কা বিক্রি করে সুবল।

সুবল হ্যারিকেন ধরিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, ঘরে ঢুকেই বলল, 'চলুন জ্যেঠামশাই। গাজনহাটির একজন পাইকার এসেছিল, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে একটু দেরি হয়ে গেল, তা বিনোদের কীর্তন আরম্ভ হতেও দেরি আছে। সবে তো সন্ধ্যা হোল।'

নবদ্বীপ একটু যেন লজ্জিত হয়ে বলল, 'কীর্তনের জন্য আর কি।

বিনোদের কীর্তন যেন শুনিই না কোনদিন। সেজন্য নয়। রাত-বিরাতে চলা-ফেরা করতে ভারি অসুবিধা হয় সুবল। যে পথটুকু আগে এক লাফে পার হয়েছি এখন সেই পথে নামলেই চিন্তা হয় কখন ফুরোবে। রক্তের জোর কি আর চিরকাল সমান থাকে মানুষের ?'

নবদ্বীপের দিকে চেয়ে বেশ একটু মায়াই হয় সুবলের। এই ক'বছরে নবদ্বীপ যেন হঠাৎ বড় বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছে। বয়সও অবশ্য সত্তরের কম হয়নি। কিন্তু কিছুদিন আগেও তার বয়সটা এমন স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যেত না। তা ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বহুদিনের ব্যাধি অম্লশূলটাও বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে নবদ্বীপকে ভারি কাতর হয়ে পড়তে দেখা যায় আজকাল। এক একবার মনে হয় এ যাত্রা বুঝি আর টিকবে না। কিন্তু অদ্ভুত বুড়োর জান্। দুদিন যেতে না যেতেই আবার বেশ শক্ত হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে খাদ আছে রাস্তায়। বর্ষার সময় যাতে নৌকা বেরোতে পারে সেজন্য জায়গায় জায়গায় খানিকটা ফাঁক রাখা হয়েছে। এ সব জায়গায় পাকা পুল করে দেবার জন্য টাকা নাকি মঞ্জুর হয়েই আছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একখানা তক্তাও দেখা গেল না। বর্ষার সময় কাছাকাছি যাদের বাড়ি তারাই জুটে বাঁশের সাঁকো বেঁধে কাজ চালিয়ে নেয়। একটা মোটা বাঁশ থাকে পায়ের নীচে আর খানিকটা উঁচুতে অপেক্ষাকৃত সরু একটা বাঁশ বেঁধে দেওয়া হয় হাত দিয়ে ধরবার জন্য ; কিন্তু জল শুকাতে না শুকাতে যে যত আগে পারে তাড়াতাড়ি সাঁকোর বাঁশ আর খুঁটোগুলি সরিয়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগায়।

ওঠানামা করতে, বিশেষ করে রাত্রে সত্যিই বেশ একটু কষ্ট

হয় আজকাল। একটা জায়গায় নামতে নামতে নবদ্বীপ খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'না, আর পারিনে বাপু, একবার ঘাড় ধরে নামাবে আর একবার কান ধরে ওঠাবে। এর চেয়ে আগের মেঠো পথই ছিল ভালো।'

ফিরে দাঁড়িয়ে সুবল হাত ধরে উঠতে সাহায্য করে নবদ্বীপকে। তার শক্ত সবল মুঠির মধ্যে লোল চর্ম, অস্থি-সর্বস্ব বুড়োর হাতখানা অসহায়ভাবে নিস্পন্দ হয়ে থাকে। অদ্ভুত অনুভূতি জাগে সুবলের মনে। এই মুহূর্তে নবদ্বীপকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সে যেন ভাবতেই পারে না। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সে অনুভব করে নবদ্বীপের সঙ্গে। সস্নেহ ভৎর্সনার ভঙ্গীতে বলে, 'উঠতে নামতে পারেন না সে কথা বললেই তো পারেন। তাতো নয়, নিজের গোঁ মত চলে এলেন চিরকাল। সব বয়সেই কি তা চলে? পড়ে টড়ে গিয়ে একটা বিপত্তি ঘটিয়ে বসবেন আর কি। আর সে মেড়াটাকেই বা বাড়িতে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছেন কেন; সে কি এখন এসব দেখা-শোনা করতে পারে না?'

ছেলের ওপর যত বিদ্বেষভাবই থাকুক, নিজে যত গালাগালিই করুক, অন্যে সামান্য কিছু বললেও নবদ্বীপের কেমন যেন অসহ্য হয়ে ওঠে। তবু এক্ষেত্রে স্পষ্টত সুবলের সে প্রতিবাদ করে না, বলে, 'তবেই হয়েচে। ওর হাতে দেখাশোনার ভার দিলে দুদিনের মধ্যেই সব লোপাট হয়ে যাবে, দেখাশোনার আর কারো দরকারই হবে না তখন। কোন কাণ্ডজ্ঞান কি জন্মেছে ওর? একটা দশ বছরের ছেলের যে বুদ্ধি আছে ওর তাও নেই।'

নবদ্বীপের কথার ভঙ্গীতে মনে হয় বুদ্ধি না থাকাটা সত্যিই যেন তেমন দোষের নয় মুরলীর পক্ষে। আর আসলে দশ বছরের বেশি বয়স যেন মুরলীর হয়নি আজো।

সুবলের মন আবার একটু একটু করে বিরূপ হতে থাকে। মুরলীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'তা ছাড়া রাত্রে তো আপনি দোকানেই থাকতে পারেন ইচ্ছা করলে। আসা-যাওয়ার এমন কষ্ট তাহ'লে রোজ রোজ আপনাকে পেতে হয় না।'

সুবলের এ পরামর্শও নবদ্বীপ খুব ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারে না, বলে, 'এক একদিন তো তাই ভাবি যাবো না আর বাড়িতে, তেমন কোন টান তো আর নেই যে আসতেই হবে, তবু থাকতে পারি কই।'

খানিকটা দূর থেকেই বিনোদের বাড়ির খোলের আওয়াজ শোনা যায়। গানের পদ বোঝা যায় না, কিন্তু বিনোদের দরাজ সুমিষ্ট গলা এতদূর পর্যন্ত ভেসে আসে। এদিক থেকে পাড়ায় ঢুকে দুতিনখানা বাড়ির পরই বিনোদের বাড়ি। বাড়িগুলির ওপর দিয়ে যেতে নবদ্বীপ আর সুবলের চোখে পড়ে বাড়ি কয়েকখানায় যেন আর জনপ্রাণী নেই। একেকখানা বাড়িতে অনেকগুলি করে শরিক। ঘরগুলির বেশির ভাগই তালাবন্ধ। সব বিনোদের কীর্তন শুনতে গিয়েছে। দু'একখানা ঘরে কেবল মিট মিট করে আলো জ্বলছে। নিতান্ত নতুন বউ যারা তারাই দু'একজন রয়েছে বাড়ি পাহারা দিতে।

বিনোদের বাড়িতে পা দিতেই দেখা গেল বিনোদ বিনয় করে যেমন বলেছিল আসর তত ছোট হয়নি। উঠানে, আনাচে-কানাচে একটুও ফাঁক নেই দাঁড়াবার মত। সমস্ত বাড়িটা লোকে একেবারে ভরতি হয়ে গেছে। দক্ষিণপাড়া থেকে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা এসে একদিকে বসেছে। পূবের দিকে একটা কোণ ঘেঁসে বসেছে নমঃশূদ্রের দল। কিন্তু তাদের সংখ্যা বেশি নয়। এই পাড়ার লোকেই বাড়ি ভরে গেছে। ঘরের ভিতর, বারাণ্ডায়, পাড়ার ঝি-বউরা গিস গিস করছে।

নবদ্বীপ আর সুবলকে দেখে পাশের বাড়ির ফটিক সম্বর্ধনা করে বলল, 'আসুন ঠাকুরদা, এসো সুবলকাকা।'

তারপর চাপাচাপি করে ফটিক তাদের বসবার জায়গা করে দিল। বিষ্টু সা হুঁকোটা টান দিয়ে বলল, 'ধর হে নবুদা।'

নবদ্বীপ হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল, কিন্তু টান দেওয়ার আগে বিষ্টুকে একবার জিজ্ঞাসা করল, 'আছে কিছু এতে?'

বিষ্টু সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, 'টান দিয়েই দেখ।'

দীঘলকান্দি থেকে নন্দকিশোর গোঁসাই এসেছেন। আসরের মাঝখানে বড় একখানা আসন পেতে তাঁকে বসানো হয়েছে। চোখে চোখ পড়তে দূর থেকেই দণ্ডবৎ হয়ে নবদ্বীপ তাঁকে প্রণাম করল। নন্দকিশোর স্নিগ্ধ একটু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

কীর্তন তখন বেশ জমে উঠেছে। আশেপাশে দুতিনখানা খোলের মৃদু মৃদু আওয়াজ হচ্ছে। মন্দিরা বাজছে কয়েক জোড়া। বিনোদই মূল গায়েন। গোঁসাইকে বিনোদ প্রথমে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তিনি পাল্টা বিনোদকেই অনুরোধ ক'রে গান গাইতে বলেছেন। নন্দকিশোর আজকাল আর তেমন পরিশ্রম করতে পারেন না। তাছাড়া তেমন গলাও আর নেই। নন্দকিশোর বলছেন, 'নিজের বাড়ি ব'লে বুঝি সঙ্কোচ হচ্ছে তোমার বিনোদ? কিন্তু আসল ভক্তের কি আর নিজের বাড়ি অন্যের বাড়ি আছে? আমি বলছি তুমি গাও। এতগুলি লোক এসেছে তোমার গান শোনবার জন্য। এ তো কথকতা নয় যে আমার নাম শুনে তারা আসবে।'

নন্দকিশোর অত্যন্ত স্নেহ করেন বিনোদকে। শিষ্য তো এ পাড়ায় প্রায় তাঁর সকলেই, কিন্তু বিনোদকে তিনি শিষ্যের মতন দেখেন না, ছোট ভাইয়ের মতই দেখেন। অবশ্য বিনোদ নন্দকিশোরের সাক্ষাৎ শিষ্য নয়, তাঁর বাবার শিষ্য। কিন্তু বিনোদের সঙ্গে তাঁর

অদ্ভুত অন্তরঙ্গতা। নন্দকিশোরের নিজের ছেলেমেয়ে কিছু নেই। কথকতা ক'রে এবং শিষ্যবাড়ি থেকে যা আয় হয় তা তিনি নিজের খেয়ালেই ব্যয় করেন। মাঝে মাঝে তীর্থপর্যটনে বের হন, বিনোদ যায় সঙ্গে। কোন জায়গায় কীর্তন কথকতার আমন্ত্রণ পেলে বিনোদকে তিনি সঙ্গে নিতে ভোলেন না। বাড়ি থাকলে বিনোদ ডাকামাত্রও তিনি চলে আসেন। ঠিক শিষ্যবাড়িতে আসার মত এখানে আসেন না, বিনোদের বাড়ি যেন তাঁর নিজেরই বাড়ি। বিনোদের অবস্থার কথা জেনে নিজের গাঁট থেকেই পয়সা খরচ করেন এখানে এসে। বিনোদ মাঝে মাঝে জিভে কামড় দিয়ে বলে 'আপনার কাছ থেকে টাক নিতে হবে গোঁসাইদা, বলেন কি!'

নন্দকিশোর হেসে বলেন, 'তোর সংসার চালাবার জন্য তো আর দিচ্ছি না. এ দিচ্ছি ভক্তদের সেবার জন্য, তা আমার বাড়িতেও যা তোর বাড়িতেও তাই।'

আজও গোঁসাইদার পায়ের ধুলো নিয়ে বিনোদ আসরে নেমেছে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই নিজের ভাবে বিনোদ নিজেই এত বিভোর হয়ে গেছে যে, মনে হয় তার বাহ্যজ্ঞান কিছুমাত্র নেই। একখানা গরদের কাপড় বিনোদের পরণে। সাধারণত কীর্তন ভাগবৎ ইত্যাদির সময় এই কাপড়খানাই সে পরে নেয়। ফুল কোঁচাটা সামনে ঝুলানো। গায়ে কোন আবরণ নেই। তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ওপর কোন আবরণের প্রয়োজনই যেন হয় না। কেবল মাজায় একখানা রঙীন নীল চাদর বাঁধা। শীতে হোক্, গ্রীষ্মে হোক্, এই চাদরখানা প্রায় সব সময়েই সঙ্গে রাখে বিনোদ। ভারি পছন্দ করে বোধ হয় এখনো। কোমর খানিকটা বাঁকিয়ে, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বিনোদ তখন গাইছে, 'তোরা কে কে যাবি আয় রে, মন্মথ যায় রে।'

সমস্ত গোপীনীদের মন মথন ক'রে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপরূপ ভঙ্গিতে পথ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। জীবন যৌবন মন প্রাণ সমস্ত তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে।—'মন্মথ যায় রে।'

যতবার এই কলিটুকু বিনোদ তার অপরূপ সুর ও ভঙ্গিতে ফিরে ফিরে ধরছে, ততই এই অংশটুকুর মাধুর্য যেন বেশী নিবিড় হয়ে উঠছে।

এই দুটি লাইন আরও কতদিন পাড়ার লোক শুনেছে। কিন্তু প্রতিবারই বিনোদের কণ্ঠে যেন তা নতুন হয়ে ওঠে—তার মাধুর্যের শেষ হ'তে চায় না। কীর্তন গাইবার সময় বিনোদ নিজে এত মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়ে যে, তার মুগ্ধতাই যেন সকলের মনে সংক্রামিত হয়ে যায়। ঘন ঘন বিনোদের রোমাঞ্চ হ'তে থাকে, চোখের জল বাধা মানে না। অভিভূত ও আবিষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে যে অদ্ভুত আরাম আছে, বিনোদের সঙ্গে সকলেই যেন তার অংশ গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করে কৃতজ্ঞ হয়। এই বিনোদ যে পাড়ার সেই বিনোদ সাধু—যার সারল্য নিতান্তই বোকামির সামিল, যার বিষয়বুদ্ধিহীনতা মূঢ়তার নামান্তর মাত্র, একথা এই মুহূর্তে ধারণায় আনা যেন সম্ভবপর হয় না। শুধু নিজের গভীর আবিষ্টতা আর সুমিষ্ট কণ্ঠের সাহায্যে অতিপরিচয়ের তুচ্ছতা থেকে বিনোদ যেন তার চারদিকে ক্ষণিকের জন্য অপরিচয়ের এক মায়ামণ্ডল সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে থেকেও যেন সে নেই, যেন অনেক দূরে চলে গেছে—হাত দিয়ে যেখানে ওরা ওকে স্পর্শ করতে পারছে না, ধারণায় আনতে পারছে না মনের ভাবনা বেদনা দিয়ে।

এসব ব্যাপারে খুব গভীরভাবে আবিষ্ট কোনদিনই হ'তে পারে না নবদ্বীপ। এক সময়ে এ ধরণের মাতামাতিটাকে সে বেশ পরিহাসের চোখেই দেখত, দশায় পড়ে গড়াগড়ি যাওয়াটাকে তার

কাছে ভক্তির লোকদেখানো আতিশয্য বলে মনে হোত। কিন্তু পাড়ার দু'চারজন চ্যাংড়া ছেলেই এ ধরণের সমালোচনা করে, বুড়ো হয়ে এ ধরণের মনোভাব তার পক্ষে যেন মানায় না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের যেন একটু দুর্বলতাই এসেছে এসব বিষয়ে। লোকে যেন না বলে, বুড়ো হয়েও লোকটার স্বভাব বদলালো না। নবদ্বীপের মনে হয়, না-বদলানোটাই বার্ধক্যের পক্ষে অশোভন।

আট ন' বছরের সুন্দরপানা একটি ছেলে নবদ্বীপের পিঠের ওপর বার বার ঝিমিয়ে পড়ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মায়া হলেও পিঠের শুকনো হাড়ের ওপর বার বাব ছেলেটি এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ায় শারীরিক কষ্টই হচ্ছিল নবদ্বীপের। অবশেষে এক সময় নবদ্বীপ বেশ একটু ঝাঁজিয়ে উঠল, 'কে রে ছোঁড়া, ঘুম পাচ্ছে তো চলে যা না বাড়িতে।'

বিষ্টু সা পাশেই বসেছিল। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'আয়রে নিমু এদিকে আয়। একে চিনতে পারলে না নবুদা? এ আমার নাতি, মেজ ছেলে মুকুন্দর ঘরের।'

বিষ্টু সার নাতি হলেই যে তার নবদ্বীপের পিঠের ওপর ঢুলে পড়বার অধিকার জন্মাবে তা নয়। তবু অভিভাবকের সামনেই ছেলেটিকে অমন করে ধমকানোর জন্য বেশ একটু লজ্জিত হোল নবদ্বীপ। বলল, 'ওঃ, তোমার নাতি? তাই বলো। তা ওকে এখন কারো সঙ্গে বাড়িতেই পাঠিয়ে দাও না বিষ্টু, ছেলে মানুষ, কেন মিছামিছি কষ্ট পাচ্ছে।'

অনেক সময় চোখেই ঠাহর হয় না, অনেক সময় আবার পরিচয় না করিয়ে দিলে সমবয়সীদের এসব পৌত্রপ্রপৌত্রদের যথার্থই চিনতে পারে না নবদ্বীপ। লোক কি কম হয়েছে পাড়ায়। কোণে

ফাঁপাচে যেখানে যে যতটুকু জায়গা পেয়েছে কেবল ঘর তুলেছে। লাগা-লাগা ঘিচি-ঘিচি সব ঘর, আর এক একটা ঘরে লোকজন ছেলেপুলে একেবারে ঠাসা। নবদ্বীপ আর একবার আসরটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। সমস্ত বাড়িটায় তিল ধরবার জায়গা নেই। ভাবলে বিস্ময় লাগে, একই বংশের একই গোষ্ঠীর লোক এরা। কোন বাড়িতে কেউ হলে কি মরলে পাড়াশুদ্ধ এখনো প্রায় সকলেরই অশৌচ হয়। কারো বা ডুব মাত্র, কারো বা তিন দিন, আর দু-এক পুরুষের মধ্যে হোলে তিরিশ দিন। এমনো হয়, একই ঘরে বুড়োকর্তার হয়তো একমাসই অশৌচ পড়ল, আর তার নাতিনাতনীরা ডুব দিয়ে মুক্ত হয়ে এলো। সব এরা পরস্পরের জ্ঞাতি। কিন্তু জন্মমৃত্যু ছাড়া সব সময় কি সে কথা মনে রাখা যায়?

বিষ্টু বলল, 'গান কেমন লাগছে নবুদা?'

নবদ্বীপ মাথা নাড়ল, 'না, যত ঠাট্টাতামাসাই করি না, গানের নিন্দা কেউ করতে পারবে না বিনোদের।'

কোন সাজ-পোষাক নেই, সিন-সিনারিও নেই, নতুন কোন বিষয়বস্তুও নেই। সেই চিরকালের রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা, তাও গাইছে পাড়ারই বিনোদ, তবু লোক জমতে বাকি থাকেনি।

কীর্তনও ক্রমেই বেশ জমে উঠছিল। শ্রোতাদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলাপ আলোচনাটা কোন কোন জায়গায় এক আধটু শ্রুতি-গোচর হয়ে উঠলেই ফটিক সা দাঁড়িয়ে উঠে কড়া ধমক দিচ্ছিল। মায়ের কোলে শিশুরা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠলেও ফটিক বিরক্তি গোপন না করে চেঁচিয়ে উঠছিল, 'মাই দিন মুখে, মাই দিন।'

এসব সামান্য গোলমালে তেমন কোন রসভঙ্গ হচ্ছিল না। হঠাৎ বিনোদের বাড়ির পিছনে কলাবাগানটার দিকে একটু বেশী রকমের সোরগোল উঠলো যেন। ইতিমধ্যেই কয়েকজন লোক উঠে গিয়ে

ওদিকে ভিড় জমিয়ে তুলেছে। শান্তিরক্ষক ফটিক তাদের বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'কি ব্যাপার, হয়েছে কি? গানটাকে কি তোমরা মাটি না করে ছাড়বে না?'

দু'হাত দিয়ে ভিড় সরিয়ে ফটিক আরো এগিয়ে যেতেই মুরলীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুরলী কোন রকমে যেন পাশ কাটিয়েই যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু ফটিক একেবারে সামনা-সামনি জিজ্ঞাসা করে বসল, 'সোরগোল কিসের?'

মুরলী নিমেষের জন্ত একটু থমকে গেল তারপর সপ্রতিভ-ভাবে বলল, 'যেতে দাও, যেতে দাও, মেয়েদের সোরগোল, তার আবার একটা মাথামুণ্ডু আছে নাকি?'

ফটিক বলল, 'কিন্তু ব্যাপারখানা কি?'

ততক্ষণে কীর্তন রেখে আরো অনেকে এসে চারদিকে ঘিরে ধরেছে, এত কলরোলের মধ্যেও দুতিনজন প্রৌঢ়ার তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, 'ছি ছি ছি, বুড়ো হয়ে গেল, তবু স্বভাব বদলালো না।'

'নিজের মেয়ের বয়সী একটা মেয়ে—'

'পাড়ায় কি পুরুষ আছে কেউ, সব ভেড়ার দল, না হলে এই লোক কি উঠে আবার এতদিন ধানের ভাত খেতে পারত? একদিন ধরে হাড়গোড় গুঁড়ো করে দিত না?'

নিজেদের শক্তির ওপর এই কটাক্ষে পুরুষরা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল, নানারকম গালিগালাজ শাসন তিরস্কারের ঝড় ছুটলো, কিন্তু সাহস করে সহসা কেউ হাত তুলল না মুরলীর গায়ে, বিষয়টা কি তাও পরিষ্কার ক'রে বোঝা গেল না। ততক্ষণে নবদ্বীপ আর সুবল এসে দাঁড়িয়েছে। নন্দকিশোরও উঠে এসেছেন আসন ছেড়ে।

নবদ্বীপ বলল, 'আগে এদের একটু থামিয়ে দাও তো সুবল, বিষয়টাই শুনব, না এদের গোলমালই শুনব ?'

সুবলের কিছু বলতে হোল না। নবদ্বীপের গলায় আগের মত জোর আজকাল না থাকলেও ধমক দেওয়ার ভঙ্গিটি তেমনই আছে। গোলমাল অনেকটা কমে গেল। তাছাড়া সবারই মনে হোল, ঠিক কথা, ঘটনাটাই ভালো ক'রে শোনা হয়নি এখনো।

যে কয়েকজন প্রৌঢ়া একেবারে পুরুষের ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল নবদ্বীপ তাদের একজনকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল, সত্যি করে বল তো নন্তুর মা, ব্যাপারখানা কি ?'

এত লোক থাকতে তাকেই হঠাৎ ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করায় নন্তুর মা প্রথমটা যেন একটু ঘাবড়ে গেল। কিন্তু পর মুহূর্তেই সে বেশ আত্মস্থ হয়ে উঠল। নবদ্বীপের সুরটা এমনি, যেন এই গোলমালের জন্ম নন্তুর মাই দায়ী। যেন নন্তুর মাই এই ঘটনাটাকে তৈরী ক'রে তুলেছে। আর অকারণে নবদ্বীপকে এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে আসতে হয়েছে বলে যেন নবদ্বীপের বিরক্তির অবধি নেই। নন্তুর মার ওপর নবদ্বীপের কেমন একটা আক্রোশ বহুদিন থেকেই আছে তা এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল। মাথার কাপড়টা আর একটু নামিয়ে দিল নন্তুর মা, কিন্তু গলা মোটেই নামাল না; বেশ চড়া ঝাঁঝালো সুরেই জবাব দিল, 'সত্যি কথাই বলব, কারো ভয়ে ইঁদুরের গর্তে গিয়ে ঢুকবে এমন বাপের ঝি নন্তুর মা নয়। কি হয়েছে জিজ্ঞেস ক'রে দেখনা রঙ্গীকে ?'

রঙ্গী নামে কারো কথা সহসা নবদ্বীপের মনে পড়ল না, বেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'আবার রঙ্গীকে ধরে টানাটানি কেন, তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, যদি কিছু জানো তুমিই বলনা। চেঁচাচ্ছিলে তো তুমিই সবচেয়ে বেশি।'

নম্বুর মা তেমনি ধারালো গলায় জবাব দিল, 'রঙ্গীকে নিয়ে টানাটানি আমি করতে যাইনি, গিয়েছিল তোমার গুণধর ছেলে, কেন গিয়েছিল তাকেই জিজ্ঞাসা কর। নিজের মেয়ের বয়সী একরত্তি একটা ছুঁড়ী, তার হাত ধরে টানতে যায়, লজ্জাও করে না, ঝাঁটা মারতে হয় অমন হতভাগার মুখে। সেই ছেলের হয়ে উনি আবার ওকালতি করতে এসেছেন।'

মুহূর্তের জন্য নবদ্বীপ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। কিন্তু নবদ্বীপ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুরলী রুখে উঠল, 'এসব তোমার একেবারে নিজের চোখে দেখা, না ছোট জ্যেঠি ?

কিন্তু নম্বুর মা কিংবা আর কেউ কিছু বলবার আগেই নিজের ছেলের ওপরই ঝাঁজিয়ে উঠল নবদ্বীপ, 'সরে যা, সরে যা এখান থেকে, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা, লজ্জা করে না মুখ ফুটে আবার কথা বলছিস তুই ?'

সকলের সামনে মুরলীকে ওভাবে তিরস্কার করায় অনেকেই খুশি হয়ে উঠল নবদ্বীপের ওপর। না, কেবল ছেলের পক্ষ টেনে কথা বলবার লোক নবদ্বীপ নয়। তাহ'লে পাড়ার মাতব্বর বলে দশজনে তাকে এমন ক'রে মানত না।

ছেলেকে তিরস্কার ক'রেই নবদ্বীপের গলা আবার স্বাভাবিক পর্দায় নেমে এল। বেশ কোমল, মধুর স্বরে নবদ্বীপ বলল, 'কিন্তু তুমি যে অসম্ভব কথা বলছ নম্বুর মা।'

এ যেন শুধু একটা প্রতিবাদ নয়, এ নবদ্বীপের স্থির দৃঢ় বিশ্বাস। এর প্রতিবাদ নম্বুর মার মুখ দিয়েও সহসা বেরুল না। নবদ্বীপ বলল, 'তবু কথাটা যখন উঠেছেই সংশয় ভঞ্জন হওয়াই ভালো। বেশ, তুমি যখন নিজের চোখে কিছু দেখনি, রঙ্গী না বেঙ্গী কারু কথা বললে, তাকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।'

বিষ্টু সা বলল, 'থাক না নবুদা, যেতে দাও যেতে দাও, যত সব—,
নবদ্বীপ মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, তা হয় না, ব্যাপারটার একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাওয়াই ভালো বিষ্টু, না হ'লে অনেকের মনেই হয়তো একটা খুঁতখুঁতি থেকে যাবে। ডেকে আনো রঙ্গীকে।'

সুবল এতক্ষণ প্রায় চুপ ক'রেই ছিল, এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি যে বলেন জ্যেঠামশাই! এই ভীড়ের মধ্যে সোমত্ত মেয়েটাকে না নিয়ে এলেই আপনার চলবে না। সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছে, কেলেঙ্কারির ওপর একটা কেলেঙ্কারি করবেন আপনি। জিজ্ঞাসাবাদ যদি কিছু করতেই হয়, বিনোদের ঘরের মধ্যে চলুন।' তারপর যারা চারদিকে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল সুবল তাদের তাড়া দিয়ে উঠল, 'যাও, হয় আসরে গিয়ে ব'স, না হয় বাড়ি চলে যাও। কোত্থেকে একটু গন্ধ পেয়েছে আর সব মাছি এসে উড়ে পড়েছে,—সব সমান।'

যেতে যেতে কে একজন অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল, 'বাবারে বাবা, গন্ধ তোমরা বের করতে পারো আর আমাদের নাকে গেলেই দোষ!'

বিনোদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কীর্তন আর নতুন ক'রে জমে উঠল না। অগত্যা কীর্তন বন্ধ ক'রে দিতে হোল বিনোদকে। নিজের বাড়ির ওপরই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটায় তার কুণ্ঠা আর লজ্জার অবধি রইল না। সকলের কাছে হাত জোর ক'রে বিনোদ বলতে লাগল, অবিলম্বেই আর একদিন সে আয়োজন করবে কীর্তনের। সেদিনও যেন সকলের পায়ের ধুলো পড়ে এখানে।'

এসব গোলমালে রঙ্গীর মার শরীর কাঁপছিল থর থর ক'রে। ভারি সাদাসিধা আর ভীতু ধরণের বৌ সুলোচনা। এতদিন বিয়ে হয়েছে, কিন্তু কেউ এপর্যন্ত তার ঘোমটা একটু খাটো হ'তে দেখেনি কিংবা বড় ক'রে কথা বলতে শোনেনি তাকে। লক্ষ্মী, লজ্জাশীলা বউ হিসাবে

বেশ সুনাম আছে তার পাড়ায়। সুলোচনা এসেছিল তার বিধবা জায়ের সঙ্গে। সম্পর্কে জা হ'লেও বয়সে প্রায় সুলোচনার মার বয়সী মানদা। নিজের ছেলেপুলে কিছু নেই। জা'র ছেলেমেয়ের ওপর বেশ স্নেহ আছে মানদার। পৃথগন্নে থাকলেও এবং খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধালেও মধু তার বউদির ওপর খুব নির্ভর করে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে প্রায়ই গাওয়াল ক'রতে বের হয় মধু। চারপাঁচ দিনের মধ্যে আর ফিরে আসে না। তার স্ত্রীপুত্রের দেখাশোনা এই মানদাই তখন করে।

সুলোচনাকে কাঁপতে দেখে মানদা বলল, 'অমন ভয় পাচ্ছিস কেন ছোট বৌ। শুনিই না ব্যাপারটা কি হয়েছিল, যদি অন্যায় কিছু করে থাকে বড়লোকের ছেলে বলে ছেড়ে কথা বলব নাকি আমরা, তা মনেও করিস না।'

সুলোচনা বলল, 'না দিদি, শোনাশুনির আর দরকার নেই। বাড়ি চল। আমি আসতেই চাইনি ; এপাড়ার ভাব-সাব আমার জানতে বাকি নেই। এরা নিজের মাংস নিজে খায়। ওবছর মাত্র বিয়ে হয়েছে মেয়ের, জামাইর কানে যদি এসব কথা ওঠে কি হবে বল দেখি। এমেই ওরা দিতে চায় না মেয়েকে, এরপর তো আনবার কথা তোলাই যাবে না। যাক, যা আমার কপালে আছে তাতো কেউ খণ্ডাতে পারবে না, এখন বাড়ি চল।'

কিন্তু বাড়ি চল বললেই চলা যায় না। অন্য সব মেয়ের দল এসে ততক্ষণে রঙ্গীকে ঘিরে ধরেছে, কারোরই কৌতূহলের শেষ নেই। অসহায়ভাবে সুলোচনার মনে হোল, এই ভিড়ের মধ্য থেকে মেয়েকে উদ্ধার ক'রে সে বুঝি আর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না।

এমন সময় আসতে দেখা গেল সুবলকে। একটু দূর থেকেই সুবল ধমকের সুরে বলল, 'আবার জটলা পাকানো হচ্ছে। যাও, বাড়ি যাও

সব।' তারপর মানদাকে লক্ষ্য ক'রে বলল, 'বউঠান, রঙ্গীকে নিয়ে একবার এসো তো এ ঘরে।'

মানদা মাথার কাপড় টেনে দিয়ে অনুচ্চ কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তদন্ত তল্লাসের কোন দরকার নেই আমাদের, অমনিতেই যথেষ্ট হয়েছে। চল্ রঙ্গী, বাড়ি যাই আমরা।'

সুবল বলল, 'আঃ, কেন মিছে রাগ করছ বউঠান, শুনতেই দাও না আগে ব্যাপারখানা। কোন অন্যায় যদি হয়ে থাকে তার বিধান কি করব না আমরা? কাউকে খাতির ক'রে কথা বলবে, সুবল সা তেমন লোকই নয়।'

ঘর একখানাই, কিন্তু তার মধ্যে তিন চারটে প্রায় খোপ। দুধারে বারাণ্ডা আছে, বারাণ্ডায় ছোটবড় তিনটে ক'রে খোপ। মনে হয়, বিনোদের বাবা যেন অনেকগুলি ঘরের সাধ এই একখানা ঘর তুলে মিটিয়েছিল। এই একটা উত্তরের ভিটে ছাড়া সরিকী অংশে আর কোন স্থান মেলেনি বিনোদের। বড় ঘরের কানাচ দিয়ে পাক করবার জন্য আর একটু চালার মত কোন রকমে কেবল তোলা হয়েছে। ঘরে দামী আসবাবপত্রের অভাব থাকলেও হাঁড়িকুঁড়ি আর দড়ির সিকার অভাব নেই। বিনোদের বাবা যেমন অনেক ঘরের সখ মিটিয়েছিল একখানা ঘর তুলে, তেমনি বিনোদের মা আর বউরও বোধ হয় আসবাব-পত্রের সাধ মিটাতে হয়েছে নানা আকারের হাঁড়িকুঁড়ি জড় ক'রে, আর নানা রঙবেরঙের সিকা তৈরী ক'রে।

রঙ্গীকে নিয়ে সুবল ঘরে ঢুকতেই উপস্থিত সকলের মনে হলো— যত তাচ্ছিল্য ক'রে তার নাম উচ্চারণ ক'রছিল নবদ্বীপ, তত তুচ্ছ করবার মেয়ে এ নয়। মধু সার মেয়ে যে এত সুন্দরী, এটা যেন হঠাৎ আজ সকলের চোখে পড়ল। পনের ষোল বছরের একটি বিবাহিত মেয়ে,—সিঁথিতে সিঁদুর জল জল ক'রছে। কিন্তু এই সিঁদুর স্নিগ্ধ

মাঙ্গল্যের চেয়ে তার প্রসাধনের উগ্রতাই যেন বাড়িয়ে তুলেছে। কোন্ এক রহস্য রাজ্যের যেন সন্ধান পেয়েছে এই মেয়েটি, কোন্ এক ঐশ্বর্য সম্ভারের, যার জন্য তার অহঙ্কার যেন সর্বাঙ্গে ফুটে বেরুতে চাচ্ছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বোধ হয় মনে মনে সম্পর্কের হিসাব করে নবদ্বীপ বলল, 'মধুর মেয়ে বুঝি তুমি—তাই বলো। রেবতীর ছেলে মধু আমার নাতি হয় সম্পর্কে। খুব দূরের নয়। এখনো চার পুরুষের মধ্যে আছে। আমার ঠাকুরদার সঙ্গে ওর ঠাকুরদার বাবা বাড়ির অংশ নিয়ে ঝগড়া ক'রে ওই ভিটেয় গিয়ে ঘর তুলেছিল। বাবার কাছে গল্প শুনেছি। কিন্তু দূরে গিয়ে ঘর বাঁধলেই কি আর আত্মীয়-স্বজন দূরে সরে যেতে পারে। তবে আর রক্তের টানের কথা বলে কেন লোকে, পূর্বপুরুষে যা করেছে করেছে, মধুর বাবার সঙ্গে কোনদিন আমার অসম্প্রীতি ছিল না, বরং বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা করত। মধুও হয়েছে তেমনি। বেশ লোক, কোন সাতে পাঁচে নেই। আর এমন খাটিয়ে ছেলে পাড়ায় আর কাউকে দেখবে না তোমরা। এখন ভাগ্যে যদি বেড় না পায়, তাহলে আর কি করবে। যাকগে বিষয়টা কি হয়েছিল মা—বল দেখি। আমার কাছে আবার লজ্জা কিসের তোমার!'

এ কথায় মাথা নিচু করে মেয়েটি একটু মুচকি হাসল। এ হাসির অর্থ ভাল করে যেন বুঝতে পারল না নবদ্বীপ। কিন্তু একটু পরেই নবদ্বীপ আবার অসঙ্কোচে বলে চলল, 'বুঝতে পারছি, পথ দিয়ে আসতে আসতে তোমাকে দেখে ঠাট্টা পরিহাস করতে গিয়েছিল বোধ হয় মুরলী। ওর ওই অভ্যাস। আসলে লোক যে তত খারাপ তা নয়, কিন্তু ঠাট্টা পরিহাসের বাড়াবাড়ি করতে গিয়েই যত বদনাম রটেছে ওর পাড়ায়। মাত্রা রাখতে জানে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো ওর দাদু-নাতনী সম্বন্ধ। বাড়াবাড়ি করতে যদি গিয়েই থাকে, মনে

দিলে না কেন কান। হতভাগা কোথাকার,' বলে নবদ্বীপ হেসে উঠল। দু একজন জোর করে ঠোঁটের ওপর একটু হাসি টানতে চেষ্টা করলে ও বাকি কয়েকজন সে চেষ্টাটুকুও পর্যন্ত করল না, তাও অবশ্য দৃষ্টি এড়াল না নবদ্বীপের। কিন্তু বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ নেই। ব্যাপারটার এখানেই যেন শেষ হয়ে গেছে ; এরপর আর কিছু বাকি থাকতে পারে না, এমনিভাবেই নবদ্বীপ উঠে পড়ল। 'যাও বেশ রাত হয়ে গেছে, বাড়ি যাও এখন মা জ্যেঠির সঙ্গে। কিছুর মধ্যে কিছু না, মিছামিছি এমন কীর্তনটাই তোমার মাটি হয়ে গেল বিনোদ। ভগবান গলা সত্যি দিয়েছিলেন বটে তোমাকে। জিজ্ঞেস করে দেখ সুবলকে, এই কীর্তন শোনাবার জন্য ওকে আমি বেলা দুপুর থেকে কেবল তাড়া দিচ্ছিলাম। কিন্তু যত রাজ্যের বিভ্রাট দেখ তো! আমার নেই ভাগ্যে তা তুমি করবে কি। লোকের স্বভাব যে তিলকে তারা তাল করে তুলবেই। তাদের জ্বালায়'—বলে নন্তুর মার দিকে একটু কটাক্ষ করল নবদ্বীপ। প্রত্যুত্তরে নন্তুর মা কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুবল তাকে জোর করে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আর কথা নয় জ্যেঠি, বাড়ি যাও, রাত যথেষ্ট হয়েছে।'

' লাঠি তুলে নিয়ে নবদ্বীপ বলল, 'হ্যাঁ, রাত বেশ হয়েছে, কি রকম অন্ধকার দেখছ, আলোটা ধরে আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে কে? সুবল যাবে? আচ্ছা থাক, দরকার নেই, যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে তোমার। বিনোদ তুমিই বল তো কাউকে, আলোটা একটু ধরবে সঙ্গে সঙ্গে।'

বিনোদ বলল, 'চলুন, আমিই যাচ্ছি।'

সুবল বলল, 'থাক না, বিনোদ, তোমার আর কষ্ট করতে হবে না, আলো তো আমার সঙ্গেই আছে। জ্যেঠামশাইকে এগিয়ে দিয়ে একটু ঘুরেই যাব না হয়।'

নবদ্বীপ বলল, 'কীর্তন এভাবে ভেঙে যাওয়ার জন্য আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে বিনোদ। আচ্ছা ভগবান যদি শুনতে দেন কোন দিন, নিজের বাড়িতে বসেই একদিন কীর্তন শুনব তোমার।'

বিনোদ সবিনয়ে মাথা নাড়ল।

৫

নবদ্বীপকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সুবল ফিরে গেল গম্ভীর মুখে। চটি জুতার শব্দ করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল নবদ্বীপ। ঘরখানা অন্ধকার। ঢুকতে ঢুকতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে নবদ্বীপ বলতে লাগল, 'গুঁতো টুতো খেয়ে কোন্‌দিন যে পড়ে মরি তার ঠিক কি। কপালে শেষ পর্যন্ত তাই আছে আমার। এখান থেকে এখন সরে যাওয়াই আমার ভালো। এতখানি রাত হয়েছে, ঘরে সন্ধ্যাটা পর্যন্ত দেওয়ার সময় হয়নি কারো। কত কাজ। দিন রাত তো দেখি কেবল গুজ গুজ, গুজ গুজ।'

গুজ গুজ করবার মত মনের অবস্থা আজ ছিল না মনোরমার। মেয়েকে নিয়ে কীর্তন শুনতে সেও গিয়েছিল বিনোদের বাড়ি। সেখানকার কাণ্ড সে প্রত্যক্ষ করে এসেছিল। পাছে সবাইর কৌতুক এবং অনুকম্পার বস্তু হতে হয় এই ভয়ে আগেই মেয়েকে নিয়ে সে সরে পড়েছিল। ফিরে এসে দেখে, মুরলী তার আগেই এসে বসে আছে বারাণ্ডায়।

'মারের ভয়ে গর্তে এসে লুকিয়েছ বুঝি? লজ্জা করে না মুখ দেখাতে। দড়ি জোটে না গলায় দেওয়ার মত! লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে পারি না আমি।' মনোরমা ঝাঁজিয়ে উঠছিল।

কিন্তু অদ্ভুত সহিষ্ণুতা মুরলীর। শরীরে যেন তার রাগ নেই

একেবারে। এই নিক্রোধ ইদানীং এত বেড়েছে যে স্ত্রীর রাগের উত্তরে প্রায়ই সে রসিকতা করে।

মুরলী বলল, 'তাই তো, এমন সুন্দর মুখ লোককে ডেকে দেখাতে পারো না, বড়ই দুঃখের কথা তো।'

মনোরমা অবাক হয়ে যায়। এই কিছুক্ষণ আগে যে-লোক এমন একটা অপকর্ম করে এসেছে এবং ধরা পড়ে অপমানের একশেষ হয়েছে, সে কি করে এমনভাবে হাসিতামাসা করতে পারে। চক্ষুলজ্জা বলতে কি এক ফোঁটা পদার্থ নেই মানুষটির শরীরে!

শ্বশুরের পায়ের শব্দ আর বিড়বিড় বকুনি শুনে কমিয়ে রাখা হারিকেনের আলোটা আর একটু চড়িয়ে দিয়ে সেটা হাতে করে এঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল মনোরমা। নবদ্বীপের কথা তার কানে গিয়েছিল। অবশ্য কানে যাতে যেতে পারে সেদিকে নবদ্বীপেরও লক্ষ্য ছিল। মনোরমা এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'অন্ধকারে ঢোকেন কেন এসে ঘরে? আপনার পকেটেই তো দিয়াশলাই থাকে। একটা কাঠি জ্বেলে নিলেই পারেন।'

নবদ্বীপ বলল, 'হুঁ, বিড়িটা সিরিটা ধরাবার জন্য একটা মাত্র দিয়াশলাই আমার কাছে থাকে, তাইবা সহ্য হবে কেন? একবেলা যে একমুঠো মুখে দিই বাড়িতে এসে তাও এদের দু'চোখের বিষ। নিজে উপোস করে থেকে তোমাদের গোষ্ঠীর পিণ্ডি যোগাতে পারলেই ভালো হয়, না?'

কোথায় দিয়াশলাইর কাঠি, আর কোথায় বা উপোস করে থাকা। অবশ্য নিজের দিয়াশলাইটার ওপর চিরদিনই একটু বেশি মমতা আছে নবদ্বীপের, পারতপক্ষে একটা কাঠিও সে খরচ করতে চায় না। তার সমস্ত কার্পণ্য এই দিয়াশলাইতে এসে চরমে উঠেছে। এটা বহুদিন মনোরমা কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কৌতুক বোধ করবার

মত মনের অবস্থা সব সময় থাকে না। তা ছাড়া একেক সময় মনোরমার মনে হয় যে, ইচ্ছা করেই নবদ্বীপ এই দিয়াশলাইর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। একটা দিয়াশলাইর কাঠির জন্য সত্যি সত্যিই কি অত মমতা থাকতে পারে লোকের! নবদ্বীপের ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে সেটা কমিয়ে রেখে যাবারও উপায় নেই। ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের আলো জ্বলতে দেখলেই নবদ্বীপ রেগে ওঠে, 'তেল খুব সস্তা হয়েছে বুঝি বাজারে?'

কেরোসিনের ডিবাও জ্বালিয়ে রাখা যায় না। সেটা আরো দপ দপ করে জ্বলে। নবদ্বীপ বলে, 'নবাবের বেটি কোথাকার। রাস্তা থেকে ওর রোশনাই দেখা যায়। আক্কেল দেখ, এমন আলগা ভাবে আলো কেউ জ্বালিয়ে রাখে ঘরের মধ্যে, ঘরদোর না পুড়িয়ে ও ছাড়বে না।'

মহামুস্কিল হয়েছে মনোরমার বুড়ো শ্বশুরকে নিয়ে। তার ঘরে আলো জ্বালালেও দোষ, না জ্বালালেও দোষ।

হ্যারিকেন হাতে নীরবে মনোরমা গিয়ে ঘরে ঢুকল। গাড়ু আর গামছা ছিল দরজার একটা পাল্লার আড়ালে, তা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমি পাকের ঘরে যাচ্ছি।'

মনোরমা চলে যাবার উদ্যোগ করতেই নবদ্বীপ বাধা দিয়ে বলল, 'শোন।'

মনোরমা ফিরে দাঁড়ালে নবদ্বীপ বলল, 'ওর জন্য আমাকে কি এখন দেশত্যাগী হতে বল তোমরা? আমি যতক্ষণ আছি ততক্ষণ, তারপর একবার চোখ বুজলে হাড়গোড় ভেঙ্গে ওকে যদি লোকে রাস্তায় ফেলে না রাখে তো কি ব'লেছি আমি।'

মনোরমা বলল, 'সে যা হবার হোক, আমি আর কিছুর মধ্যে

নেই আপনাদের। আমাকে দিয়ে আসুন রসুলপুরে। চোখের ওপর কতকাল আর মানুষ এসব সহ্য করতে পারে।

নবদ্বীপ বলল, 'আমি করছি কি করে! আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ দেখি, কত শান্তি আমার মনে।'

বহুদিন বাদে পুত্রবধূর সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলবার অবকাশ এসেছে নবদ্বীপের। অনেক দিন ধরে মনোরমা যেন বহু দূরে সরে ছিল। স্বামীর স্বভাবের সঙ্গে ইদানীং বেশ একটা বনিবনাই যেন করে নিয়েছিল মনোরমা। যা কোনদিন সারবে না তার জন্য ক্ষোভ করে আর অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি। কিছুতেই যেন কিছু এসে যায় না, এসব অনাচার কদাচারে কোনরকম আপত্তিই যেন মনোরমার নেই, এমনি সহিষ্ণুতাই সে অভ্যাস করছিল। এসব ঘটনা এক আধটু মাঝে মাঝে ঘটা সত্ত্বেও মনোরমা মুরলীকে আদরযত্নের ত্রুটি করত না, বরং ইদানীং তার সোহাগটা নবদ্বীপের কাছে যেন বেশ একটু বাড়াবাড়ি মনে হোত। বয়সের সময় খুব মান অভিমান, কপাল চাপড়াচাপড়ি করে এখন পীরিতের জোয়ার এসেছে মনোরমার মনে। অথচ নবদ্বীপের এতে খুশি হওয়াই উচিত ছিল। প্রথম থেকে মনোরমাকে এই ধরণের নির্দেশ উপদেশই তো সে দিয়ে আসছে। 'আমি পুরুষ মানুষ, সব কথা তো তোমাকে বলতে পারিনে বউমা, তোমার শাশুড়ী থাকলে বলতে পারত, শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে পারত। মেয়ে মানুষের অত তেজ, অত জেদ কি ভালো বউমা, মেয়ে মানুষের মনের আগুন মনেই রাখতে হয়, বার করে দিলে তাতে নিজের কপালই আগে পোড়ে। পুরুষ মানুষ, বার-টান যদি একটু থাকেই, তুমি যা করছ তাতে তো ও আরো ঘরের বার হয়ে যাবে। ওকে যদি ঘরমুখী করতে চাও, ঘরের দিকে ওর টান যাতে বাড়ে সেদিকে

তোমার মন দিতে হবে। বরং সাধারণে যেমন করে তার চেয়ে বেশি আদর যত্ন করতে হবে, ওর খেয়াল মত, খুশি মত চলতে হবে। নিতান্ত ছোটটি তো নও, এসব তোমাকে বলে দিতে হবে কেন। শিখাতেই বা তোমাকে হবে কেন!'

কিন্তু শিখাবার প্রায়োজন তেমন না থাকলেও, শিখাবার দিকে বেশ ঝোঁকই ছিল নবদ্বীপের। ঘরে আর কোন লোক ছিল না। নবদ্বীপের এক বোন ছেলেপুলে নিয়ে নিজেই বর্ষার সময় নৌকা করে এখানে বেড়াতে আসত। এসে দু'একদিনের বেশি থাকতে পারত না। বড় সংসার, অনেক দায়িত্ব, অনেক কাজ। নবদ্বীপের পক্ষ থেকেও খুব যে বেশি গরজ দেখা যেত বোনকে রাখবার জন্য তা নয়। মুরলী যখন বাইরে বাইরে থাকত, বেশি রকম বাড়াবাড়ি করত, নবদ্বীপ মনোরমাকে নিজের কাছে ডেকে আনত। নানারকম কথা বলে বুঝাতে চেষ্টা করত, সান্ত্বনা ভরসা দিত। নিজের ছেলের ব্যবহারের জন্য মনোরমার কাছে লজ্জার যেন শেষ ছিল না নবদ্বীপের। নবদ্বীপ যেন নিজে অগাধ স্নেহ দিয়ে এবং স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ কাপড়গয়না দিয়ে সেই লজ্জা খানিকটা ঢাকতে চেষ্টা করত। মাঝে মাঝে ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বললেও নবদ্বীপের আন্তরিকতা মনোরমাকে আকৃষ্ট করেছিল। একই দুঃখ এবং অশান্তি-ভোগের মধ্য দিয়ে পরস্পরের ওপর তারা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠত। ক্রমে ক্রমে এমন হোল যে, বয়সের বাধা ডিঙিয়ে নবদ্বীপ আর মনোরমার সম্পর্ক যেন বন্ধুত্বের পর্যায়ে এসে পৌঁছল। সমস্ত বৈষয়িক পরামর্শ চলে মনোরমার সঙ্গে, এমন কি কিভাবে কতটুকু শাসনের দ্বারা মুরলীর স্বভাবচরিত্র বদলানো যেতে পারে, কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, সেসব পরামর্শও নবদ্বীপ করত মনোরমার সঙ্গে। এমন ভাবে কথা বলত নবদ্বীপ যে মুরলী তার

নিজের কাছে যেমন শিশু মনোরমার কাছেও যেন তেমনি। নবদ্বীপের মুরলীকে শাসনের যেমন অধিকার আছে, মনোরমারও যেন তেমনই। নবদ্বীপের কথাবার্তায়, সস্নেহ ব্যবহারে দুঃখটাকে আর যেন তেমন দুঃখ বলে মনে হত না মনোরমার। নবদ্বীপ তার সম অংশ গ্রহণ করায় দুঃখের ভার বরং অনেক লঘু হয়ে পড়ত। এত বড় যে দুর্ভাগ্য, তাও অনেক সময় উপভোগ্য হয়ে উঠত মনোরমার কাছে। নবদ্বীপ মুরলীর ছেলেবেলার গল্প করত। তখন থেকেই যে কী অস্বাভাবিক দুরন্ত ছিল মুরলী, মাঝে মাঝে তার সরস বর্ণনা শোনাত মনোরমাকে।

'ছেলেবেলা থেকেই ও অমনি। মাত্র সাত আট বছর যখন বয়স তখনই লুকিয়ে লুকিয়ে ও হুঁকো টান্তো। একদিন আমার চোখে পড়ে গেল। মনে ক'র না, মা-মরা ছেলে ব'লে আমি কেবল আহ্লাদই দিয়েছি ওকে। মাঝে মাঝে এমন শাসন করতাম যে পাড়াপড়শীর বউ-ঝিরা পর্যন্ত চোখের জল ফেলত। বলত, ছেলেটাকে কি মেরে ফেলবে? একেকদিন সত্যিই আধমরা ক'রে শ্বাসমাত্র রেখে ছেড়ে দিতাম, এমন কড়া ছিল আমার শাসন। তামাক খাওয়ার জন্য কত শাস্তি কতবার ওকে দিয়েছি শুনবে? প্রথম প্রথম ধমক, চোখ রাঙানো, মারধোর খুব চলল, কিছুতেই কিছু হয় না, শেষে একদিন কাঠিতে ক'রে গোবর তুলে দিলাম ওর মুখে পুরে, তারপর হুঁকো আর কল্কি গলায় বেঁধে কান ধ'রে ঘুরিয়ে আনলাম পাড়া ভরে। তবু কি লজ্জা হোল!'

মুরলীর অপূর্ব বেশ মনে মনে কল্পনা ক'রে মনোরমা হেসে উঠেছিল, 'তবু তো তামাক খাওয়া ছাড়াতে পারেননি।'

নবদ্বীপও সহাস্যে নিজের শাসনের ব্যর্থতা স্বীকার ক'রে বলেছিল, 'না, পারলাম আর কই, যা ও একবার ধরে তা কোনদিনই ছাড়ে না; ওর ওই স্বভাব।'

দুজনের সেই সুস্থ সম্বন্ধ কেমন ক'রে যে চিড় খেয়ে গেল, কেমন ক'রে একটু একটু ক'রে মনোরমা দূরে স'রে গেল, তা নবদ্বীপ বুঝে উঠতে পারল না। নদীর মত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের মধ্যেও জোয়ার ভাঁটা খেলে। ভাঁটার টানে মনোরমা যখন দূরে সরে গেল, নবদ্বীপের স্নেহ সহানুভূতির প্রয়োজন তার পক্ষে যত কমে আসতে লাগল, নবদ্বীপ মনে মনে তত ক্ষুব্ধ হোল, ক্রুদ্ধ হোল, কিন্তু আর কিছু ক'রতে পারল না। মেয়ে হবার পর থেকে মনোরমার মনোনিবেশের আর এক বস্তু বাড়ল। মেয়েকে খাওয়াতে, পরাতে, সাজাতেই তার সময় কাটে, তেমন আর নিঃসঙ্গ বোধ করে না মনোরমা। মেয়ের মধ্যেই তার আনন্দ আর কল্পনা মুক্তিলাভ করে। তাছাড়া স্বামীর দিকেও বেশ ঘেঁষে এলো মনোরমা, মুরলীর উচ্ছৃঙ্খলতার বেগ কমতে থাকায় মুরলীও অনেকখানি সভ্য হয়ে এল। তাছাড়া বাইরের টান যতই মুরলীর থাকুক, সে যখন ভালোবাসে তখন গভীরভাবেই ভালোবাসে, একথা মনোরমার বুঝতে বাকি রইল না। আদরে, উচ্ছ্বাসে সেইসব মুহূর্তে মনোরমাকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় মুরলী। নিবিড় সান্নিধ্যের জন্য নিজের সঙ্গে যেন নিশ্চিহ্ন ক'রে মিশিয়ে ফেলবে মনোরমাকে, পিষে মেরে ফেলবে। কোন ফাঁক থাকতে দেবে না, কোন ব্যবধান থাকতে দেবে না, মনোরমা লীন হয়ে যাক মুরলীর অণুপরমাণুর মধ্যে। তখন কি কেউ কল্পনাও ক'রতে পারে, মুরলী আরো অনেক নারীকে এমন নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রেছে এবং ভবিষ্যতে ক'রতে পারে!

নবদ্বীপ কিছু বলে না, ভাবে, মেয়েমানুষ এমনি স্বার্থপর, এখন সময় পেয়েছে কি না, তাই বুড়ো শ্বশুরের সেবাশুশ্রূষার কথা একবার মনেও পড়ে না, এখন স্বামী আর মেয়েই তার সব। কিন্তু এই যে আদর সোহাগ কার দৌলতে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে খাইয়ে

বাঁচাচ্ছে কে, এত বাবুগিরি বিলাসিতা কার পয়সায়। একটা পয়সাও কি কোনদিন আয় ক'রে দেখেছে মুরলী। তার নিজের এত সাজ-সজ্জার বহর, বউয়ের গায়ের ভারি ভারি গহনা, এমন কি মেয়ের গলার ধুকধুকিখানা পর্যন্ত নবদ্বীপের টাকায়। অথচ সেই নবদ্বীপ আজ নিতান্তই একজন বাইরের লোক, কারো লক্ষ্য নেই, কারো মমতা নেই তার ওপর, সে কেবল টাকা যোগাবার যন্ত্র, আর কিছু নয়। এমনই সংসারের নিয়ম।

আজ আবার বহুদিন বাদে শ্বশুরের অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার কথা মনে পড়েছে মনোরমার। তার সতেজ অভিযোগের ভঙ্গিতে যে হতাশা এবং করুণ আর্তিতা ফুটে উঠল, তার মধ্যে সেই পুরোনো ঘনিষ্ঠতার যেন খানিকটা আভাস পেল নবদ্বীপ। তবু সহজে নবদ্বীপ ধরা দিল না, পরম উদাসীনভাবে বলল, 'সে কি কথা, ঘরদোর সংসার গেরস্থালী সবই তো এখন তোমাদের। আমি আর কে, আমারই বরং তোমাদের কোন কিছুর মধ্যে এখন আর থাকা উচিত নয়। বাকি কটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হোল।'

এসব যে নবদ্বীপের অভিমানের কথা, তা মনোরমার বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু কেন এই অভিমান! সাধ্যমত এখনো মনোরমা শ্বশুরের সেবা-পরিচর্যা করে, খোঁজখবর, তত্ত্বতল্লাস নেয়। তবু কেন যে নবদ্বীপের মন ওঠে না, তা বুঝতে পারে না মনোরমা। মাঝে মাঝে এও মনে হয়, বুড়ো হ'লে মানুষের স্বভাব এমনই খুঁৎখুঁতে হয়ে পড়ে। সব সময়েই বুড়োমানুষের মনে আশঙ্কা থাকে, এই বুঝি তাকে কেউ গ্রাহ্য করল না, অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা করে চলে গেল। ছেলেমানুষ যেমন স্নেহের কাঙাল, বুড়োমানুষও তেমনি শ্রদ্ধা কুড়োতে ভালোবাসে। না হলে নবদ্বীপ তো জানে, এখনো সংসারের সে-ই সর্বময় কর্তা, তাকে যত্ন

ক'রবে না, তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাবে, এমন সাধ্যই কারো নেই, তবু তার মর্যাদা হারাবার এমন আশঙ্কা কেন, আদর-যত্নের জন্য কেন এমন কাঙালপনা।

মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে তার প্রথম কথার পুনরাবৃত্তি করে, 'রাত হয়ে গেছে, হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে আসুন, আমি ভাত বাড়ি গিয়ে।'

খেতে বসে নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করে, 'মুরলী খেল না?'

মনোরমা ঘাড় নেড়ে জানায়, মুরলী আগেই খেয়ে নিয়েছে। সাধারণত সন্ধ্যার একটু পরেই রাত্রের খাওয়া সেরে নেওয়া মুরলীর অভ্যাস। আর নবদ্বীপের ঠিক তার উল্টো। কারবারপত্র, নানারকম দরবার পরামর্শ সারতে সারতেই তার অনেক রাত হয়ে যায়। তবু মনে মনে নবদ্বীপ প্রত্যাশা করে, মুরলী তার জন্য প্রতীক্ষা করবে। কথা বলতে বলতে খেতে তার ভালো লাগে। কিন্তু মুরলী আর সে একই সময় পাশাপাশি বসে খাচ্ছে, এমন ভাগ্য নবদ্বীপের খুব কমই হয়। এ নিয়ে মনে মনে বেশ ক্ষোভও আছে নবদ্বীপের। মাঝে মাঝে মুরলীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'পুরুষমানুষ যে অত সকাল সকাল কি ক'রে খায়, আমি ভাবতেই পারি না।' কিন্তু নবদ্বীপের এসব কথা আজকাল আর গায়ে লাগে না মুরলীর। বাপের প্রায় কোন মন্তব্যেই আর কান দেয় না মুরলী, প্রতিবাদও করে না। এই ঔদাসীন্যই নবদ্বীপকে সব চেয়ে বেশি আঘাত করে।

নবদ্বীপ বলল, 'আর ললিতা? সে খেয়েছে তো, না না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে?'

মনোরমা জবাব দিল, 'সেও খেয়েছে তার সঙ্গে।'

নবদ্বীপের মনে পড়ল মুরলীর ভারি বাধ্য মেয়ে হয়েছে ললিতা, বাপকে ভারি ভালোবাসে। ভাগ্য ভালো মুরলীর। সন্তান অবাধ্য হ'লে যে কি দুঃখ পেতে হয় তা তাকে টের পেতে হোল না।

খেতে খেতে নবদ্বীপ বলল, তা হোলে তুমিই বুঝি শুধু বাকি আছ ?'

মনোরমা কোন জবাব দিল না।

নবদ্বীপ বলল, 'আমার ভাত বেড়ে রেখে খেয়ে নিলেই পারো কাজকর্ম সেরে, কখন কোন্ সময় ফিরি তার তো ঠিক নেই, অত কষ্ট করবার দরকার কি।'

মনোরমা জানে. এটা নিতান্তই নবদ্বীপের মুখের কথা। বাড়ির একজন মানুষ বাকি থাকতে যে কোন মেয়েমানুষ আগে খেয়ে উঠবে, একথা নবদ্বীপের পক্ষে ধারণায় আনাই কষ্টকর।

নবদ্বীপ এক ঢোঁক জল খেয়ে নিল, 'কিন্তু বললে কি হবে, ওটা তোমাদের মেয়েমানুষের স্বভাব। তোমার শাশুড়ীও অমনি ছিল। কতদিন বলে গেছি, আমার রাত হবে, তুমি খেয়ে নিয়ো; কিন্তু একদিনও আমার আগে সে খায়নি। কিন্তু তুমি তো ছেলেমানুষ, তোমার খেয়ে নিলে তো কোন দোষ নেই।'

মনোরমার মনে হয়, নবদ্বীপ হঠাৎ যেন অত্যন্ত উদার এবং স্নেহশীল হয়ে উঠেছে।

ছেলে মানুষ! মনোরমা একটু হাসতে চেষ্টা করে।

'না, ছেলেমানুষ কিসের, তুমি একেবারে বুড়ী হয়ে গিয়েছ, বুড়ী বললেই বুঝি খুশি হও ?'

খাওয়া শেষ ক'রে নবদ্বীপ উঠে পড়ে। জলের ঘটিটা শ্বশুরের হাতে তুলে দেয় মনোরমা। এই কিছুক্ষণ আগে যে লজ্জাকর ব্যাপারটা ঘটে গেল বিনোদের বাড়িতে, তার জন্য যতখানি বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হবার কথা ছিল নবদ্বীপের, তার কিছুই তো তার কথাবার্তায় টের পাওয়া যাচ্ছে না। বরং নবদ্বীপকে বেশ খানিকটা খুশি বলেই মনে

হচ্ছে। অথচ অতখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবার, অমন খুশি হয়ে ওঠবার কী এমন ঘটল। মনোরমা অবাক হয়ে ভাবে।

মুখ ধুয়ে এসে নবদ্বীপ বলল, 'যাও, আর দাঁড়িয়ে থেক না, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

মনোরমা বলল, 'আমি আর খাব না, ক্ষিদে নেই তেমন।' তারপর বোধ হয় একটু ইচ্ছাকৃত দরদ দেখিয়েই বলল, 'যাই আপনার বিছানা ঝেড়ে দিয়ে আসিগে।'

নবদ্বীপের কণ্ঠ আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল, 'পাগলী মেয়ে, ক্ষিদে নেই না আরো কিছু, রাগ ক'রে না-খেয়ে থেকে নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি। ওসব চালাকি চলবে না, তুমি খেতে বসবে তবে আমি যাবো, এই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি দরজার সামনে, যাও, খেতে বস গিয়ে।'

একটু যে দেখানো বাড়াবাড়ি ভাব আছে নবদ্বীপের কথায় তা বেশ বোঝা যায়। তবু এই স্নেহটুকু ভালো লাগল মনোরমার। মিষ্টি কথা মৌখিক হলেও শুনতে তো মিষ্টিই লাগে। তাছাড়া একেবারে মৌখিকই বা হবে কেন, শাশুড়ী নেই, জা নেই; কিন্তু এসব যে মনোরমার নেই এবং এসবের অভাব যথাসম্ভব মিটানো দরকার, তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, অমন বৈষয়িক পুরুষমানুষ হয়েও সেকথা তো নবদ্বীপের মনে রয়েছে। মনোরমার সুখসুবিধার জন্ম চেষ্টাও ক'রেছে নবদ্বীপ এক সময়, সেকথা মনোরমার যেন নতুন ক'রে মনে পড়ল।

নবদ্বীপ দাঁড়িয়েই আছে দেখে মনোরমা বলল, 'আপনার আর কষ্ট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, ঘরে যান।'

'খেতে বস আগে।'

'বললাম যে ক্ষিদে নেই।'

'আবার বলে খিদে নেই।' নবদ্বীপ সস্নেহে ধমক দিল।

মনোরমা একটু হেসে একখানা থালা নিয়ে হাঁড়ি থেকে ভাত বাড়তে বসল নিজের জন্য।

৬

খেয়ে দেয়ে রান্নাঘর গুছিয়ে মনোরমা একবার নিজে ঘরে ঢুকল, তারপর আস্ত একটা পান মুখে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুরলী চুপচাপ শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ্য করল আর মনে মনে একটু হাসল। যেদিন এসব কাণ্ড করে বসে মুরলী সেদিন স্বামীর প্রতি ঔদাসীন্য আর শ্বশুরের ওপর মনোযোগ বেড়ে যায় মনোরমার। যেন এমনি করেই মুরলীর ব্যবহারের সে প্রতিবাদ করতে চায়। মুরলী চুপ করে থাকে, বিন্দুমাত্র ঈর্ষাও সে প্রকাশ হতে দেয় না। সে জানে তা হ'লে মনোরমা আরও সুবিধা পেয়ে যাবে। যদি সে জানতে পারে এতে মুরলী মনে মনে ঈর্ষা বোধ করে তা হলে এই উপায়টা মনোরমা আরও বেশি করে অবলম্বন করবে। তার চেয়ে চুপ-চাপ থেকে ঔদাসীন্যের জবাব ঔদাসীন্যে দেওয়া অনেক ভালো। মনোরমাকে বুঝতে দেওয়া ভালো যে তার রাগে অনুরাগে অবজ্ঞা আদরে কিছুই এসে যায় না মুরলীর। তা ছাড়া এই মুহূর্তে মনোরমার মনোভাব নিয়ে মাথা ঘামাবার সত্যিই মুরলীর অবসর ছিল না। মনোরমা কখন নেপথ্যে সরে গিয়েছিল, তার স্থানে রঙ্গীর উজ্জ্বল মুখ উজ্জ্বলতর হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠছিল মুরলীর। কী অদ্ভুত উত্তেজনাময় অনুভূতি। এমন তীব্রতর স্বাদ বহুদিন যেন মুরলী ভুলে ছিল, কিংবা কোনদিনই যে এ স্বাদ সে পেয়েছে এই মুহূর্তে সে-কথা মুরলীর মনে পড়তে চায় না।

মনোরমা যাই বলুক মুরলী সত্যি সত্যিই বুড়ো হয়ে পড়েনি, এমনকি দেহে মনে সামান্য প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণও দেখা যায়নি মুরলীর। কামনার

এই উগ্র উন্মত্ততাই তার প্রমাণ। অপরিণামদর্শী উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে নিজের যৌবনকে যেন আবার নতুন করে অনুভব করল মুরলী।

কোন সম্মানহানির ভয়, কোন ভবিষ্যৎ কেলেঙ্কারীর ভয়ই তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করে, ভেবে-চিন্তে পা ফেলতে পারে না মুরলী, মেয়েদের মন বুঝবার তার সময় হয় না, দরকারও হয় না। এই যে কোনরকম অবকাশ না দিয়ে নিতান্ত অসতর্ক মুহূর্তে রঙ্গীকে সে নিজের বুকের মধ্যে উন্মত্তভাবে জড়িয়ে ধরেছিল এর মধ্যে যে দুঃসাহসিকতা আছে মন বোঝাবুঝি করতে গেলে তা পাওয়া যেত না। শুধু কামনার উগ্রতাই নয়, এর মধ্যে নিজের শারীরিক শক্তির পরিচয় পেয়েও খুশি হয় মুরলী। কোন মেয়ে স্বেচ্ছায় সলজ্জে এসে তার কাছে আত্মনিবেদন ক'রেছে এমন ভাগ্য খুব কমই ঘটেছে মুরলীর। অত সময় নেই, অত সহিষ্ণুতা নেই তার। স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ ঠিক প্রথমেই তার কাছে কেউ করেনি। সে ছিনিয়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে জোর ক'রে। আজও রঙ্গী যখন ছোট পাখীর মত তার বাহু বেষ্টনীর মধ্যে ছটফট ক'রছিল তখন চমৎকার লাগছিল মুরলীর। নিরীহ আত্মসমর্পণের চেয়ে এ অনেক ভালো। আত্মসমর্পণ তো শেষে ওরা এক সময় করেই, কিন্তু তার আগে ওদের এই ক্ষণিক বিদ্রোহ দেখবার মত।

রঙ্গী কিন্তু বেশ চালাক মেয়ে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ লোকের কাছে সে করল বটে, কিন্তু নিজের আত্মমান বাঁচিয়ে। মুরলী তাকে বুকের সঙ্গে গাঢ়ভাবে জাপ্টে ধরেনি, কেবল হাত ধরেছিল, এতে রঙ্গীর নিজের মানও বেঁচেছে, মুরলীর অপরাধও অনেকখানি লঘু হয়েছে। মুরলী মনে মনে হাসল। আর একটু বেশী চালাক যদি মেয়েটা হোত তাহ'লে ওটুকুও আর বলত না। সম্ভবত স্বামীর কাছে এটুকুও গোপন করবার মত বুদ্ধি তার হবে।

হঠাৎ রঙ্গীর স্বামী অজিত ছোকরার কথা মনে পড়ে গেল মুরলীর। এ গ্রামের জামাই। বেশ বড়লোকের ছেলে, কলকাতায় থেকে ডাক্তারী পড়ছে। এক ছুটিতে শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে এসেছিল সেবার। অজিত যে তার কথাবার্তায় বেশ মুগ্ধ হয়ে গেল একথা মুরলীর বুঝতে মোটেই বাকি ছিল না। বিশেষ করে তার অনিয়মিত, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের আভাস পেয়ে অজিত যেন আরো উল্লসিত এবং আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। শুধু আভাস ইঙ্গিতেই সে তৃপ্ত থাকতে চায় না, বিশদ বিবরণ শোনবার জন্য কী আগ্রহ, কী ঔৎসুক্য তার। আজ যদি এ কাহিনী তার কানে যায়—নিশ্চয়ই যাবে—মুরলীর ওপর তার কি তেমন সপ্রশংস মনোভাব থাকবে, ভক্তজনোচিত আকর্ষণ থাকবে তেমনি, যেমন থাকে বিনোদের প্রতি বিনোদের ভক্তদের?

কিন্তু বিনোদের যেমন ভক্ত আছে তেমন কি একজনও আছে মুরলীর? বিনোদের চারপাশে যারা ভিড় ক'রে থাকে তারা যেভাবে শ্রদ্ধা করে বিনোদকে, মুরলীর সাকরেদের দলের কি তেমন মনোভাব আছে মুরলীর ওপর? মুরলীর মনে হোল আর যাই করুক তারা তাকে শ্রদ্ধা করে না, সমবয়সী ইয়ার বলেই মনে করে। এই মুহূর্তে বিনোদের মত সম্মান এবং শ্রদ্ধা পাবার আকাঙ্ক্ষাটা মুরলীর মনে তীব্র হয়ে উঠল।

আর এই মেয়েটি, এই রঙ্গী? সেই বা তাকে কী চোখে দেখবে এরপর? মুহূর্তের জন্য জোর করে তাকে মুরলী বুকে চেপে ধরেছিল বটে, কিন্তু সব সময়েই তো আর তাকে এমন করে কাছে টানা যাবে না। তার আয়ত্তের বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে যদি সে অনুকম্পা এবং অবজ্ঞার হাসি হাসেই, তাবলে কী করতে পারবে মুরলী? মুহূর্তের দৈহিক সান্নিধ্য লাভ করতে গিয়ে এই মেয়েটির মনে চিরকাল তাকে ঘৃণ্য হয়ে থাকতে হবে।

জীবনে আরো অনেকবার এই ধরণের অনুশোচনায় মুরলী ছটফট করেছে। কিন্তু অনুশোচনায় যথার্থ কোন লাভ হয় না, কোন শিক্ষা হয় না। অনুশোচনাও এক রকমের বিলাস, নিজেকে নিপীড়ন করবার অদ্ভুত আনন্দ। বিশেষত এই ধরণের অনুশোচনা মুরলীকে খানিকক্ষণের জন্য মনমরা করে রাখবার পরেই তাকে আরো হিংস্র উন্মত্ত করে তোলে। শ্রদ্ধা ভালোবাসা যখন সে পাবেই না তখন এই মাংসল আরাম যত বেশী সে পারে আদায় করবে। একটা মেয়ে দূর থেকে বহুদিন পর্যন্ত তার সম্বন্ধে কী ভাব মনে পোষণ করবে সে ভাবনা ভেবে কী লাভ মুরলীর ?

শ্বশুরের পরিচর্যা সেরে অনেকক্ষণ পরে ঘরে ঢুকল মনোরমা। এতক্ষণ ওদের কথাবার্তা, আলাপ পরামর্শের ফিসফিস শব্দ মাঝে মাঝে মুরলীর কানে আসছিল। নিজেকে এভাবে অন্যের আলোচ্য বিষয় হিসাবে দেখতে একেক সময় মন্দ লাগে না। মন্দ লাগে না নিজেকে অন্যের হাতে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিতে। শ্বশুর আর পুত্রবধূতে মিলে তার চরিত্র সংশোধনের ভার নিয়েছে ভেবে মুরলীর হাসি পায়। আচ্ছা, সত্যি সত্যিই যদি মুরলী হঠাৎ এক-দিন সচ্চরিত্র হয়ে ওঠে, বাপের মত বৈষয়িক হয়ে বিষয়কর্মের দিকে গভীর মন দেয়, তাহলেই নবদ্বীপ কি অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করে ? তাহ'লে এত রাত পর্যন্ত আর কোন্ বিষয় নিয়ে নবদ্বীপ এমন করে মনোরমার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে ? মনে মনে কৌতুক বোধ করে মুরলী।

ঘরে ঢুকে মনোরমা নিজের বিছানা একটু ঝাড়ল। খাটের এক পাশে একেবারে বেড়া ঘেঁষে কোলবালিশ জড়িয়ে ধ'রে ললিতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদিকের খাটে মুরলী এইমাত্র পাশ ফিরে যে ঘুমের ভাণ করল, তা বেশ বুঝতে পারল মনোরমা। আসলে

মুরলী যে একটুও ঘুমোয়নি তা সে জানে। মুরলী যাতে ঘুমোতে না পারে এই জন্যই তো সে খাওয়াদাওয়ার পর এতক্ষণ এত কষ্ট করে ওঘরে গিয়ে জেগে বসেছিল। কিন্তু মুরলীও যে জেগেই আছে হাতে হাতে তা প্রমাণ করে না দিতে পারলে মনোরমার রাত জাগার কষ্ট যেন বৃথা হয়ে যায়।

মশা গুনগুন করছে ঘর ভরে। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করে মশা তাড়িয়ে মশারি ফেলে দিতে দিতে মনোরমা নিজের মনেই যেন বলল, 'আচ্ছা নবাবের বেটি হয়েচে, নিজের মশারিটাও নিজে ফেলে নিতে পারবে না। ওর আর দোষ কি, আদর দিয়ে দিয়ে একজন যদি মাথা খেয়ে দেয়, আমি তার কি করতে পারি।'

কিন্তু অভিযোগ সত্ত্বেও মুরলীর কাছ থেকে কোন জবাব মিলল না। মনোরমা একটু চুপ করে রইল। মশারির মধ্যে হাঁটুগেড়ে চার পাশ ঘুরে ঘুরে মশারির চারধার বেশ করে গুঁজে দিল। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মশারির মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো মনোরমা। মুরলীর খাটের কাছে গিয়ে আবার সে পাখা দিয়ে মশা তাড়াতে আরম্ভ করল। দেখা গেল, মুরলীও মশারি টাঙিয়ে শোয়নি। কাপড়ের খুঁটটা জড়িয়ে মশার কামড় থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করছে, তবু মশারি টাঙাচ্ছে না।

মশারিটা ফেলে দিয়ে মনোরমা বলল, 'পড়ে পড়ে মশার কামড় খাবে তবু মশারিটা টাঙিয়ে নেবে না। কেন, এক আধদিন নিজহাতে টাঙিয়ে নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?'

মুরলী বলল, 'একজন যদি আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়ে দেয়, আমি তার কী করতে পারি।'

মনোরমা বলল, 'মরণ আমার. বয়ে গেছে আমার অমন মানুষকে

আদর জানাতে, কত মর্যাদা রাখেন আদরের। এর চেয়ে গাছ-পাথরকে ভালোবাসলেও শান্তি পাওয়া যায়।'

মুরলী কোন জবাব দিল না। একটু চুপ করে থেকে মনোরমা নিজেই আবার বলল, 'রাগ করলে?'

মুরলী বলল, 'না, রাগ তো তোমারই করবার কথা।'

হ্যারিকেনটা খাটের নীচে মিট মিট করে জলছিল। মনোরমা ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে সেটা একেবারে নিভিয়ে দিল। স্বামীর প্রায় গা ঘেঁষে শুয়ে মনোরমা আস্তে একটু নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'না, রাগ ক'রে আর লাভ কি?'

৭

কিন্তু কেলেঙ্কারিটা সেই রাত্রে বিনোদের ঘরে বসে যত সহজে নবদ্বীপ মিটিয়ে দিয়ে এসেছিল, আর খানিকটা মান-অভিমানের পর মুরলী আর মনোরমার মধ্যে যত অল্প সময়ে মিটে গিয়েছিল, পাড়ায় তত সহজে এবং তত তাড়াতাড়ি মিটল না। পুরুষদের তাসের আড্ডায়, মেয়েদের স্নানের ঘাটে, বিকালে জল আনবার সময় হাসিতে ইসারায় আলোচনার উপাদেয়তা কেবল বেড়েই চলতে লাগল। নবদ্বীপ কি মুরলীকে দেখলে পুরুষেরা তবু থামে, কথা ঘুরিয়ে নেয়; কিন্তু মনোরমাকে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। তার উপস্থিতিতে মেয়েদের কথার রস যেন আরও গাঢ় হয়ে জমে, নিগূঢ় ব্যঞ্জনা গূঢ়তর হয়, কথা শেষ হয়ে গেলেও তার তীর্যক ভঙ্গিটুকু চোখ আর ঠোঁটের কোণ থেকে যেন কিছুতেই সরতে চায় না।

পাছে কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেই ভয়ে মনোরমা আজ বেশ দেরি ক'রেই জল নিতে এসেছিল। ছোট একটি কলসী কাঁখে

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ললিতাও এসেছে ঘাটে। মনোরমা ইচ্ছা ক'রেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরোয়। পুরোনো হয়ে গেলেও সে এ গাঁয়ের বউ; একা একা ঘাটে যাতায়াত করা তার পক্ষে শোভন নয়। কিন্তু মেয়ে সঙ্গে থাকলে আর নিন্দার কথা ওঠে না। ললিতার বয়স যখন তিন বছর তখন থেকেই সে মার রক্ষয়িত্রী। প্রতি বছর নবদ্বীপ নাতনীকে একটি ক'রে কলস কিনে দিয়েছে। ললিতার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কলসীর আকারও একটু ক'রে বেড়ে চলেছে।

আজ ললিতাকে সঙ্গে রাখার মানোরমার আরও একটু উদ্দেশ্য ছিল। ভেবেছিল মেয়ের সামনে মুরলীর সম্বন্ধে যা তা কেউ আর বলতে পারবে না। শক্ত হলেও দশ এগারো বছরের মেয়ে, না বোঝে কি। তার সামনে সকলেই একটু রেখে ঢেকে কথা বলবে।

কিন্তু উদ্দেশ্য মনোরমার সম্পূর্ণ সিদ্ধ হোল না। সন্ধ্যা প্রায় ঘোর হয়ে এলেও দেখা গেল মঙ্গলা আর আলতা ঘাট থেকে এখনো যায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি সব হাসি মস্করা করছে। মনোরমার বুঝতে বাকি রইল না হাসাহাসিটা তাকে দেখেই ওরা ইচ্ছা করে বাড়িয়েছে। কোন কথা না ব'লে পাশ কাটিয়ে নদীর মধ্যে খানিকটা নেমে মনোরমা কলসী ভরতে যাচ্ছে, মঙ্গলা বলল 'এই যে এসো সোনা বউ, এতক্ষণ তোমাদের কথাই হচ্ছিল।'

মনোরমা শুষ্ক মুখে বলল, 'আমাদের কথা!'

মঙ্গলা একটু হাসল, 'তা ছাড়া আবার কি, তোমাদের কথাই তো এখন পাড়ার মুখে মুখে। বড় ঘরের বড় বড় সব কথা।'

মনোরমা বলল, 'বড় বড়ই তো দিদি। ছোট মুখে তাই তো তা আটকে থাকে না, মুখ খুলতে না খুলতে পথেঘাটে যেখানে সেখানে বেরিয়ে আসে।'

মঙ্গলা কঠিন স্বরে বলল, 'ভারি যে দেমাক দেখছি সোনা বউ, বড় ঘরের বড় বড় কর্তারা যখন ছোট কাজ করতে যায় তখন কোন দোষ হয় না, দোষ কেবল ছোট মুখে তাদের কথা ওঠে বলে, না?'

জলভরা কলসীটা মনোরমা ততক্ষণে কাঁখে তুলে নিয়েছে। মেয়েকে বলল, 'চল ললিতা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।'

তারপর মঙ্গলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গায়ে পড়ে ঝগড়া করবার তোমার ভারি সাধ মঙ্গলাদি। বড় ঘরের বড় মানুষ তোমার তো কিছু করতে যায়নি, কিন্তু গায়ের ঝালটা যেন তোমারই সবচেয়ে বেশি হয়েছে।'

বলে মনোরমা আর দাঁড়াল না।

মঙ্গলা পিছন থেকে ডেকে বলল, 'পালাচ্ছ কেন সোনা বউ, কথার জবাবটা একবার শুনেই যাও না। গায়ের ঝালটা কেন আমার বেশি হয়েছে একবার শুনে যাও ভালো করে।'

কলসী কাঁখে মনোরমা তখন খানিকটা পথ এগিয়ে গিয়েছে। নিজে কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে মেয়েকে কি যেন বলে দিল।

ললিতা তোতাপাখির মত দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'মার অত সময় নেই জেঠিমা, যাকে শোনালে তোমার গায়ের ঝাল মিটবে তাকেই শুনায়ো।'

মঙ্গলা আলতাকে সাক্ষী মেনে বলল, 'শোন, অতটুকু মেয়েকে দিয়ে কি একবার বলিয়ে নিলে, শোন ঠাকুরঝি। শিখিয়ে পড়িয়ে ওই এক ফোঁটা মেয়েটার পর্যন্ত ওরা মাথা খেয়ে দিচ্ছে। আর দু'একটা বছর যেতে দাও. তারপর ওই মেয়ে যদি পাড়ার সমস্ত ছেলের মাথা না খায় তো কি বলেছি।'

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। আলতার কালো মুখ ভাল করে' দেখা গেল না। আলতা বলল, 'চল বউদি বাড়ি চল। দু' এক বছর পরে পাড়ার ছেলেদের মাথা যদি ও খেতেই থাকে তা নিয়ে তোমার অত দুর্ভাবনা কেন! এর পরও যদি তোমার ছেলে হয় তার মাথা এত বড় হবেনা যে কোন মেয়ের তা খেতে লোভ যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মঙ্গলা বলল, 'আমারই ঘাট হয়েছিল আলতা ঠাকুরঝি, চোরের সাক্ষী যে গাঁটকাটা কথাটা ভুলে গিয়েছিলাম।'

পাড়ার ছেলেদের মাথা খাওয়ার দুর্ণাম মাঝে মাঝে আলতারও শোনা যায়।

সমস্ত পথটা কলসী কাঁখে দুজনে নীরবে হেঁটে এল। দু' জনেই ভাবল কথায় কথায় কি কথা এসে পড়ল। পরের সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে তারা ঝগড়া করে বসল সখিতে সখিতে। দুজনেই ছেড়েছে একেবারে মারাত্মক অস্ত্র। বন্ধ্যাকে সন্তানহীনার দুঃখ মনে করিয়ে দিয়েছে আলতা। বালবিধবাকে চরিত্রহীনতার খোঁটা দিয়েছে মঙ্গলা। কেউ কাউকে এতটুকু ছেড়ে দেয়নি। অথচ এই মুহূর্তে ঝগড়া করবার তাদের একটুও ইচ্ছা ছিলনা। দুজনেরই ইচ্ছা করতে লাগল এই সামান্য ব্যাপারটার এখানেই মিটমাট করে ফেলে তারপর মনের আনন্দে কালকের সেই কেলেঙ্কারীর আলোচনা আবার আরম্ভ করে। কিন্তু অভিমানে কারোর মুখ দিয়েই কথা বেরোলনা। কে আগে যেচে মান খোয়াতে যাবে।

ঘরে এসে ভরা কলসিটি আস্তে নামিয়ে রাখল মঙ্গলা। মাটির প্রদীপের সলতেটা দেয়াশলাইর কাঠি জেলে ধরিয়ে দিল। ডাল তরকারি রান্না করাই আছে। শুধু ভাতটা রাঁধলেই এবেলা হবে।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমন আলস্য আসে শরীরে, এমন অনিচ্ছা আসে মনে যে, দুজনের জন্ম ভাতটাও মঙ্গলাব রাঁধতে ইচ্ছা করেনা। এমন অদ্ভুত অবস্থা হয় মনের যে হাজার ঝগড়া আর হাজার কান্না-কাটি ক'রেও তার সেই ভার যেন আর নামানো যায় না। ছেলেবেলার সেই বোবা পিসির কথা মনে পড়ে মঙ্গলার। কতদিন তাকে দুর্বোধ ভাষায় ঝগড়া করতে দেখেছে যার সঙ্গে, কতদিন দেখেছে দুর্বোধ ভঙ্গিতে কাঁদতে। মঙ্গলা আড়ালে গিয়ে মুখে আঁচল চেপে হেসেছে। কিন্তু বোবা পিসির কথা মনে ক'রে আজ আর তার হাসি পায় না। মনে হয় কথা-বলা মানুষও হঠাৎ একেক সময় ওই রকম যেন বোবা হয়ে যায়। কেঁদে চেঁচিয়ে হাজার মাথা কোটাকুটী করলেও মনের কথা কাউকে বোঝানো যায় না। আকুলি বিকুলি দেখে বাইরের মানুষ ছেলে বেলার অবুঝ মঙ্গলার মতই মুখে আঁচল চেপে হাসে, কিন্তু ভিতরের মন ঘরের ভরা কলসের মত থম থম করতে থাকে।

সত্যিই তো মঙ্গলার কোন ক্ষতিতো করেনি মুরলী; তবে কেন সে গিয়েছিল তার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে? কিন্তু মানুষ কি কেবল নিজের ক্ষতির জন্যই সব সময় ঝগড়া করতে যায়, নিজের ক্ষতির ভয়েই সর্বদা তটস্থ থাকে? তাহলে পাড়াশুদ্ধ লোক মুরলীর এমন নিন্দা করছে কেন? ক্ষতি তো আর পাড়াশুদ্ধ লোকের করেনি মুরলী, এক সঙ্গে পাড়ার সমস্ত বউঝির গায়েতো হাত দেয়নি, তবে? তবু মঙ্গলা এসব আলোচনায় যোগ দিলে অনাচারের কদাচারের প্রতিবাদ জানালে অন্যে তো দূরের কথা তার ঘরের লোকেই তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। সকালে এই নিয়ে সুবলের সঙ্গেও তার কথা কাটা-কাটি হয়ে গেছে।

সুবল তখনও বিছানা থেকে ওঠেনি। মঙ্গলা কল্কিতে সযত্নে তামাক ভরে মালসা থেকে তার ওপর ঘুঁটের আগুন তুলে ফুঁ দিয়ে

দিয়ে ভালো ক'রে ধরিয়ে হুঁকোয় করে সুবলের হাতে দিয়ে বলেছিল 'হ্যাঁ গো, কি ঠিক হোল তোমাদের?'

সুবল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিসের?'

'মুরলী ঠাকুরপোর?'

কথা নেই বার্তা নেই সুবল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল, 'সকাল বেলা, একটা ভালো কথা নেই, ঠাকুর দেবতার নাম নেই মুখে, কেবল মুরলী ঠাকুরপো আর মুরলী ঠাকুরপো! দিনরাত ওই লুচ্চা বদমাসটার নাম ছাড়া আর কিছু বুঝি মনে আসেনা তোর?'

মঙ্গলা মুখ লাল ক'রে বলেছিল, 'ছিরি দেখ কথার। আমি যেন সোহাগ ক'রে তার নাম নিয়েছি।' সুবল বলল, 'গলাখানা যেমন গদ-গদ শোনাচ্ছিল তাতে তাইতো মনে হয়। রক্ষা যে পরের মেয়ের হাত ধরে টেনেছিল, নিজের হাত ধরে টান দিলে না যেন কি-ই করতি।'

মঙ্গলা বলল, 'ছি ছি ছি, ওঠো যাও মুখখানা একবার ধুয়ে এসো ভাল করে। মঙ্গলার হাত ধরে টান দিতে সাহস পায় এমন পুরুষ আছে নাকি তোমাদের গাঁয়ে?' সুবল তাড়াতাড়ি তার হাতখানা খপ করে ধ'রে ফেলে বলেছিল, 'একেবারেই নেই?'

মঙ্গলা সেই সোহাগে ভোলেনি, ঝট ক'রে হাতখানা স্বামীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, 'না। একেবারেই নেই। ধরতে দিই বলেই না ধরতে পারো। না হ'লে কোন্ যোগ্যতা আছে তোমার হাত ধরবার একবার ভেবে দেখ মনে মনে।'

সুবল বলেছিল 'তাতো ঠিকই, যে হাতে গয়না দিতে পারিনা, রকম বেরকমের শাড়ি, সেমিজ এনে দিতে পারি না, স্ত্রীর হাত ধরতে যাওয়ার যোগ্যতা সে হাতের তো নেইই। তাইতো বলি এত দুঃখ এত

আফশোষ। যখন মনে তখন একবার হাত বদল করে দেখনা কপাল বদলায় কিনা।'

তারপর সুবল একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বলেছিল, 'রাগ হয় কি সাধে! মেয়ে মানুষ ঘরের কাজ-কর্ম নিয়ে থাকবে। এসব সামাজিক, দলাদলি দণ্ডবিচারের মধ্যে মাথা দেওয়া কি ভালো না লোকেই তাতে ভাল বলে? পাড়া ভরে সবাই যখন বলাবলি করে, সুবলের বউয়ের বড় পুরুষালি চালচলন, পুরুষালি কথাবার্তা, তখন আমার মনটা কেমন করে বল্ দেখি?'

রাগ ক'রে স্বামীর কথার কোন জবাব দেয়নি মঙ্গলা। ঘর গৃহস্থালি ছাড়া অন্য কোন কিছু সম্বন্ধে সামান্য একটু কৌতুহল দেখালেও সুবল তাকে এমনি ধমকাবে, লোক নিন্দার ভয় দেখাবে। কিন্তু মঙ্গলা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না এতে নিন্দাটা কিসের। সুবল বলে পুরুষের ব্যাপারে মেয়েদের কেন মাথা দিতে যাওয়া। কিন্তু পুরুষ যখন অন্যায়ভাবে মেয়েদের গায়ে হাত দিতে আসে তখনও কি সেটা কেবল পুরুষদের ব্যাপারই থাকে? সে সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে, মতামত জানাতে গেলে নিন্দা হয় পাড়ায়? হয়তো হবে, মঙ্গলা তেমন নিন্দাকে ভয় করে না।

সন্ধ্যার খানিক বাদেই সুবল ফিরে এল। হাত-মুখ ধুয়ে অভ্যাস-মত দু' চারবার কর গুনে মিনিটখানেকের মধ্যে আহ্নিকটাও সেরে নিল। তারপর রান্নাঘরে এসে মঙ্গলা যেখানে ভাত রাঁধছে তার খানিকটা দূরে একখানা পিড়ি পেতে বসে বলল, 'যাক, দেরি হলেও ভাগ্য ভালো যে ভাত আজ এক সময় না এক সময় জুটবেই। সকাল বেলায় যে মুখ দেখে গিয়েছিলাম তাতে তো ভরসাই ছিলনা মুখ থেকে নেমে হাঁড়ি আজ সত্যিই উনানে চড়বে।'

আগুনের আঁচে মঙ্গলার গৌরবর্ণ মুখখানা রক্তাভ দেখাচ্ছিল। মুখ না ফিরিয়েই সে বলল, 'ঝগড়া ছাড়া মুখে বুঝি আর কিছু আসে না তোমার ?'

সুবল বলল, 'না, সত্যি মুখটাই ভারি খারাপ হয়ে গেছে মঙ্গল বউ। মনের সোহাগের কথাগুলোও মুখে আসতে না আসতে ঝগড়ার ধরণ হয়ে বেরোয়।'

মঙ্গলা বলল, 'আমার সোহাগেও দরকার নেই ঝগড়াতেও দরকার নেই।'

মঙ্গলা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফেন ঝরাবার জন্ম উপুড় ক'রে রাখল।

সুবল বলল, 'কিন্তু একটা খবর বোধ হয় অতখানি অদরকারী মনে হবে না।'

মঙ্গলা তেমনি নিরাসক্ত ভাবেই জবাব দিল, 'না, কোন খবরেই আর আমার দরকার নেই।'

সুবল এবার কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল, 'হাট থেকে ফেরবার পথে আমাদের কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেছে। নবদ্বীপ জ্যেঠার ওসব কথার কারসাজিতে এবার আর কেউ ভুলবে না। রীতিমত বিচার হবে মুরলীর। রঙ্গীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে মুরলীকে।'

মঙ্গলা এবার মুখ মুচকে একটু হাসল, 'তাতে তার বেশি আপত্তি হবে বলে তো মনে হয় না।'

সুবল বলল, 'আপত্তি হ'লেই তাকে ছাড়বে কে। কিন্তু আপত্তি হবে না কেন শুনি ?'

মঙ্গলা বলল, 'কেন হবে। যারা মেয়েদের হাত ধরতে ভালোবাসে পা ধরতে তাদের অত মান যায় না। মেয়েদের হাত পা দুই-ই তাদের

কাছে সুন্দরহাতের মুঠোয় ধরে রাখবার যোগ্য। তাছাড়া মুরলী ঠাকুরপো হয় তো আর একটা আশাতেও পা ধরতে রাজী হবে। পা ছুঁতে না ছুঁতে রঙ্গী হয়তো লজ্জায় খপ করে তার হাতখানাই ধরে ফেলবে। আর তোমাদের সমস্ত সামাজিক চক্রান্ত মিথ্যা হয়ে যাবে।'

ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে যাচ্ছিল সুবল। কিন্তু গ্রাসটা ফের থালার ওপর নামিয়ে মঙ্গলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এত রস জমল কি করে মঙ্গলার মনে। যে মুখ এতক্ষণ হাঁড়ির মত ভার হয়ে ছিল, মুরলীর অবৈধ প্রেমের প্রসঙ্গ উঠতে না উঠতে সে মুখ আঙুরের মত টলটল করছে। তা হ'লে মুরলীর শাস্তি হোক তাকি সত্যিই চায় না মঙ্গলা? শাস্তি দেওয়ার নামে সরস আলোচনার কৌতুক করবার ইচ্ছা ছাড়া তার মনে আর কিছু নেই!

'তাহ'লে মুরলীর কি রকম শাস্তি তোমার পছন্দ?' সুবল ভাত খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করে।

মঙ্গলা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলে, 'বা রে, তোমাদের পুরুষদের ব্যাপারে আমার আবার একটা পছন্দ অপছন্দ কিসের! এ-সব বিষয়ে আমাদের মাথা ঢোকাতে যাওয়াই তো অন্যায়।'

ব'লে মঙ্গলা কি এক ছলে ঘরের বাইরে চলে যায়।

সুবল গম্ভীর মুখে ভাত খায় আর ভাবে, তাকে তুচ্ছ করবার এই আর এক কৌশল পেয়েছে মঙ্গলা। যে-কাজে মঙ্গলাকে সে আমল দিতে চায় না তাকে ঠাট্টাতামাসায় এমন ভাবে সে উড়িয়ে দেয় যেন সে কাজটা আসলে কোন কাজই নয়, ছেলেখেলা মাত্র। রাগের জবাবে রাগটা কি করে দেখাতে হয় তা সুবল জানে, কিন্তু হাসিপরিহাসের ঠিক পছন্দসই জবাবটা তার মুখে চট করে

আসে না, সব সময়েই তো আর ধমক দিয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না, বিশেষত সে মুখ যদি মেয়েদের সুন্দর মুখ হয়।

৮

সন্ধ্যার পর খাওয়াদাওয়া সেরে মেয়েকে নিয়ে ঘরের বারান্দায় মধু সা গরুর দড়ি পাকাতে বসেছিল, এক পাশে একটা চিমনিফাঁটা হ্যারিকেন জ্বলছে। এক গোছা পাট পায়ের নিচে চেপে রেখে তার থেকে একেক চিলতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মধু দড়িতে গুছি ভরছিল আর খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রঙ্গী এক হাত থেকে আর এক হাতে দড়ির দুটো অংশ বার বার বদলে নিচ্ছিল।

গাওয়াল থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ঘটনার কথা মধুসার কানে গিয়েছে। তার মধ্যে একটি হোল নবদ্বীপ সার লম্পট ছেলে মুরলীর মধুর মেয়ের হাত চেপে ধরবার কাহিনী, দুই নম্বর দড়ি ছিঁড়ে মধুর গরু প্রতিবেশী নিতাই সার বাড়ির লাউয়ের ডগায় মুখ দিয়েছিল বলে তার পিঠে নিতাইর লাঠি ভাঙবার বৃত্তান্ত। মধুর স্ত্রী সুলোচনা দুটো প্রসঙ্গেই সমান উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্য পুরুষ মধু, এতেও তার চালচলনে কথাবার্তায় কিছুমাত্র উত্তেজনা বা অসহিষ্ণুতার লক্ষণ দেখা যায়নি। কেবল একটু হুঁ ছাড়া আর কোন কথা নেই তার মুখে। গরুর গা-ভরা ছড়ির দাগগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে মেয়ের চুড়িভরা হাত খানাও মধু একটু দেখে নিয়েছে। গরুর মত নির্যাতনের চিহ্ন অবশ্য মেয়ের গায়ে নেই। হাতভরা সোনা আর রঙবেরঙের কাঁচের চুড়িগুলি ঝকঝক করছে, মুখেও কোন দুঃখ বিষাদের আভাস নেই।

দড়িতে গুছি ভরতে ভরতে মধু এক সময় জিজ্ঞাসা করল, 'ভালো কথা রঙ্গী, অজিতের কলকাতার ঠিকানাটা যেন কি?'

রঙ্গী একবার তার বাবার দিকে তাকাল, তারপর মুখ নামিয়ে বলল, '৭৷২ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোড, চিঠি আমি কলকাতায় লিখেছি।'

'লিখেছিস নাকি? কি লিখেছিস?'

রঙ্গী একটু যেন ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'লিখেছি, আমার ভারি অসুখ, কলকাতায় যাওয়া দরকার।'

মধু বলল, 'হ্যাঁ তাই ভালো, এ-সব গোলমালের মধ্যে তোর আর এখন থেকে কাজ নেই।'

অত্যন্ত নির্বিরোধ মানুষ মধু, কোন রকম গোলমালের মধ্যে সে যেতে চায় না। গরুর জন্য দড়ি পাকাতে পাকাতে মেয়ের কথাই সে এতক্ষণ ভাবছিল, ভবিষ্যতে গরু যাতে আর না ছুটে যায় সে ব্যবস্থা নতুন দড়িতেই হবে, কিন্তু মেয়েকে তো আর বেঁধে রাখা চলবেনা; তাকে পাঠাতে হবে বরের কাছে। অথচ মেয়েকে নিয়ে যাওযাব জন্য নিজের যেচে জামাইকে চিঠি লেখাটাও ভালো দেখায় না। সে হয়তো ভাববে মেয়েকে তারা আর খেতেপরতে দিতে পারছে না, মাস খানেক যেতে না যেতেই তারা অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ তো খাওয়াপরার প্রশ্ন নয়, মানমর্যাদার কথা। এতদিন মধু আগলেছে, এখন যার জিনিষ সে এসে নিয়ে যাক মধু হাঁফ ছেড়ে বাঁচুক। যাহোক মেয়েকে তার বুদ্ধিমতী বলতে হবে। জামাইর কাছে বছর দুয়েক থেকে সে কেবল চিঠি লিখতেই শেখেনি, রেখে ঢেকে কখন কতটুকু লেখা দরকার সে কৌশলও দিব্যি আয়ত্ত করেছে, রঙ্গীর শরীর খারাপ শুনে জামাই ছুটে আসবে, তারপর এসে তাকে অসুস্থ না দেখে অবাক হলেও নিশ্চয়ই খুব খুসিও হবে। মন খারাপ

হওয়াকে শরীর খারাপ বলার বেওয়াজ তো ওবয়সের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আছেই।

'মধুদা বাড়ি আছো নাকি, মধুদা।'

গলা শুনে মধু দড়ি পাকানো রেখে হ্যারিকেনটা উঠানের দিকে বাড়িয়ে ধরল, 'কে সুবল, এত রাত্রে যে।'

সুবল বলল, 'এই এলাম গল্পসল্প করতে, তুমি তো আর যাবে না মানুষের বাড়ি।' কিন্তু গল্প করতে কেবল সুবল একাই আসেনি, তাব সঙ্গে ফটিক এসেছে, বুড়ো বিষ্ণু সা এসেছে, বেঁটে বলাই এমন কি নিতাই পর্যন্ত দলের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছে।

মধু প্রথমটা ভারি বিব্রত বোধ করল, তারপর ব্যস্ত হ'য়ে সবাইকে বারাণ্ডায় ডেকে এনে বলল, 'এসো এসো, আসুন বিষ্ণুকাকা, ব্যাপার কি!' তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে মধু বলল, 'যা তো মা, ঘর থেকে মাদুরটা এনে পেতে দেতো এদের।'

রঙ্গী মাদুরটা হাতে ক'রে নিয়ে আসতেই ফটিক তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল, 'দাও, দাও, আমরাই পেতে নিতে পারব।'

বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে রঙ্গী সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে লাগল প্রত্যেকের কথা। ঘরের মধ্যে সুলোচনা কি করছিল। হঠাৎ এত লোকজনের আনাগোনা দেখে মেয়ের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল 'হাঁরে রঙ্গী, এরা আবার আজ এসেছে কেন রে?'

রঙ্গী ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে ইসারায় মাকে থামতে ব'লে বলল, 'চুপ ক'রে শোন।'

কোন রকম ভূমিকা না ক'রে সুবল একেবারে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ি এসে সব শুনেছ বোধ হয় মধুদা?' মধু নিতান্ত নিস্পৃহ

ভঙ্গিতে বলল, কিছু কিছু শুনেছি। সব বোধ হয় এবার তোমাদের কাছ থেকে শুনতে পারব।'

মধুর কথা বলবার ধরণ দেখে উপস্থিত সকলেই মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। যেন সাহায্যের জন্য নয়, পরামর্শের জন্য নয়, সাড়ম্বরে কেবল কেলেঙ্কারীর কাহিনী শোনবার জন্যই জোট বেঁধে মধুর কাছে সবাই এসেছে। মধুর বিপদে মজা দেখা ছাড়া যেন আর কারো কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীদের ওপর মধুর এত খারাপ ধারণাই বা থাকবে কেন? কি এমন অপরাধ করেছে তারা?

মনের রাগ যাতে কথার মধ্যে না ফুটে বেরোয় তার সাধ্যমত চেষ্টা করতে করতে সুবল বলল, 'অবশ্য দুঃখ তোমার মনে হবারই কথা মধুদা। মনের আর দোষ কি। সাতে নেই পাঁচে নেই, নিতান্ত নিরীহ মানুষ তুমি, অথচ ব্যাপারটা কিনা গড়াল তোমার ওপর দিয়েই। তুমি কেন, সবাই এতে দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু মনের দুঃখ কেবল মনে পুষে রাখলে তো হবে না, একটা বিহিত এবার এর করতেই হবে।'

মধু ফটিককে ডেকে বলল, 'আয়না ফটিক, হাতে হাতে দড়িটা একটু ফিরিয়ে দে। কথায় কথায় কাজও এগুবে' তারপর সুবলের কথার জবাবে বলল, 'বেশ, তোমরা পাঁচজনে মিলে করনা একটা বিহিত।' ফটিক এবার আর ধৈর্য রাখতে পারল না, বলল, 'দেখ মধুদা, বিহিত আমরা একটা করব বলেই এসেছি, কিন্তু তোমার রকম সকম দেখে মনে হচ্ছে, দায়টা যেন পাঁচজনের, এ ব্যাপারে তোমার কিছুই এসে যায়নি।'

সুবল ফটিককে ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'আঃ! থাম্ না ফটিক। শোন মধুদা, আমরা ঠিক করেছি সেদিনকার অপকর্মের জন্য দশজনের সামনে মুরলীকে রজনীর পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।'

কথা শুনে ঘরের ভিতরে সুলোচনা মাথা নাড়ল, 'না বাপু, আর আমি ওই বদমাসের সামনে নিজের মেয়েকে বার করব না। তা সে এসে পা-ই ধরুক আর যাই করুক।'

সেদিন কিছুটা ভয় পেলেও আজ সমস্ত ব্যাপারটা রঙ্গীর কাছে কৌতুকের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সুবলের প্রস্তাব মত দৃশ্যটা কল্পনা ক'রে সে মনে মনে আরো কৌতুক বোধ করল। নিতান্ত মন্দ হয় না তাহ'লে। বেশ মজা হয়। মুরলী এসে তার সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে তার দু'খানা পা চেপে ধরবে আর রঙ্গী গম্ভীরভাবে বলবে, 'ক্ষমা করলাম,' ভারি চমৎকার হবে। কিন্তু গাম্ভীর্য ঠিক মত রাখতে পারবে তো রঙ্গী? সেই মুহূর্তে তার আবার হাসি পেয়ে যাবে না তো?

রঙ্গীর মার মত তার বাবাও প্রস্তাবটা মোটেই অনুমোদন করল না। বলল, 'সেবার গঞ্জে মনোমোহন অপেরার যাত্রার মধ্যে এমন একটা দৃশ্য ছিল। লম্পট এসে মা ব'লে ক্ষমা চাইছে। মুরলীর শাস্তির কথা মাথায় আসবার আগে সেই 'জয়শ্রী' পালাটা বোধ হয় তোমার মনে পড়েছিল সুবল। কিন্তু যাত্রার পালা আর আমাদের এই গাঁয়ের ব্যাপার তো এক রকম নয় ভাই। অবশ্য কথাটা রাষ্ট্র হ'লে যাত্রার চেয়ে ও বেশি ভিড় হবে। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছ আমার ঘরদোরের অবস্থা। অত লোকজনকে জায়গা দেব কোথায়,' ব'লে মধু একটু হাসল, তারপর বল্‌ল, 'ওসব পা ধরিয়েঠরিয়ে কোন লাভ হবে না সুবল, বরং পা দু খানা তার ভেঙে রেখে দিলে কাজ হ'ত, কিন্তু এসব কাজ তখন তখনই যা করবার ক'রে ফেলতে হয়। পরে সলাপরামর্শ, বৈঠকমজলিস ছাড়া আর কিছু হয় না।'

কোন উত্তাপ উত্তেজনা নেই, অর্ধেক পাকান দড়ি আর পাটের গোছা এক পাশে গুছিয়ে রাখতে রাখতে নিতান্ত শান্তভাবে কথাগুলি মধু বলল।

বুড়ো বিষ্টু সা এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। বুড়ো হলেও কথা বেশি বলবার অভ্যাস তার বাড়েনি, সকলের কথা শুনতে শুনতে নিবিষ্ট মনে এতক্ষণ সে হুঁকো টানছিল। ইচ্ছা সত্ত্বেও হুঁকোটা কেউ তার হাত থেকে চেয়ে নিতে পারেনি, পুরো এক ছিলিম তামাক একাই শেষ ক'রে দিয়ে হুঁকোটা বেড়ার ধারে ঠেস দিয়ে রাখল বিষ্টু সা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'পা ভাঙাভাঙি তো নিতান্ত কম হয়নি মধু, মারধোর এর আগে যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু ফল হ'ল কই! স্বভাব কি কেউ ওব ফেরাতে পারলে।'

বিষ্টু সার সুরটা কারো ভালো লাগল না। তার কথার মধ্যে বেশ যেন একটু প্রশ্রয় আছে।

কথাটা যে মোটেই স্থানোপযোগী কি সময়োপযোগী হয়নি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বিষ্টু সার তা বুঝতে বাকি রইলনা, কিন্তু তাই বলে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের কথা বিষ্টু সা ফিরিয়ে নিলনা বা একেবারে উল্টো কথা বলতেও সুরু করলনা, ধীরে সুস্থে রয়েসয়ে একটু একটু করে কথার মোড় ঘোরাতে লাগল। বিষ্টু সা বলল, 'কথাটা বিশ্বাস করা একটু শক্তই। যে মারের চোটে ভূত পালাল সেই মারে মানুষের স্বভাব বদলায়না। এ কেমনতর কথা হোল! কিন্তু মুরলীর স্বভাবখানা যদি একবার চিন্তা করে দেখ তাহলে তোমরাও বলবে যে আমি ঠিকই বলেছি। মার খেয়ে মুরলীর কিছুই হয়নি। বলতে গেলে এসব আরম্ভ করেছে তো ও প্রায় সেই চোদ্দ-পনেব বছর থেকে, ঠোঁটে গোফের রেখা দেখা দেওয়ার আগেই তো বাজারের অস্থানে কুস্থানে যাতায়াত সুরু হয়ে গেছে।'

মধু বাধা দিয়ে বলল, 'সে গল্পে আর কি হবে বিষ্টু খুড়ো। সে তো আমরা সবাই জানি

ঘরের মধ্যে মার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে রঙ্গী ওদের সব আলাপ

আলোচনা শুনছিল। বিষ্টু সার কথায় সে যেমন কৌতূহল বোধ করল বাপের বাধা দেওয়ায় সে তেমনি বিরক্ত হয়ে উঠল। এই এক ধরণের স্বভাব তার বাবার। সব সময়ই গম্ভীর মুখ আর গম্ভীর মেজাজে থাকে, কোন রকম আমোদপ্রমোদ গল্পগুজব তার ভালো লাগে না। অতটা বাড়াবাড়িও যেন ভালো নয়।

মধুর কথার জবাবে বিষ্টু সা অল্প একটু হাসল, বলল 'তা জানবেনা কেন বাপু! সেসব কীর্তিকাহিনী আশেপাশের পাঁচখানা গাঁয়ের লোক পর্যন্ত জানে। তোমরা তো তোমরা। সব যখন জানো, এই বিষ্টু সার হাতেই মুরলী কি রকম মার খেয়েছে তাও নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের। বলতে গেলে এ সব বদখেয়ালের জন্য ওকে প্রথম শাসন করি আমিই। প্রায় বছর তিরিশেক আগেকার কথা, মুরলীর বয়স কত হবে তখন? পনেরষোলর বেশি নয় নিশ্চয়ই। অথচ সেই বয়সেই একেবারে পেকে উঠেছে। একদিন তো একেবারে আমার চোখে পড়ে গেল। ঘরে ঘরে বাকি বকেয়া আদায় করে হাট থেকে ফিরছি। বেশ একটু রাতই হয়ে গেছে। অন্ধকারও খুব। বাজার ছাড়িয়ে কেবল কালীবাড়ির কাছটিতে এসেছি, দেখি শ্রীমান পাড়ার ভিতর থেকে বেরুলেন। পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, হাত বাড়িয়ে কব্জীটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। এই হারামজাদা, এখন পর্যন্ত নাক টিপলে দুধ গলে আর তুমি এখন থেকেই—কান ধরে টানতে টানতে একেবারে নবুদার সামনে এনে হাজির করে বললুম, দেখ ছেলের কাণ্ড, তা মিথ্যে বলব না, শাসন নবুদাও নিতান্ত কম করেনি। কতদিন তো মেরে মেরে মুখ দিয়ে রক্ত বের করে ছেড়েছে। কিন্তু স্বভাব কি শোধরালো।'

সুবল এতক্ষণ ধরে কি ভাবছিল, বিষ্টু সার কথা শেষ হলে মধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'না মারধোরের মধ্যে আমিও আর যেতে চাই না মধুদা। এককালে ওসব খুব একচোট হয়েছে। এখন আর ওসবের

মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে এবার শাস্তি দাও সমাজ থেকে। উৎসবে আয়োজনে বিয়েতে অন্নপ্রাশনে ওর যাতায়াত বন্ধ করে দাও। কোন কাজকর্মে তো নয়ই, অমনিতেও ও যেন কারো বাড়ি গিয়ে বসবার জায়গা না পায়, পান তামাক না পায়।'

সুবলের সাহস এবং স্পষ্টবাদিতা দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। নবদ্বীপের ছেলেকে একঘরে করে রাখার কথা শুধু মনে মনে ভাবাই নয়, প্রকাশ্যে দশজনের সামনে সে কথা উচ্চারণ করতেও সুবল একটু ভয় পায় না। সকলেই অবাক হয়ে ভাবল এতখানি জোর সুবল পেল কোত্থেকে। নবদ্বীপের সঙ্গে সুবলের যে একটু রেষারেষি আছে তা পাড়ার সবাই জানে। সুবলের অসাক্ষাতে প্রত্যেকে তা নিয়ে এক আধটুকু কৌতুকও করে, নবদ্বীপ বা কি আর সুবল বা কি! এ যেন লাখোপতির সঙ্গে কুঁড়ে ঘরের মালিকের মন কষাকষি। কিন্তু একটা কথা ভেবে সবাই মনে মনে খুশি হয়। আর কিছু না হোক এমন একজন লোক অন্তত তাদের ভিতরে আছে যে নবদ্বীপের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে পারে, শক্তিতে কুলাক আর না কুলাক ঘাড় সোজা করে অন্তত তার সামনে রুখে দাঁড়াতে পারে।

নবদ্বীপও কারো পর নয়। সেও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর একজন, রক্তের সম্বন্ধ তার সঙ্গেও সকলের আছে। কিন্তু খানিকটা বুদ্ধির জোরে খানিকটা কপালজোরে কয়েক হাজার টাকার মালিক হয়ে সে যেন একেবারে অন্য মনুষ হয়ে গেছে। গঞ্জের ওপর পোক্ত বাঁধান সাতাশের বন্ধ টিনের ঘরে তার মস্তবড় তামাকের গুদাম, হাজার হাজার টাকা খাটছে তামাকের কারবারে, বছর বছর হাজার হাজার টাকা লাভ হচ্ছে, ফলে বাড়িতেও দোতালা দালান উঠছে নবদ্বীপের। তা উঠুক। পাড়ার মধ্যে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন হোলে, মানুষের মত মানুষ হলে সকলেরই লাভ, সকলেরই গৌরব। কিন্তু নবদ্বীপের

ভাবভঙ্গিতে বেশিক্ষণ যেন একথা মনে রাখা যায় না। টাকাপয়সার মুখ দেখেছে বলে জাতেও যেন সে অনেক ধাপ ওপরে উঠে গেছে। বামুন কায়েতের মতই সে যেন বহু উঁচু সমাজের মানুষ। বেশভূষা কথাবার্তা তার সাদাসিধেই আছে, কিন্তু ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তেই যে সে জমকালো পোষাক পরতে পারে এ সম্বন্ধে নবদ্বীপ নিজেই শুধু সচেতন নয়, অন্য সবাইকে সচেতন রাখবার কৌশলও জানে। ধনী নবদ্বীপের কাছ থেকে প্রয়োজন পড়লে হাত পেতে সবাই নেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সুবলের মত প্রত্যেকে তাকে হিংসাও করে। তাই সুবল যখন নবদ্বীপের বিরুদ্ধে কিছু বলে অনেকেই নিজের মনের কথা তার মুখে শুনতে পেয়ে খুশি হয়ে ওঠে।

সুবলের কথায় শান্ত নির্বিরোধ এবং ভীতু স্বভাবের মধু পর্যন্ত মনে মনে বেশ একটু উত্তেজনা বোধ করল। কিন্তু জবাব অবশ্য সে দিল তার স্বভাবসিদ্ধ নিরুত্তেজক নৈরাশ্যের ভঙ্গিতেই। বলল, 'তোমার প্রস্তাবটি তো খুবই ভালো সুবল। কিন্তু'। সুবল অসহিষ্ণু ভাবে বলল, 'তোমার, কিন্তু, কিন্তু শুনলে গায়ে জ্বর আসে মধুদা। কিন্তুটিন্তু এখন থাক। বলি আমরা যা করব তাতে রাজী আছ কি না।' মধু শান্ত ভাবে হাসল। বলল, 'কি করতে চাও তাই আগে শুনি।'

সুবল বলল, 'বেশী কিছু নয়, ছোট একটু শনির পূজার কেবল আয়োজন কর বাড়িতে। শনি দিয়েই পাড়ার শনি ছাড়াব।'

মিনিটে মিনিটে নতুন নতুন ফন্দি উদ্ভাবন করতে সুবল অদ্বিতীয়, নবদ্বীপের মত ভেবেচিন্তে অমন সূক্ষ্ম পাকা চাল সে চালতে পারে না; অত ধৈর্য নেই, অত বুদ্ধিও নেই, কিন্তু যে কোন বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছবার এবং সেই অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করবার মত সাহস আর একগুঁয়েমি দুইই সুবলের আছে।

বিষ্টু সা খানিকক্ষণ সুবলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,

'কিন্তু নবদ্বীপ সার সঙ্গে দলাদলি করাটা কি ভাল হবে সুবল, আর দলাদলি ক'রে কি তার সঙ্গে পারবে ?'

সুবল বলল, 'আমরা পারি আর না পারি আপনি যে পারবেন না সে কথা জানতে বাকি নেই। মধুদা, আমার কথার জবাব কিন্তু এখনো পাইনি।'

মধু একবার দোরের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে তাকাল। সুলোচনা মাথা নাড়লে মধু সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে সুবলকে বলল, 'তোমরা যা করবে তাতেই রাজী আছি সুবল, কিন্তু—

সুবল তীক্ষ্ণ একটু হাসল, 'কিন্তু নিজে কিছু করতে রাজী নই ?'

মধু অপ্রতিভ ভাবে বলল, 'মানে হাঙ্গামাটা নানা কারণে এ বাড়িতে না হওয়াই ভালো, বুঝতেই তো পারছ। আগে মেয়েটিকে পার করে নিই।' সুবল বলল, 'ওর পারাপারে কিছু আসে যায় না। আচ্ছা, হাঙ্গামার জায়গা আমরাই দেব। সেজন্য ভেবনা মধুদা, তুমি কেবল কয়েক হাঁড়ি রসের যোগাড় রেখ।'

৯

নিমন্ত্রণ না ক'রে নবদ্বীপকে অপমান করার উদ্দেশ্যে নিজের বাড়িতে শনির পূজা করবার আগে সুবল একবার বিনোদকে গিয়ে ধরল। ব'লে ক'য়ে নবদ্বীপের বিরুদ্ধতা ক'রতে আর কেউ সাহসী হবে না, পাড়ায় নবদ্বীপ অনেকেরই মহাজন, প্রত্যেকের সঙ্গেই তার জটিল রকমের আর্থিক সম্বন্ধ আছে। ভিতরে ভিতরে তাকে ঈর্ষা করলেও সেই সম্বন্ধ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। এক পারে বিনোদ। তার দোকানপাট নেই, ব্যবসাবাণিজ্য নেই, স্ত্রীপুত্র ঘরসংসার কিচ্ছু নেই।

খোলকরতাল নিয়ে বছরের বেশীর ভাগ সময় সে তো গ্রামের বাইরেই থাকে। নবদ্বীপকে তার ভয় কিসের? তাছাড়া বিনোদের বাড়িতে শনির পুজো হলে নবদ্বীপকে নিমন্ত্রণ না করার অজুহাত অন্য ভাবেও দেওয়া চলবে। বিনোদ বলতে পারবে যে সে নিতান্ত অবৈষয়িক, সংসারের ব্যাপারে কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষ। মোটেই চৌপিঠে ধরণের নয়। একদিকে নজর দিতে গেলে আর একদিকে তার চোখ থাকে না। কে কাকে নিমন্ত্রণ করেছে না করেছে তার কিছু খেয়াল নেই। না হলে ইচ্ছা করে কি আর নবদ্বীপের মত লোককে সে অনিমন্ত্রিত রেখেছে। নবদ্বীপ বুঝবে সবই কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কিছু বলতে পারবেনা। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

কিন্তু যে সব কথা বিনোদ নবদ্বীপকে বলতে পারত সেই কথাগুলিই বলে বসল সুবলকে। বিনোদ বলল, 'সত্যিই তো সুবলদা অত সব হাঙ্গামায় আমার দরকার কি? এখন তো বলতে গেলে আমি দেশান্তরীই হয়েছি। নিতান্তই বাড়ীর ওপর একখানা ঘর আছে আর ঘরের মধ্যে বুড়ো মা এখনো মরেনি, আমার সংসারীর লক্ষণ তো এই। এর জন্যে দলাদলি, লৌকিকতা সামাজিকতার মধ্যে আমার না যাওয়াই ভালো। বেশ আছি, খোল কাঁধে নিয়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই। যখন স্মরণ করো এসে উপস্থিত হই, দয়া করে যদি শুনতে চাও সাধ্যমত শক্তিমত ভগবানের নাম শুনাই। বাস, আমার কাজ শেষ। সবাই কি আর সব কাজ পারে, না, সকলের সব রকম যোগ্যতা থাকে সুবলদা। তাছাড়া শনিবার পর্যন্ত তো আমি বাড়িতে থাকতেও পারব না। তার আগেই আমাকে যেতে হবে। গোলকগঞ্জের পোদ্দারদের কথা দিয়ে এসেছি।'

সুবল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আচ্ছা, যেয়ো।'

স্বামীর মুখ থেকে সব কথা শুনল মঙ্গলা, হেসে বলল, 'কেমন, হোল তো? গরীবের কথা বাসি হলে কাজে লাগে। বোঝা গেছে তোমাদের পুরুষদের মুরোদ। আচ্ছা বেশ, তোমার দলে আর কেউ না আসে আমি তো আছি। অত ভাবনা কেন?'

সুবল ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ কর্ মাগী। সব সময় অত রঙ্গরস ভালো লাগে না।'

মঙ্গলা বলল, 'রঙ্গরস নয়, সত্যি বলছি। পূজো আমার বাড়িতেই হবে। তুমি আর সব যোগাড় দেখ। ভিতরের সব আমি যদি একা সামলাতে পারি তুমি বাইরেরটাই বা পারবে না কেন? আর পাঁচজনে দরকার নেই, আমরা দুজনেই যথেষ্ট।'

সুবল মুহূর্তকাল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জোরাল ভাষায় দৃঢ় ভঙ্গীতে যখন মনের সঙ্কল্প প্রকাশ করে মঙ্গলা বেশ দেখায় তাকে। সুন্দর মুখে কঠিনের ছাপ লাগে। নাক ঠোঁট চিবুক মনে হয় যেন পাথর থেকে কুঁদে বেরিয়েছে।

ঘরে যাই হোক, বাইরের সংসারে যে দু'জনই যথেষ্ট নয় একথা সুবল জানে। তবু মেয়েছেলের মুখে এই ধরণের মিথ্যা দম্ভ শুনতে বেশ লাগে। কেউ একজন যখন বলে আমিই তো আছি আর দশ জনকে দিয়ে তোমার দরকার কি, তখন সেই দশজনের জন্যেও মন আকুলি বিকুলি করে—আমার যে একজন আছে দশজনকে তা না শুনিয়ে এলে, সাধ মেটেনা। একজনের মুখের মিষ্টি বাইরের দশজনের মুখেও যেন মধু মাখিয়ে দেয়।

স্বামীকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মঙ্গলা বলল, 'কি দেখছ অমন করে? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

সুবল সস্নেহে বলল, 'দেখছি তোর ক্ষ্যাপামি। মাঝে মাঝে আমার

রাশভারি বুদ্ধিমতী বউও কেমন পাগলাটে ধরনের হয়ে ওঠে তাই দেখছি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা এখন মনেও নেই।'

মঙ্গলা বলল, 'থাক্ থাক, রঙ্গরসে আর কাজ নেই। আমি কি রঙ্গরসের মানুষ নাকি তোমার যে ওসব কথা বলছ আমাকে। গাল দেবে ধমকাবে লাথি মারবে আমি আছি সেই জন্যে। রসের কথা বলবার জন্যে মনের মত বউ একজন ঘরে এনে নাও তারপর ব'লো।' সুবল মুচকি হেসে তামাক সাজতে বসল।

দলাদলির ভয়ে বিনোদের পিছিয়ে যাওয়ার কথা শুনে মঙ্গলার ভারি খারাপ লেগেছে। দুহাতে চাল ডাল ধার নেওয়ার সময় বিনোদ মঙ্গলার বাড়িতে আসবে, কিন্তু মঙ্গলার স্বামীর একটা অনুরোধ সে রাখবে না, নানা অজুহাতে তা এড়িয়ে যাবে, মানুষের এমন ব্যবহার কেউ সহ্য ক'রতে পারে? মঙ্গলা যেন আশা করেছিল যেহেতু মঙ্গলার স্বামী গেছে তার কাছে, যেহেতু মঙ্গলার নামের গন্ধ আছে ব্যাপারটীর মধ্যে শুধু সেই লোভেই বিনোদ সুবলের সব কথায় রাজী হয়ে যাবে। আর তাতে মান বাড়বে মঙ্গলারই, স্বামীর কাছে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় থাকবে। সময়ে অসময়ে বিনোদকে মঙ্গলার চাল ডাল তরি তরকারি ধার দেওয়াটাও সুবলের কাছে সঙ্গত এবং সার্থক মনে হবে। কিন্তু বিনোদ তার ধার দিয়েও ঘেষল না; এক কথায় বলে দিল সে বৈরাগী বাউণ্ডুলে মানুষ, সামাজিক দলাদলির ব্যাপারে সে নেই। বৈরাগী বাউণ্ডুলে হওয়ার মধ্যে ভারি তো পৌরুষ, ভারি যেন গৌরবের কথা সেটা। বউ মরে গেছে তবে আর কি! বউ যেন সংসারে কারো আর মরে না। সেজন্য সংসার ছাড়তে হবে? সমাজ সামাজিকতা ছেড়ে বাউণ্ডুলে হতে হবে? বেঁচে থাকতে সেই বউয়ের যেন কত যত্ন করত বিনোদ, কত ভালবাসত। সে সব কিছু নয়; আসলে বিনোদ ফাঁকে ফাঁকে থাকতে চায় সব রকম ঝামেলা ঝক্কি

এড়িয়ে চলতে চায়। এ স্বভাব তার বউ বেঁচে থাকতেও ছিল, বউ মরে যাওয়ার পরও আছে। ভারি ভয়কাতুরে মানুষ বিনোদ, মোটেই পুরুষ মানুষের মত নয়। মেয়েমানুষ হয়েও মঙ্গলার যতখানি সাহস আছে, যত মনের জোর আছে, বিনোদের তার শতাংশের একাংশও নেই। যদি মঙ্গলার মত মেয়েমানুষের হাতে পড়ত বিনোদ মঙ্গলা তাকে শাড়ি পরিয়ে রান্নাঘরে পাঠাত, নিজে বেরোত হাটবাজারে। বিনোদের শাড়িপরা ঘোমটা দেওয়া রূপ মনে মনে কল্পনা ক'রে মঙ্গলা হেসে উঠল।

সুবল তামাক টানতে টানতে বলল 'কি হোল, হাসছিস যে অমন ক'রে?'

মঙ্গলা একটু যেন চমকে উঠল, তারপর বলল, 'তোমাদের দেশের পুরুষের সাহসের কথা ভেবে। হাটবাজার ক'রে দাও। শনির পূজো ক'রে দলাদলি দেখবে আমি একাই বাধাব। মোড়লী কিন্তু আমাকে দিতে হবে।' সুবল হুঁকোটা স্ত্রীকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তার আগে এইটা ধর।'

মঙ্গলা ছাড়াও সুবলের সহায় অবশ্য জুটল, পাড়ার অনেকেই আকারে ইঙ্গিতে জানাল তারা আছে পিছনে। সুবলকে শুধু সাহস করে একটু এগিয়ে যেতে হবে। আর এগিয়ে যাওয়ার মত ক্ষমতা পাড়ায় সুবলের ছাড়া কারই বা আছে। দশজনে তাকে মানে গণে, গঞ্জে ব্যবসার অবস্থা মন্দ নয়, হাত পাততে হয় না কারো কাছে; সংসারে ছেলে পুলে নেই, ঝক্কি ঝামেলা নেই; ঘরে বাইরে কেবল স্বামী আর স্ত্রী। কাউকে ভয় করতে যাবে সুবল কিজন্যে, ইচ্ছা ক'রলে যে কোন রকম ঝুঁকিই তো সে নিতে পারে।

সুবল মনে মনে ভারি খুসি হয়ে উঠল। এতগুলি লোক বিশ্বাস

ক'রছে তাকে, এতগুলি লোক নির্ভর ক'রছে তার উপর ; এখন পিছিয়ে গেলে ওরা মনে ক'রবে কি। নবদ্বীপ তার যত ক্ষতি ক'রতে পারে করুক, পাড়ার দশজনের কাছে মুখ হারাতে সুবল পারবে না।

দিন তিনেক আগে থাকতেই উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হোল। কুড়ি তিনেক খেজুর গাছ কাটে সেখেদের ইয়াসিন। তাকে ব'লে রসের বন্দোবস্ত ঠিক রাখা হোল। বাগান থেকে এক ছড়া পাকা কলা দিল ফটিক, মধুসা নিজে দিল ছড়া তিনেক, বাকি সব গঞ্জের হাট থেকে সুবল আর ফটিক কিনে আনল। দু'দিন ধরে আলতা আর তার মাকে নিয়ে মঙ্গলা ঢেঁকিতে চাল কুটে গুঁড়ো তৈরী ক'রল। অদ্ভুত উৎসাহ তার এসব কাজে ; কোন ক্লান্তি নেই যেন হাওয়ায় ভেসে চলছে।

পুজোর দিন ভোরে ফটিক আর পাশের বাড়ির নিতাইকে নিয়ে সুবল দুধ কিনতে গেল বাজারে। গোটা পাঁচেক পিতলের কলসী নিল সঙ্গে। পাড়া পড়শীরা দুধের দামটা চাঁদা ক'রে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সুবল নিতে রাজী হয়নি। শুধু কলসী ধার নিয়েছে আর দুধ ভরতে কলসী বয়ে আনবার জন্যে চেয়েছে লোক। না হয় পনের বিশ টাকাই খরচ হবে এই শনির পুজোয়। এর জন্যে আবার চাঁদা তুলবে নাকি সুবল ? চাঁদা দিতে হবে না কাউকে শুধু গায়ে খেটে সাহায্য ক'রলেই চলবে।

ঘর পাঁচ ছয় সাহার ব্রাহ্মণ আছে গ্রামে। সুবল নিজের পুরোহিত ভুবন চক্রবর্তীকে গিয়ে আগেই খবর দিয়ে এল। সন্ধ্যার পর ছোট্ট একটু চাঁদোয়া টাঙানো হোল উঠোনে। তার তলায় হবে পুজো। নারায়ণ সম্বন্ধে তো আপত্তি নেই কিন্তু শনি ঠাকুরকে ঘরে আহ্বান ক'রবে কে ? তিনি বাইরে বসেই পুজো নিন, এবং খুসি হয়ে বাইরে থেকেই নিষ্কৃতি দিয়ে যান গৃহস্থকে। তাঁর অর্চনা প্রসন্নতার জন্যে নয়, তাঁর অপ্রসন্নতার ভয়ে।

উঠোনে চাঁদোয়ার তলে ছোট ছোট দু'খানি জলচৌকি পাতা হয়েছে। জল চৌকির ওপর নীল আর লাল রঙের কাপড়ের টুকরো বিছিয়ে দিয়েছে মঙ্গলা। নীল রঙ শনির প্রতীক, রক্ত রং সত্যনারায়ণের। বারকোষ ভরেছে ফুল বেলপাতায়। দ্বীপ জ্বলছে, ধূপ পুড়ছে, প্রতিদিনের অতি প্রয়োজনীয়, অতি পরিচিত এই উঠোনটি হঠাৎ আজ এক পবিত্র পূজা মণ্ডপে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

দুধারে সারিতে সারিতে জ্বাল দেওয়া রসের ভাড় দুধের ভাড়। ফলমূল নৈবেদ্যের সঙ্গে কলাপাতায় কলা আর চালের গুঁড়ো স্তূপীকৃত ক'রে রাখা হয়েছে। পূজো শেষ হোলে দুধে রসে আর চালের গুঁড়োয় 'সিন্নি' তৈরী হবে।

সামনে মাদুরের ওপর আগন্তুকদের আসন। সবেমাত্র দু'একজন আসতে সুরু করেছে। প্রথম দিকটায় নিমন্ত্রিতদের সমাগম এমন অল্প সল্পই হয়। একটা পূজো যখন শেষ হয়ে আসে, আয়োজন সুরু হয় প্রসাদ তৈরী ক'রবার. লোকের ভীড় তখন বাড়তে থাকে। শীতের রাত্রে বাইরে হিমের মধ্যে আগাগোড়া ব'সে থাকবার মত নিষ্ঠাবান ভক্ত খুব বেশি মেলে না।

কিন্তু শনির পূজো সুরু হয়ে প্রায় শেষ হবার উপক্রম হোল, লোকজন আসবার লক্ষণ দেখা গেল না। ভুবন চক্রবর্তীর অনুমতি নিয়ে ফটিকের ভাইপো রতন শনি ঠাকুরের পুঁথি পড়তে সুরু ক'রল। কিন্তু মাঝে মাঝে শনির প্রীত্যর্থে উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি ঘোষণা ক'রবার মত দু তিন জনের বেশি লোক জুটল না। হঠাৎ নবদ্বীপদের বাড়ীর ওদিক থেকে প্রবল শব্দে কাঁসর ও শঙ্খের শব্দ শোনা গেল। সুবল আর ফটিক পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ব্যাপার কি? পাল্লা দিয়ে নবদ্বীপও কি পূজো সুরু ক'রল নাকি?

আন্দাজ অনুমানের প্রয়োজন রইল না। ফটিক নিজে গিয়ে

গোপনে গোপনে খোঁজ নিয়ে এল। সত্যই তাই। নবদ্বীপও সাড়ম্বরে আজ বাড়ীতে নারায়ণ-পূজোর আয়োজন করেছে। উদ্যোগ পর্বের কথা কিছুমাত্র আগে থাকতে প্রকাশ করেনি। ভিতরে ভিতরে সব অনুষ্ঠান আয়োজন শেষ ক'রেছে। তারপর সন্ধ্যার সময় বাড়িতে বাড়িতে নিজে এসে প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ ক'রে গেছে নবদ্বীপ। শুধু বাদ দিয়েছে ফটিক আর সুবলকে। দুধে রসে আর চালের গুঁড়োয় মিশিয়ে তরল কাঁচা সিন্নির ব্যবস্থা নয়, প্রসাদের পাকা বন্দোবস্ত করেছে নবদ্বীপ। দু'চারখানা বাতাসা নয় বাজার থেকে মণে মণে সন্দেশ আর রসগোল্লা আনিয়েছে, পেটভরে প্রসাদ বিতরণ করা হবে নিমন্ত্রিতদের। যার যতখানি চাই। কোন রকম সংকোচ, কোন রকম লজ্জা যেন কেউ না করে।

ব্যাপারটা কিছু কিছু প্রত্যেকেই জানে। অথচ সুবলকে সকলেই গোপন ক'রে গেছে। আর কেবল গোপন করাই নয়, সুবলের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে, নির্লজ্জের মত তারা গিয়ে জুটেছে নবদ্বীপের ওখানে। ফটিক বলল, 'মানুষের কথার চেয়ে, মান সম্মানের চেয়ে বাজারের সন্দেশ, রসগোল্লার দামই কি এত বেশি হোল সুবলদা?'

শনির পূজো শেষ হোল, সত্যনারায়ণের পূজো শেষ হোল কিন্তু প্রসাদ নেওয়ার জন্যে নিমন্ত্রিত কাউকে আসতে দেখা গেল না। ছেলে পুলে দু'চারজন যারা এসেছিল ফলের টুকরো আর বাতাসা দিয়ে সুবল তাদের বিদায় ক'রল।

ফটিক বলল, 'এসো সুবলদা, প্রসাদ মেখে ফেলি তারপর ঘটি ভ'রে ভ'রে হতভাগাদের গলার ভিতরে ঢেলে দিইগে চ'ল।'

সুবল বলল, 'না, তার চেয়ে নদীর জল ভালো।' মঙ্গলা বলল, 'বলো কি, গায়ের রাগে টাকা পয়সা দিয়ে কেনা জিনিষ নষ্ট ক'রে ফেলবে? এযে চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মত

শোনাচ্ছে। প্রসাদ আর কেউ না খেতে আসে আমরা নিজেরা তো আছি। এত কষ্টকরে দুধ জ্বাল দিলাম, রস জ্বাল দিলাম, চালের গুঁড়ো ক'রলাম, পা ব্যথা হয়ে গেল ঢেঁকি চালাতে চালাতে, এখন সব নদীর জলে ফেলে দিয়ে এস। আহাহা, কি সোহাগের কথাখানা রে। বালাই নিয়ে মরি অমন রাগের।' সুবল ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ! নাটাপানা চোখ মুখ ঘুরিয়ে অমন ঢং ক'রে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবিনে, খবরদার। তোর কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার তেলো পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। নদীর জলে না ফেলে দিস তো নিজে ব'সে ব'সে গিলতে থাক। তারপর গিলে পেট ফুলে মর।' তারপর ফটিকের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'আর রাত বাড়িয়ে কি হবে ফটকে। প্রসাদ মাখতে হয় মাখ, না মাখতে হয় ফেলে দে। রাত বাড়সনে।'

আর কোন কথা না ব'লে সুবল গিয়ে তামাক সাজতে বসল।

সুবল যাই বলুক প্রসাদ একেবারে না তৈরী ক'রলে চলে না। আলতা খেটেছে, ফটিক খেটেছে, কিছু ওরা এখানে বসে খাক, কিছু বাড়ীতে নিয়ে যাক আর সকলের জন্য। আলতা আর ফটিককে নিয়ে মঙ্গলা প্রসাদ মাখতে শুরু ক'রল। অবশ্য সুবলের কথার ভঙ্গিতে এসব জিনিষ তার আর ছুঁতেও ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু এতো কেবল স্বামীস্ত্রীর রাগারাগি মান অভিমানের ব্যাপার নয় যে মঙ্গলা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। দুজনই হোক একজনই হোক বাইরের লোক যখন সামনে আছে তখন ওদের যত্নও ক'রতে হবে খাতিরও ক'রতে হবে, মনের জ্বালা মনে রেখে হাসিমুখে দু'চারটে কথা না বললেও চলবে না। দুধের সঙ্গে রস মিশিয়ে তার মধ্যে চালের গুঁড়ো ঢালতে ঢালতে আলতা বলল, 'হোল কি তোমার? মুখ যে একেবারে অন্ধকার ক'রে রইলে। সোয়ামীর কথায় অমন মুখ ভার ক'রে থাকতে হয় নাকি

বউদি ?' মঙ্গলা বলল, 'না তা কি আর হয়। সোয়ামী মুখ ঝামটাই দিক আর লাথিই মারুক মুখ ভার করাটা মেয়েমানুষের অপরাধ।' আলতা বলল, 'অপরাধ ছাড়া কি ? কথায় বলে মুখচন্দ্র। এ তো আর আকাশের চাঁদ নয় বউদি যে মেঘে ঢাকবে অমাবস্যায় দেখা যাবে না। মুখের চাঁদের মেঘও নেই, অমাবস্যাও নেই, সব সময় কেবল পূর্ণিমা।' মঙ্গলা বলল, 'পূর্ণিমা কতক্ষণ থাকত, সোয়ামীর লাথি খেলেই একবার বুঝতে পারতিস।' আলতা গভীর খেদের অভিনয় ক'রে বলল, 'কি ক'রে বুঝব বউদি, বুঝবার আগেই কপাল গেল পুড়ে। এখন তো মনে হয় বেঁচে থেকে চব্বিশ ঘণ্টা সে যদি লাথিও মারত তাহ'লেও টু শব্দটি করতাম না, জীবন ধন্য মনে ক'রতাম।'

ঠাট্টার ভঙ্গিতে কথাটা আরম্ভ করেছিল আলতা কিন্তু শেষের দিকে গলাটা যেন তার অন্য রকম শোনাল। চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকাল মঙ্গলা। দশ এগার বছর বয়সের সময় আলতার স্বামী মারা গেছে। বিয়ে হয়েছিল ন'বছরে। তারপর কৈশোর থেকে আরম্ভ করে ভরা যৌবন কাল পর্যন্ত লাথি মারবার মত পুরুষ না হোক পায়ে পড়বার মত মানুষ যে দু'একজন না এসেছে আলতার তা নয়—মঙ্গলা সে সব খবর রাখে। কিন্তু তবু আলতার দুঃখ যায়নি, আশা মেটেনি। পুরুষ দু'চারদিনের জন্য মনের মানুষ হয়ে পায়ে ধরে সেধেছে, চির কালের ঘরের মানুষ হয়ে পায়ে রাখেনি—সেই দুঃখ কি এতই দুঃসহ লাগছে আলতার ? লাথি খেয়ে খেয়ে মঙ্গলার কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য রকম সাধ যায় আজকাল। ইচ্ছা হয় দেখতে পুরুষমানুষ পা চেপে ধরলে কেমন লাগে। এতকাল তো পুরুষের পায়ের ওপর মাথা কুটে কুটে কপাল ফুলে গেল, এবার নিজের পায়ের ওপর ওদের কারো কপাল ঠোকান দেখতে ইচ্ছা করে। তাতে নিজের কপাল যদি পোড়ে পুড়ুক। সে পোড়ার মধ্যে সুখ আছে।

প্রসাদ মেখে সাধাসাধি করে সুবলকে খাওয়াল আলতা, খাওয়াল মঙ্গলাকে। তারপর ছোট কলসীটায় এক কলসী তরল সিন্নি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল বাড়িতে। নারায়ণের প্রসাদ ঘরে নিলে দোষ নেই। যাওয়ার সময় ফটিক এক কলসী নিয়ে গেল সঙ্গে। লোকজন তেমন কেউ না আসায় ভাগে অপ্রত্যাশিত ভাবে বেশিই পড়েছে ফটিকেব। সুবলের মত মনে তাব অত ক্ষোভও নেই দুঃখও নেই। ফটিক চলে যাওয়ার পর সুবল আর এক ছিলিম তামাক ভরল, তারপর আস্তে আস্তে টানতে টানতে আজকের ব্যাপারটার কথা আদ্যোপান্ত ফের চিন্তা করে দেখল। বিশ্বাসঘাতক দুর্বল ভীরু প্রতিবেশীদের কথা মনে হতেই মন তার আরেকবার ধাক করে জ্বলে উঠল। কলকীতে তামাক পুড়তে লাগল আর ভিতরে ভিতরে পুড়ে যেতে লাগল সুবলের মন। এর প্রতিশোধ সে নেবেই নেবে। সহজে ছাড়বে না। সুবলকে যেন তেমন নির্বোধ অক্ষম পুরুষ বলে কেউ না ভাবে।

মঙ্গলা ধীরে সুস্থে সব মুছল, গুছাল, জিনিসগুলি একে একে ঘরে নিয়ে যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দিতে লাগল যেন কোন তাড়া নেই ব্যস্ততা নেই, সমস্ত রাতই পড়ে আছে তার কাজের জন্য। তবু এক সময় কাজ শেষ হোল। সুবল একটু আগেই বারান্দা থেকে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। সেরে তেরে মঙ্গলাও এবার দোর বন্ধ করতে যাবে হঠাৎ দেখা গেল বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হ্যারিকেন হাতে কে যেন এদিকে এগিয়ে আসছে। আসতে আসতে লোকটি একেবারে উঠোনের ওপর এসে উঠল। মঙ্গলা ঘোমটা টেনে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে ঢুকবে লোকটি তার মুখের সামনে হ্যারিকেন উঁচু ক'রে ধরে বলল, 'পালাচ্ছ কেন বউদি? আমি বাঘ ভাল্লুক নই।'

হ্যারিকেনের আলোয় মঙ্গলাও দেখল মুরলীকে। এর আগেও অনেকবার দেখেছে। সুবলের মা যখন বেঁচে ছিল মুরলী প্রায়ই

আসত এবাড়িতে। আমের সময় আম খেত, পিঠের সময় পিঠে। নবদ্বীপের সঙ্গে সুবলের ভিতরে ভিতরে তখন এমন রেষারেষির সম্পর্ক ছিল না। বৈকালে সুবলের মা প্রায়ই নবদ্বীপের কাছে গিয়ে হাত পাতত মুখে দু'চারটে রুক্ষ কথা বললেও নবদ্বীপ তাকে একেবারে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিত না। শাশুড়ী মারা যাওয়ার পরও মুরলী মাঝে মাঝে এসেছে, কথা বলতে চেষ্টা ক'রেছে মঙ্গলার সঙ্গে। কিন্তু সমস্ত পাড়া ভ'রে তখন মুরলীর দুর্ণাম। মনে মনে কৌতূহল যতই থাকুক মুখ ফুটে তার সঙ্গে কথা বলতে মঙ্গলার সাহস হয়নি। কে কখন কি বলে বসবে তার ঠিক কি। আর মুরলীর সঙ্গে কথা বার্তা বলা সুবলের যে পছন্দ নয় তাও তার বুঝতে বাকি থাকেনি। কোন কোন সময় সুবল স্পষ্টই তাকে নিষেধ করে দিয়েছে, 'খবরদার, ওর সামনে বেরুবিনে ; লোক ভালো নয় ও।' কিন্তু মুরলী যখন বিজয়ার দিন এসে মঙ্গলার পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রেছে পায়ের ধূলো তুলে নিয়েছে তখন ধান দূর্বা তার মাথায় দিতে দিতে মুরলীর সঙ্গে কথা না বলে থাকা মঙ্গলার পক্ষে সম্ভব হয়নি। লোক যতই খারাপ হোক মুরলী তাতে মঙ্গলার কি ? পায়ের ধূলো যে নিতে আসে তার মন্দত্বের কথা কি মনে থাকে ? কিন্তু গৃহস্থের বউকে তো কেবল পায়ের ধূলো দিলেই চলে না। পূজা-পার্বনের দিনে কেউ এলে হাতে তার একটু মিষ্টিও দিতে হয়, মিষ্টিমুখে দুটো কথাও বলতে হয়।

কোন কোন সময় মঙ্গলা হেসে বলেছে, 'আপনার ভক্তি দেখে যে ভয় হয় ঠাকুরপো। অতি ভক্তি যেন কিসের লক্ষণ লোকে বলে।'

মুরলী জবাব দিয়েছে, 'চোরের। কিন্তু তোমার অত ভয় কিসের বউদি ?'

'কেন চুরি যাওয়ার মতন কোন জিনিষ কি আমার নেই ?'

মুরলীও হেসেছে, 'খুব আছে। কিন্তু বড় কড়া পাহারায়। আমার মত ছিঁচকে চোরের সাধ্যকি সেখানে হাত বাড়ায়।'

মঙ্গলা জবাব দিয়েছে, 'সে কথা মনে থাকে যেন।'

সে কথা অদ্ভুত ভাবে মুরলী মনে রেখেছে। দু'একটা ঠাট্টা তামাসার কথা ছাড়া আর কোন রকম আপত্তিজনক ব্যবহার মুরলী তার সঙ্গে করেনি। মনে মনে এর জন্ম গর্ব বোধ করেছে মঙ্গলা। এ কেবল বাইরের কড়া পাহারার ভয় নয় এর চেয়েও শক্ত পাহারা মুরলী ডিঙিয়ে গেছে। আসলে সুবলকে নয়, ভয় করে মুরলী মঙ্গলাকেই। তার রাশভারী স্বভাবের কাছে দুনিয়ার কোন লম্পট আমল পায় না, পায়ের ধুলো ছাড়া আর কোন দিকে সাহস পায়না হাত বাড়াতে।

তারপর অন্যদিকে মন গিয়েছে মুরলীর, অন্তের দিকে মন গিয়েছে। বয়স বাড়া সত্বেও বিশ্রী সব কেলেঙ্কারী কাণ্ড ক'রেছে পাড়ার মধ্যে। শুনে মঙ্গলার ঘৃণা হয়েছে রাগ হয়েছে, কেমন এক ধবনের দুঃখও যে না হয়েছে তা নয়।

মিনিট খানেক নিঃশব্দে হ্যারিকেনটা উঁচু ক'রেই রাখল মুরলী তারপর সেটাকে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'দেখলে তো? ঘুঁচলতো এবার ভয়?'

মঙ্গলা বলল, 'মানুষ কি কেবল বাঘ ভাল্লুককেই ভয় করে?'

মুরলী বলল, 'পুরুষমানুষের ভয় কেবল বাঘ ভাল্লুককেই। মেয়ে মানুষের ভয়ের জিনিষ অবশ্য আরো আছে।'

মঙ্গলা বলল, 'না। ভয় মেয়েমানুষেরও কেবল বাঘ ভাল্লুক দেখলেই হয়। ইঁদুর টিকটিকি ছুঁচো চামচিকে দেখলে তাদের যে গা শির শির ক'রে ওঠে সেটা ভয়ে নয় ঘেন্নায়। বসুন। ডেকে দিচ্ছি আপনার দাদাকে।'

ঘরের মধ্যে গিয়ে মঙ্গলা স্বামীকে ডেকে তুলল, 'ওঠো, ঠাকুরপো এসেছেন।'

সুবল ততক্ষণ নাক ডাকাচ্ছিল। এদিক থেকে ভারি চমৎকার স্বভাব সুবলের। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বোজে আর বুজবার সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে নাক ডাকতে সুরু করে।

সুবল চমকে উঠে বসল, 'কে! কে এসেছে?' মঙ্গলা আবার বলল, 'ওবাড়ির মুরলী ঠাকুর পো।' সুবল বিস্মিত হয়ে বলল, 'মুরলী! কেন? এত রাত্রে মুরলী এখানে এসেছে কেন?'

মঙ্গলা বলল, 'কেন আবার? মজা দেখতে। আমরা কি রকম জব্দ হয়েছি তাই চাক্ষুষ দেখে যেতে।'

সুবল বলল, 'হুঁ।' তারপর মুরলীকে ডেকে বলল, 'বাইরে কেন, ঘরে এসে ব'স মুরলী। তারপর, এত রাত্রে কি মনে ক'রে?'

মুরলী জবাব দিল, 'মনের কথাতো বউদির মুখে এইমাত্র শুনলে। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তোমার ভারি অবিশ্বাসী খুঁৎখুঁতে ধরণের মন সুবলদা। না, ঘরে যাব না, রাত হয়েছে। মিষ্টির হাঁড়িটা তুলে রাখ বউদি। এটা শনির নয়, নারায়ণের প্রসাদ। ঘরে নিলে দোষ হবে না।'

মঙ্গলা বেরিয়ে এসে বলল, 'নারায়ণের প্রসাদ ঘরে আমরা নিয়েছি ঠাকুরপো। আর দরকার নেই। ওটা নিয়ে যাও, ললিতা আর তার মাকে দিয়ো।'

মুরলী বলল, 'তাহ'লে সুবলদা, তুমি নিজেই এসে তুলে নিয়ে যাও। পরের মেয়ে কেবল বাইরের শত্রুতাটুকুই বোঝে, বাইরের রেষারেষি, রক্তারক্তিই তার চোখে পড়ে, ভিতরের রক্তের টান সে ধরবে কি ক'রে! বুড়ো বললে, 'আহা এত লোক খেল, কেবল সুবল আর বউমাই বাদ যাবে! দলাদলি যখন আরম্ভ ক'রেছে তখন ডাকলে

তো আর তারা আসবে না। তুই যা, নিজে গিয়ে প্রসাদ দিয়ে আয় ওদের। আর কারো হাতে পাঠাতে ভরসা হয় না বাপু, হয় তো তাকে অপমান ক'রে বসবে। কিন্তু তোকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিলে তো আমার গায়ে লাগবে না। বলবি, সামাজিক ভাবে দলাদলি করুক, রাগারাগি করুক, না আসতে চায় না আসুক আমার বাড়ি। কিন্তু ঘরে বসে জ্যেঠার দেওয়া প্রসাদ খেলে তার মানও যাবে না, জাতও যাবে না।' মুরলীর কথার ভঙ্গিতে সুবলের বুকের মধ্যে যেন কেমন ক'রে উঠল। পরস্পরের মধ্যে নিকটতর রক্তের সম্বন্ধকে যেন নতুন ক'রে অনুভব ক'রল সুবল। মুরলী যেন কোন অপরাধ করেনি, সুবল যেন তার শাস্তির জন্য দল পাকাবার চেষ্টা করেনি, নবদ্বীপের আশ্বাস এবং আশ্রয় পেয়ে সুবল যেন হঠাৎ ভারি তৃপ্তি বোধ ক'রল; ভারি নিশ্চিন্ত হোল, পরাজয়ের গ্লানি রইল না মনে।

সুবল বলল, 'অত ক'রে তোমাকে বলতে হবে না মুরলী, জ্যেঠার মনের ভাব আমি জানি।'

মুরলী বলল, 'না জানবার তো কথা নয় সুবলদা। বাবা যে আমার চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবাসেন, বেশি নির্ভর করেন তোমার ওপর এ তো গ্রামসুদ্ধ লোক দেখেছে।'

সুবল কথা না ব'লে মৃদু একটু হাসল।

মুরলী হ্যারিকেনটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'তা হ'লে প্রসাদটা তুলে রাখ, আমি চলি।'

কিন্তু মুরলী চ'লে যাওয়ার আগেই মঙ্গলা এল ঘর থেকে বেরিয়ে, বলল, 'দাঁড়ান।'

মুরলী ফিরে তাকাল। মঙ্গলার পরণে অনেককালের পুরোণ গরদের একখানা শাড়ি, পুজো পার্বনের দিনে মঙ্গলা এখানা বার করে পরে। কিন্তু এই রং ফিকে হয়ে যাওয়া খাটো জীর্ণ গরদের

শাড়িখানায় মঙ্গলার রূপ যেন আরো বেশি ক'রে খুলেছে। মঙ্গলাকে মনে হচ্ছে তপস্বিনী সন্ন্যাসিনীর মত। মুখখানা শুকনো শুকনো রুক্ষ, কিন্তু সেই কঠিন মুখে মঙ্গলা যখন বিদ্যুতের মত এক ঝিলিক হাসল সে হাসি চোখে এসে বিঁধলেও মুরলী চোখ বুঝতে পারল না।

মঙ্গলা বলল, 'দাঁড়ান, দাদার সঙ্গে খুব তো আপোষ নিষ্পত্তি করলেন। প্রসাদ কি কেবল দিয়েই যাবেন, নিয়ে যাবেন না? পুজোতো আমাদেরও হয়েছে।' মুরলী বলল, 'দিচ্ছ কই যে নেব? দিয়ে দেখ নিই কি না নিই।'

মঙ্গলা বলল, 'তাহোলে আসুন, বসুন এসে ঘরে'। মুরলী বলল, 'কিন্তু এত রাত্রে আবার ঘরে কেন, যা দেবার এখানেই দাও।'

মঙ্গলা বলল, 'থাক আর লজ্জার দরকার নেই। এবার চ'লে আসুন ঘরে।'

ঘরের ভিতরে আসন পেতে দু'খানা ঠাঁই ক'রল মঙ্গলা। পিতলের রেকাবিতে শশা আর আঁখের টুকরো সাজিয়ে দিল, পাথরের বাটি ভ'রে দিল তরল সিন্নি। মুরলীর আনা মিষ্টিগুলি দুভাগ ক'রে দু'জনের পাতে তুলে দিল।

সুবল বসতে বসতে বলল, 'আবার আমাকে কেন?'

মঙ্গলা মুরলীকে যা বলেছিল সুবলকেও তাই বলল, 'থাক আর লজ্জা করতে হবে না।'

মুরলী বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওকি, সবই আমাদের পাতে দিয়ে দিলে যে। নিজের জন্য কিছুই রাখলেনা? মঙ্গলা জবাব দিল, 'না। পরের মেয়ে কি অত সহজে ভোলে? আপোষ নিষ্পত্তি কি আর এত সহজে হয় তার সঙ্গে? এ তো রক্তের টান নয়।' বলে মঙ্গলা মুখ মুচকে একটু হাসল।

আর সেই হাসির ভঙ্গিতে অকস্মাৎ মুরলীর রক্তের সমুদ্র যেন উত্তাল হয়ে উঠল। মুরলী মনে মনে ভাবল, এও একরকমের টান। কেবল এর ধরণ আলাদা।

১০

কলকাতা থেকে মধু সার জামাই অজিত এল তার স্ত্রী রঙ্গীকে নিয়ে যেতে। এক বছর বাদে এক সপ্তাহের ছুটিতে এসেছে শ্বশুরবাড়ি। কোথায় মুখে থাকবে প্রসন্নতার ছাপ, কথা বার্তায় থাকবে খুসির আমেজ তা নয় কঠিন গাম্ভীর্যে মুখ খানা তার থম থম ক'রছে। এই মুখ ভার হওয়ার হেতু যে কি তা শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমান করতে বাকি রইল না। পথে নিশ্চয়ই কেউ সাতখানা বানিয়ে জামাইয়ের কান ভারি করে দিয়েছে। শত্রুর তো অভাব নেই পাড়ায়। ভালো কেউ ক'রতে পারুক আর না পারুক মন্দ ক'রতে পারে অনেকেই।

কোনরকমে মাথাটা একটু নিচু করে প্রণাম পর্ব সারল অজিত, কুশলপ্রশ্নের জবাব দিল শুষ্ক কণ্ঠে, জলখাবারের প্রায় সব জিনিসই থালায় ফেলে রাখল, শেষে দু'একটা একথা ওকথার পরই হঠাৎ শাশুড়ীকে বলে বসল, 'কালই ভোরে আমার রওনা হতে হবে। ওকে বলবেন রাত্রেই যেন সব গুছিয়ে টুছিয়ে রাখে।'

সুলোচনা শুকনো মুখে একটু হাসল, 'এত তাড়া কিসের বাবা। এতদিন বাদে এই তো এলে, দু'দিন থাকো—।' অজিত বলল, 'না, হয়ে উঠবেনা। কাল ভোরেই—'

সুলোচনা এবার একটু তরলস্বরে বলতে চেষ্টা ক'রল, 'আচ্ছা, সে ভোরের তো এখনো দেরী আছে। রাতটা তো আছে মাঝখানে।'

অজিত এবার সোজা শাশুড়ীর দিকে তাকাল। সুলোচনা লজ্জিত

হয়ে বলল, 'মানে এসব কথার আলোচনা রাত্রেই করা যাবে। তোমার শ্বশুরও তখন ফিরবেন হাট থেকে।'

মাঝখানে রাতটা আছে। অজিতের মনে হোল রাতটা না থাকাই ভালো ছিল। রঙ্গী কোন কথা স্পষ্ট ক'রে লেখেনি, কিন্তু বিষ্টু সা ইঙ্গিতে তাকে অনেক কথাই জানিয়ে দিয়েছে। কুমারগঞ্জ থেকে হাটের সওদা নিয়ে সে অজিতের নৌকায় উঠে বসেছিল। বলেছিল, 'এতটা পথ বোঝাবিড়ে নিয়ে হেঁটেই যেতে হোত, কিন্তু তোমার নৌকা যখন পেয়ে গেলাম নাতজামাই তখন আর হেঁটে মরব কোন্ দুঃখে।'

তারপর বলবনা বলবনা ক'রে, চেপে যাচ্ছে চেপে যাচ্ছে ভাব দেখিয়ে বিষ্টু সা অনেক কথাই বলেছে। অজিত মুখ বিকৃত ক'রে একবার বলেছে, 'থাক।' কিন্তু পরমুহূর্তে আবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'হু, তারপর ?'

রাত্রে রঙ্গী একটু বিশেষ ধরণেই সাজগোজ ক'রল। ট্রাঙ্ক থেকে নামিয়ে জমকালো শাড়ি পরল একখানা। কলকাতা থেকে আসার সময় অজিত নিজে হাতে এখানা কিনে দিয়েছিল। পায়ে আলতা, কপালে টিপ, পান আর খয়েরের রসে ঠোঁট দুটি রঞ্জিত হয়ে উঠল। খোঁপার মধ্যে গোঁজা সোনার চিরুণী ঝিক ঝিক ক'রতে লাগল, আর তেলের গন্ধে ঘর উঠল ভরে।

অজিত কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'এই বেশেই কি সেদিন কীর্তনে গিয়েছিলে নাকি ?'

রঙ্গী যেন চমকে উঠল, সেই অপ্রীতিকর অপবিত্র প্রসঙ্গ স্বামীর মুখে কেন! মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে রঙ্গী বলল, 'তোমার কি তাই বিশ্বাস হয় ?'

অজিত বলল, 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা থাক। আমার বিশ্বাসের কি মান রেখেছ ?'

রঙ্গী সাহস ক'রে আরও একটু ঘেঁষে বসল স্বামীর কাছে, তারপর খুব কোমল মিনতিপূর্ণকণ্ঠে বলল, 'সত্যি ক'রে বলো ত কে কি বলেছে তোমাকে? মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে কে তোমার মন খারাপ করে দিয়েছে।'

অজিত বলল, 'বানিয়ে বানিয়ে!'

রঙ্গী বলল, 'বানিয়ে বানিয়ে ছাড়া কি! ওবাড়ির মুরলী দা তো সম্পর্কে আমার ঠাকুরদা হয়।'

অজিত হাসল, 'সম্পর্কে কি হয় জানিনে, কিন্তু বয়সে নিশ্চয় ঠাকুরদার বয়সী নয়।'

রঙ্গী বলল, 'তার আমি কি জানি। ঠাকুরদার সম্পর্ক ধরে কেউ যদি একটু ঠাট্টা-তামাসা ক'রতে আসে আমি তো আর বলতে পারিনে, আগে ঠাকুরদার বয়স হোক তারপর এসব কথা বলতে এসো।'

অজিত বলল, 'সে তো ঠিকই। একথা বলতে প্রাণে যে বাজে। কিন্তু তামাসাটা নাকি একটু বাড়াবাড়ি ধরণের হয়ে গিয়েছিল শুনতে পাচ্ছি।'

রঙ্গী দমল না, বলল, 'শুনবেনা কেন? বাড়িয়ে বাড়িয়ে যদি কেউ বলে কানে বাড়াবাড়ির মতই শোনায়। আর পোড়া দেশের লোক পারে তো কেবল ওই। রান্নাঘরের হাঁড়িতে কুকুরে এসে মুখ দিলে যত রাগ যায় তাদের হাঁড়ির ওপর। কুকুরের কিছুই করতে পারেনা, কেবল কাছা আঁটে আর কোমর বাঁধে।'

অজিত স্ত্রীর দীপ্ত ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মনে মনে যেমন ভেবেছিল, রঙ্গী ঠিক তেমনটি ক'রলনা দেখে সে খুসিই হ'ল। রঙ্গী যদি অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে থাকত, কান্নাকাটি করত কিংবা পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইত, তাহলে তার অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ আরো বাড়ত অজিতের। কিন্তু ঘাড় বাঁকিয়ে রাগে মুখ লাল ক'রে রঙ্গী যে অজিতকে

কতকগুলি কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল, তখন কান তৃপ্ত না হ'লেও মনের জ্বালা যে অজিতের অনেকখানি শান্ত হ'ল একথা তার মুখের ভাবে গোপন রইলনা।

পরদিন ভোরে অজিতকে আরও প্রসন্ন দেখাল। রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে শাশুড়ীর তৈরী চা আর জল-খাবার খেতে খেতে কলকাতার গল্প ক'রল। শ্বশুরকে নিতান্ত আপনজনের মত জানাল নিজের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। বেলগাছিয়া কলেজে হাউস সার্জ্জনগিরি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার অজিত নিজেদের গাঁয়েই ডিস্‌পেনসারি খুলে বসবে। ও অঞ্চলে ভাল ডাক্তার নেই। দশখানা গাঁয়ের মধ্যে অজিতই হবে প্রথম এম, বি, ডাক্তার। রোজগারও হবে, দেশের সেবাও হবে।

পুরোপুরি এক সপ্তাহ অবশ্য অজিত রইলনা; দিন পাঁচেক কাটিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সে কলকাতায় রওনা হোল। কিন্তু এই কদিনের মধ্যেই শ্বশুরের পাড়াপ্রতিবেশীদের সম্বন্ধে নানা রকম টিপ্পনী আর মন্তব্যে সমস্ত পাড়াকে বেশ চঞ্চল ক'রে তুলল। অজিতের চ'লে যাওয়ার পরও পুরুষদের তাসের আড্ডায় আর মেয়েদের জলের ঘাটে কেবল তার কথাই আলোচনা হ'তে লাগল।

কেবল টীকাটিপ্পনীই নয়, আচারে আচরণে অজিত আরও কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছে গাঁয়ের লোককে। মাঝখানে একদিন নবদ্বীপ নিজে এসেছিল নিমন্ত্রণ করতে, 'দুপুরে আজ তোমার মেয়েজামাইকে আমার ওখানে নিয়ে যাচ্ছি মধু। তারপর অজিতের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'গরীবের বাড়িতে এ বেলা দুটি শাকান্ন মুখে দিতে হবে বাবাজী। আমার বউমার ভারি ইচ্ছে তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে ব'সে খাওয়ায়।'

অজিত হাত জোড় করে জবাব দিয়েছিল, 'আজ্ঞে না, মাফ

করবেন। জানেনই তো, ডাক্তার মানুষ! যেখানে সেখানে পাত পাততে সংস্কারে বাধে।' যেখানে সেখানে! রাগটা মনে মনে হজম করে নবদ্বীপ মুখে হাসি টেনে বলেছিল, 'যেখানে সেখানে নয় হে বাবাজী, আমার বাড়িও তোমার শ্বশুর বাড়িই। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দেখ তোমার শাশুড়ীকে।' তারপর রসিকতার তাৎপর্যটুকু নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছিল, 'মধু আমার নাতি হয় সম্পর্কে।' অজিত বলেছিল, 'আজ্ঞে তা জানি, আপনাদের দেশের নাতিনাতনি-ঠাকুরদার সম্পর্কের মাধুর্যের কথা কিছু কিছু আমিও শুনেছি। কিন্তু তার মধ্যে বিদেশীকে দয়া করে টেনে আনবেন না। তার চেয়ে এক কাজ করুন না কেন তাঐ মশাই! আমাদের অল্পবয়সী ঠাকুরদা ঠানদিকেই বরং এখানে পাঠিয়ে দিন। আমার ও ভারি ইচ্ছা ওঁদের দুজনকে এক-সঙ্গে দেখি। আমার মত ওঁদের তো আর এমন শুচিবাই নেই, আহারে-বিহারে কোন বাদবিচারও নেই।' নবদ্বীপ তবু শুষ্ক মুখে হেসেছিল 'কানে শোনা এক কথা, চোখে দেখা আর এক। তাদের কি আছে কি নেই নিজের চোখেই একবার দেখে এসো না বাবাজী।' প্রত্যুত্তরে অজিত শহুরে কায়দায় আর একবার মাত্র অল্প একটু হাত-জোড় করেছিল, কোন কথা বলেনি।

কিন্তু মঙ্গলা যখন এ-বাড়ি বেড়াতে এসে অজিত আর রঙ্গীকে নিমন্ত্রণ জানাল, অজিত না তো করলই না বরং সানন্দে রাজী হয়ে গেল। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই গিয়ে উপস্থিত হোল সুবলের বাড়ি, পিঁড়ি পেতে বসল, গাঁয়ের কথা শুনল, সহরের কথা শোনাল, তারপর পেট ভ'রে খেয়ে প্রসন্নমনে ফিরে এল। আসবার সময় বলল, মঙ্গলার মত এমন বউ এ গাঁয়ে তো ভালো এ অঞ্চলেও নেই। শহরের রীতিমত লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের বউ ঝিয়ের সঙ্গেও সে নাকি তাল রেখে চলতে পারে। রঙ্গী একবার

মুচকি হেসে আর কারো কাণে না যায় এমন স্বরে স্বামীকে বলেছিল, 'কাকীমা কিন্তু সম্পর্কে তোমার শাশুড়ী হন ভুলে যেয়োনা'। অজিত সে কথা কাণে তোলেনি।

সুবলকেও কম সার্টিফিকেট দিয়ে যায়নি অজিত। এ গাঁয়ে পুরুষ মানুষ সত্যিই যদি কেউ থাকে সে সুবল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি কিছুটা প্রতিবাদ করবার সাহস থাকে তা সুবলেরই আছে। সব কথা অজিত রঙ্গীর কাছে শুনেছে। শুধু রঙ্গী কেন, গাঁয়ের সব লোকই একথা বলত যদি নবদ্বীপের ভয়ে মুখ তাদের বন্ধ হয়ে না থাকত।

শুনে সুবল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। শনির পূজায় তার পরাজয়ের গ্লানি আর অগৌরব এত দিনে যেন মুছে গেল। পাড়ার সমস্ত লোক সুবলের বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়ে নবদ্বীপের বাড়ি গিয়ে খেলে কি হবে পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যে তাদের মত নয়, যে অসংকোচে নবদ্বীপকে প্রত্যাখ্যান করে সুবলের বাড়ি এসে নির্ভয়ে পাত পেতে বসতে পারে, মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে পারে সুবলের পৌরুষ আর মহত্ব। সঙ্গে সঙ্গে সুবলের মনে খানিকটা ভাবান্তরও হয়েছিল। সেদিন দলাদলিতে কোনঠাসা হয়ে সুবলের যেমন নবদ্বীপের সঙ্গে রক্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা মনে প'ড়ে গিয়েছিল, আজ অজিতের অজস্র প্রশংসায় আর অভিনন্দনে সুবল অন্য রকম অনুভব করল।

সুবলের মনে হোল রক্তগত ঐক্য নবদ্বীপের সঙ্গে তার থাকলেও সুবল সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ ; তার ইচ্ছা অনিচ্ছা আলাদা, ভালোমন্দ-বোধ আলাদা, পাড়ার লোকের সত্যি সত্যি সে যতখানি উপকার ক'রতে চায়, যেমন চায় গাঁয়ের ব্রাহ্মণকায়স্থের সমাজে তাদের মান বাড়ুক, তাদের ভিতরকার অনাচার কদাচার দূর হোক, লেখাপড়া শিখে বাইরের পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তাদের ছেলেপুলেরা

মেলা-মেশা ক'রতে পারুক ; কিন্তু এ ধরনের কোন ইচ্ছাও নেই, তেমন কোন চেষ্টাও নেই নবদ্বীপের। কেবল তার সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে বলে আর তার মত চাল সুবলও মাঝে মাঝে চালতে যায় ব'লেই কি নবদ্বীপ আর সুবল এক রকমের মানুষ? পাড়ার লোক যখন মাঝে-মাঝে বলে, বুদ্ধিতে কৌশলে সুবল এ পাড়ার ভবিষ্যৎ, নবদ্বীপ সা তখন খুসি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবল একটু ক্ষুণ্ণও হয়। বুদ্ধি হয়তো সুবলের আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি কি নবদ্বীপের মত অমন ক্রুর আর কুটিল, না, বুদ্ধি তেমন বাঁকা না হওয়া পর্যন্ত লোকে বুদ্ধিকে বুদ্ধি বলেনা!

সুবলের বাড়ি এসে অজিতের নিমন্ত্রণ খাওয়ার কথা খানিকক্ষণ বাদেই নবদ্বীপের কানে গিয়েছিল। কিন্তু মনে মনে প্রচণ্ড রাগ হোলেও বাইরে কোনরকম চাঞ্চল্য কি ভাব বৈলক্ষণ নবদ্বীপ দেখায়নি। কার জামাই কার বাড়িতে এসে খেল না খেল সেই মেয়েলি ব্যাপারে মন দেওয়ার মত সময় কি নবদ্বীপ সার আছে না থাকলে ভাল দেখায়? সুবল প্রস্তুত হয়েই ছিল। যদি এ নিয়েও নবদ্বীপ আবার কোন রকম চক্রান্ত করবার চেষ্টা করে সুবল তাকে সহজে ছাড়বে না, গতবারের মত ভয়ে চুপ করেও থাকবে না। কিন্তু নবদ্বীপকে এসব ব্যাপার নিয়ে মোটেই আর মাথা ঘামাতে দেখা গেল না। গঞ্জের ব্যবসাবানিজ্য নিয়ে সে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, ব্যস্ততা নেই কেবল মুরলীর। তার হাট বাজার নেই, বেচাকেনা নেই, সংসারের কিছুই তাকে দেখতে শুনতে হয়না। ভোরে উঠে নবদ্বীপ যায় গঞ্জে, মনোরমা সংসারের কাজে মগ্ন থাকে, ললিতা মাঝে মাঝে মায়ের ধমক খেয়ে সংসারের কাজে লাগে, তারপর একটু ফাঁক পেলেই পালায়, পাড়ায় গিয়ে সমবয়সী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে জোটে। মুরলী সঙ্গী পেলে প্রায়ই তাসপাসা খেলে, কোন দিন গঞ্জের লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ ক'রে আনা নভেলের দুচার

পাতা পড়ে, পড়তে পড়তে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে দেহের প্রসাধন সুরু হয়। দাড়ি কামায়, টেরী কাটে, মুখে স্নো-পাউডার মাখে, তারপর ধোপদুরস্ত জামা কাপড় পরে বেড়াতে বেরোয় গঞ্জের দিকে। যে গঞ্জ তার বাবার, তার পাড়াপ্রতিবেশীর কর্মস্থল, যেখানে তারা গ্রীষ্মের দিনে ঘামে-ধুলোয় মাখামাখি হয়ে থাকে, বর্ষায় এক হাঁটু কাদার মধ্যে পান সুপুরি হলুদ লঙ্কা বিক্রি করে, মুরলী সেজেগুজে সেখানে যায় বেড়াতে সান্ধ্য আমোদ প্রমোদের জন্য। যে সব জায়গায় যে সব বাসা বাড়িতে তার পাড়াপ্রতিবেশীরা ঢুকবারও সাহস করে না, মুরলী সে সব জায়গায় সাদর অভ্যর্থনা পায়। ছোট দারোগার চেম্বারে বসে সে প্রথমটা বাংলা খবরের কাগজ পড়ে, চা খায়; তারপর রাত যত বাড়তে থাকে তত পানীয় বদলায়, পানপাত্র বদলায়, ছোট দারোগা আর মুরলীর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত প্রভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। নারী সম্বন্ধে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলে মুরলী। তাদের দেহ মন আয়ত্তে আনবার কলাকৌশলগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়, আবার স্বাদ যখন একঘেয়ে হয়ে আসে তখন নিরাপদে এবং অনায়াসে কি করে তাদের বর্জন ক'রতে হয় সে বিদ্যা সম্বন্ধেও মুরলী তার তরুণ দারোগা বন্ধুকে অবহিত ক'রে তোলে।

মুরলী জানে এই বর্জনের বিদ্যাটা সহজ নয়। কোন মেয়ের দেহমন অধিকার করা যত কঠিন, প্রয়োজন শেষ হ'লে সেই অধিকার সরিয়ে আনা আরও শক্ত। প্রায়ই দেখা যায় মুরলীর যখন কাজ শেষ হয়েছে, আসক্তি মিটেছে, ঠিক তখনই হয় তো মেয়েটি কি বধূটি চোখের জলে মুরলীর দু পা ভিজিয়ে দিতে সুরু করল, কিংবা দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধ'রে রাজ্যের সোহাগের কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিল। যে একদিন কিছুতেই আসতে চায়নি, সে আজ যেতে চায় না; যে একদিন ধরা দিতে চায়নি, সে আজ কিছুতেই ছাড়া পেতে রাজী নয়।

এমন বিপদে মুরলীকে প্রত্যেকবারই পড়তে হয়েছে। বার বার প্রতিজ্ঞা ক'রেছে মুরলী, আর আসবে না এ সব ব্যাপারের মধ্যে। এই মোহ ভঙ্গের মত শাস্তি আর নেই। প্রত্যেকবারই কোন না কোন সময় এমন একটি দশা আসবেই যখন কাজল-কালো চোখ দুটির সেই রহস্যময় দৃষ্টিকে মনে হবে গরুর চোখের মত নির্বোধ, নিরুত্তেজ, যখন আবেগ রুদ্ধ গদগদ ভাষাকে মনে হবে ন্যাকামি, প্রত্যেকটি চাল-চলন আচার আচরণকে দুঃসহ বোকামি ব'লে ঠেকবে। এই মোহ একদিন না একদিন ভাঙবেই। কিন্তু ফের আবার মোহ যখন আসে তখন সেই ভাঙবার কথা মনে থাকে না, মন এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে।

রঙ্গীর ব্যাপারটা এত সহজে এত তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়ায় মুরলী মনে মনে খানিকটা স্বস্তিই বোধ করল। যদিও নবদ্বীপের ভয়ে আর বুদ্ধির কৌশলে পাড়ার পাঁচজনে মুরলীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করেনি, সুযোগও পায়নি, তবু মুরলীর মনে কিসের একটা অস্বস্তি অনুক্ষণ কাঁটার মত বেঁধেছে। তার একটা অদক্ষ কাঁচা কাজের সাক্ষী হয়ে মেয়েটা এখানে প'ড়ে থাক, আর লোকে আকারে ইঙ্গিতে তাই নিয়ে হাসি মস্করা করুক, তা মুরলী কিছুতেই চায় না। তার চেয়ে মেয়েটা এখান থেকে স'রে গেলেই ভালো। দু'দিন বাদে লোকেও ভুলবে, মুরলীও ভুলবে।

কিন্তু রঙ্গীকে নিয়ে চ'লে যাওয়ার আগে তার স্বামী অজিত যখন তার সম্বন্ধে বেশ খানিকটা কটু মন্তব্য ক'রে গেল, নবদ্বীপের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে সুবলের বাড়িতে খেয়ে তার বউ মঙ্গলার শতমুখে প্রশংসা ক'রে গেল, তখন আকস্মিক অপ্রত্যাশিত একটা ঈর্ষার খোঁচা লাগল যেন মুরলীর মনে। অজিত যেন শুধু নিজের স্ত্রীকে নিয়েই এ গ্রাম থেকে বিদায় হয়নি, অন্য একজনের স্ত্রীর মনেও নিজের প্রভাব রেখে গেছে। অবশ্য সে স্ত্রী মুরলীর নিজের নয়। তবু ঈর্ষার জ্বালাটা

মুরলী নিজেই অনুভব করল। স্ত্রী মনোরমার মুখে কিছু কিছু গল্প শুনতে পেয়েছে মুরলী। অজিত যেদিন রঙ্গীকে নিয়ে যায় মঙ্গলা স্বেচ্ছায় গিয়ে তাদের মালপত্তর বাঁধতে সাহায্য ক'রেছে, গুছিয়ে দিয়েছে বাক্স পেটারা, নদীর ঘাট অবধি তাদের এগিয়ে দিয়ে এসেছে। মঙ্গলার বয়সী আর কোন বউই পাড়ার অন্য বাড়ির জামাই-কনের সঙ্গে এমন করে মেলা-মেশা ক'রতে সুযোগ পায়না। কিন্তু মঙ্গলার কিছুতে আটকায় না। মাথার ওপর তার শাশুড়ী নেই, স্বামীর ওপর তো সর্বদাই টেক্কা দিয়ে চলে, এই বয়সেই একেবারে রাশভারি বড়-লোকের বাড়ির গিন্নিবান্নির মত চালচলন। তবু এই স্বাধীন স্বেচ্ছাচারিতার জন্য মঙ্গলার বদনাম হয় না। কারণ মঙ্গলাকে দিয়ে অনেক কাজ হয়। বিয়ে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কারো বাড়িতে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের আয়োজন হ'লে রাঁধবার জন্য ডাক পড়ে মঙ্গলার। রান্নার এমন মিঠে হাত আর কারো নেই। কোন রকমের অসুখ বিসুখ কারো হ'লে মঙ্গলা যায় শুশ্রূষা ক'রতে। সেবাযত্নেও ভারি অনলস আর নিপুণ তার হাত। ছেলেপুলের ঝামেলা না থাকায় মঙ্গলার বেশ সুবিধাই হয়েছে। ঘরে কাজ নেই, ঘরে তার মন নেই ; দুহাতে নির্বিচারে বাইরের লোকের প্রশংসা কুড়িয়েই সে খুসি।

একদিন এই সদগুণের ডিপো বউটির সম্বন্ধে মুরলীর বিশেষ কোন ঔৎসুক্য ছিল না। নিজের স্ত্রীর মতই তাকে অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং নীরস প্রকৃতির মেয়ে মানুষ বলে মনে ক'রত মুরলী। কিন্তু সেদিন শনির পূজার, রাত্রে মঙ্গলার যেন আর এক পরিচয় পেয়ে এসেছে মুরলী। তার বিরূপতাও মুরলীর ভালো লেগেছে, ভালো লেগেছে তার সরাসরি সতেজ কথাবার্তা, তার স্পর্দ্ধিত সপ্রতিভতা মুরলীকে যেন আরো মত্ত ক'রে তুলেছে। মুরলী লক্ষ্য ক'রেছে পাড়ার অন্য বউঝিরা তাকে দেখলেই তাড়াতাড়ি আড়ালে গিয়ে পালায়, তারপর

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে। কিন্তু মঙ্গলাকে কোন দিন অমন সে পালিয়ে যেতে দেখেনি। সহজভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছে, হাসিঠাট্টা ক'রেছে, কিন্তু এতটুকু বাড়াবাড়ি করবার সাহসও কোনদিন মুরলীর হয়নি। মঙ্গলার দু-চোখের দৃষ্টি ঘৃণায় আর অবজ্ঞায় এমন কঠিন এমন বিরূপ দেখিয়েছে যে মুরলী এক পাও আর এগুতে পারেনি। হরিণীর চোখের মত মেয়েদের চোখে যে-ভয় তার মধ্যে হয়তো প্রশ্রয়ও আছে, কিন্তু ঘৃণায় যে-চোখ আবিল দু'চোখ মেলে তার দিকে তাকানো যায় না। নীরস নিষ্প্রাণ ব'লে মঙ্গলাকে মুরলী এতদিন বাদ দিয়ে এসেছে, কিন্তু হ্যারিকেনের আলো মুখের ওপর ফেলে আলোর চেয়েও উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত যে মুখ তার চোখে পড়েছে সে মুখ ভোলবার নয়। সে মুখের দিকে তাকিয়ে ধারণা বদলে গেছে মুরলীর। নীরস নয়, রস মঙ্গলার মধ্যেও আছে, কিন্তু সে রস তাল আর খেজুর গাছের মত দুরূহ কঠিন আবরণের মধ্যে। তা হোক, বাইরের আচ্ছাদন যত শক্ত ভিতরে রসের মাদকতা তত বেশি।

রান্নাঘরে দুধের কড়াটা ভালো ক'রে ঢেকে রেখে মনোরমা এসে স্বামীর পাশে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল মুরলীর সেই তদ্গত ভাব। তারপর অল্প একটু হেসে বলল, 'খুব বুঝি দুঃখ হয়েছে মনে, না?'

মুরলী একটু যেন চমকে উঠল, তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন, দুঃখ হবে কেন?'

মনোরমা মুখ মুচকে হাসল, 'শীকার যে হাতছাড়া হয়ে গেল।'

মুরলীর মুখে একটু যেন বেদনার ছাপ পড়ল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিতান্ত লঘু তরল কণ্ঠে জবাব দিল, 'তাই ভেবেই নিশ্চিন্ত আছ বুঝি? শীকার কি আমার একটি যে তা হাতছাড়া হয়ে গেলেই হাত গুটিয়ে ব'সে থাকব?'

মনোরমা বলল, 'তা হ'লে আজ থেকেই ফের হাতড়াতে শুরু ক'রে দাও।'

মুরলী হাসল, 'দেখা যাক। তোমার কিন্তু মোটেই নির্ভয় হওয়ার কারণ নেই, পৃথিবীতে যতদিন একটি মেয়েও থাকবে ততদিন তোমার সতীনের শেষ হবে না।'

মনোরমা বলল, 'তাই নাকি? ঈস, সেই ভয়ে তো, দিন রাত আমার ঘুম হচ্ছে না।'

কি একটা কাজে মনোরমা একটু বাদেই স'রে গেল সেখান থেকে।

ভয় না হয় নেই, কিন্তু দুঃখও কি নেই মনোরমার মনে? স্ত্রীর হাবভাব চালচলন দেখে একেকবার তাই অবশ্য মনে হয় মুরলীর। মনোরমার আর সেই জোর নেই, জিদ নেই, সেই কান্নাকাটি ঝগড়াঝাটি নেই। আজকাল অদ্ভুত ভাবে শান্ত হয়ে গেছে মনোরমা। এতদিনে সে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে মুরলীকে। এখনো আগের মতই একেকদিন মদে বেসামাল হয়ে যখন অনেক রাত্রে ঘরে ফেরে মুরলী, মনোরমা সেকালের মত আর তুমুল কোলাহল বাধায় না, দোর বন্ধ ক'রে বলেনা, 'এখানে আবার কেন? যেখানে ছিলে সেখানেই থাক গিয়ে; বরং শান্তভাবেই আজকাল এসে দরজা খোলে মনোরমা, অপ্রকৃতিস্থ স্বামীর সেবাপরিচর্যা করে, সস্নেহ শাসনে খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, বাতাস দেয়, হাত বুলিয়ে দেয় কপালে; আগেকার মত দেয়ালে নিজের কপাল ঠুকতে যায় না। ভারি শান্ত, ভারি লক্ষ্মী বউ হয়েছে আজকাল মনোরমা। মুরলী মনে মনে ঠিক এমনটিই বোধ হয় চেয়েছিল। মুরলী যাই কিছু করুক না মনোরমা মুখ বুজে থাকবে, চোখ বুজে সব সহ্য করবে। কিন্তু আজ মনোরমা সত্যি সত্যিই যখন মুরলীর পছন্দ মত আদর্শ স্ত্রী হয়ে উঠেছে তখন মুরলীর মনে হচ্ছে

মনোরমা মাটির মত সহিষ্ণু আর শান্ত হওয়ায় মুরলীরও অর্ধেক জীবন যেন মাটি হয়ে গেছে। উচ্ছৃঙ্খলতায় আর তেমন রঙ নেই, মত্ততায় নেই আর তেমন উত্তেজনা। ভিতর থেকে নরম একখানা হাতে কেউ যদি হাত টেনে না ধরে বাইরের ছুটোছুটিতে কি আর তেমন আনন্দ পাওয়া যায়? ঘরের কোণে বসে কেউ যদি চোখের জল না ফেলতে থাকে বাইরের আগুন নিয়ে খেলা কি আর তেমন জমে?

অবশ্য খুব দাপাদাপি ছটফট করবার মত শরীরের শক্তিও আজকাল আর তেমন নেই মনোরমার। বছর দশেক আগে মেয়ে হওয়ার সময় সেই যে সহরের ডাক্তার এনে অপারেশন করাতে হয়েছিল তারপর থেকে শরীরও আর তার ভালো হল না, ছেলে-পুলেও কিছু হল না।

আগে আগে মনোরমা স্বামীকে বলত, 'এসব অনাচার কদাচার না ক'রে বিয়ে কর আরেকটা। বেশ থাকবে, মেয়ে হবে, ছেলে হবে—'

মুরলী হাসত, 'কিন্তু তোমার যে সতীনের ঘর।' মনোরমা জবাব দিত, "আহা হা, সতীন যেন আমার একেবারেই নেই—'

মুরলী বলত, 'থাকলই বা, ঘরের এক সতীনের চেয়ে বাইরের হাজার সতীনও অনেক ভালো। তারা বড় জোর স্বামীর ভাগই নেয়, ঘর-সংসারের ভাগ নিতে আসে না।'

নতুন বউ এনে নাতির মুখ দেখবার জন্য প্রথম প্রথম নবদ্বীপও কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু আরো অনেক আশাআকাঙ্ক্ষার মত এ আশাও মুরলীকে দিয়ে সফল হয়নি। রাতের পর রাত বাজারের মেয়ে ছেলের ঘরে কাটিয়েছে মুরলী, পরের বউঝিয়ের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করেছে, তবু নবদ্বীপের ইচ্ছামত, উপদেশ মত, ঘরে একটি স্বাস্থ্যবতী বউ নিয়ে আসেনি। বলেছে, 'ছেলে না হয় নাই হ'ল, কিন্তু তার জন্য আপনার বউমার ওপর অবিচার ক'রতে পারি না, তার তো কোন অপরাধ নেই—।'

নবদ্বীপ রুষ্ট হ'য়ে উঠেছে, 'বিয়ে না ক'রেই যেন খুব সুবিচার করছ তার ওপর।'

কিন্তু নবদ্বীপ স্বীকার না করলেও মনোরমা স্বামীর এই মহত্বটুকু যে মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়েছে তার হাবে-ভাবে চাল-চলনে এ কথা মুরলীর কাছে গোপন থাকেনি। অনেক অনাচার অত্যাচারের মধ্যেও দাম্পত্য জীবনের এই মাধুর্যটুকু মনে মনে উপভোগ ক'রেছে মুরলী। মনোরমার এই কৃতজ্ঞতা আর নিজের এই অল্প একটু স্বার্থত্যাগ, অপরিমেয় ক্ষতির সামান্য একটু পরিপূরণের চেষ্টায় যে আনন্দ তার সঙ্গে বাইরের উচ্ছল ফেনিল রাত্রিগুলির তুলনা হয় না. একথা মুরলী অনেকবার অনুভব ক'রেছে। অনেকবার প্রতিজ্ঞা করেছে এবার থেকে শান্ত ভদ্রভাবে দিন কাটাবে। কিন্তু দু'দিন কাটতে না কাটতেই যেই চোখে পড়েছে অন্য কোন নারী, দুর্বোধ সংকেতময় চোখ, অনাস্বাদিত দুটি অধরোষ্ঠ, অমনি নতুনত্বের নেশা আর বৈচিত্র্যের মোহ মুরলীকে উন্মত্ত করে তুলেছে; যেন এমন রহস্য আছে তার মধ্যে, এমন স্পর্শসুখ আছে সেই অস্পৃষ্ট ত্বকে, যার স্বাদ, যার সন্ধান মুরলী এতকাল পায়নি। ঘরের শান্ত মাধুর্য দু'পায়ে ঠেলে মুরলী ফের সেই দুষ্প্রাপ্যার পিছনে পিছনে ছুটেছে, পায়ে পায়ে ফিরেছে।

রঙ্গী তার চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়ায় একদিক থেকে যেমন এক ধরনের নিষ্ফল আক্রোশের জ্বালা মনে মনে অনুভব ক'রেছিল মুরলী, তেমনি আর এক রকমের তৃপ্তিও বোধ করেছিল। যাক, কেলেঙ্কারীটা এবার অল্পেই মিটেছে, ঘোরাঘুরি ছুটোছুটির প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এবার থেকে শান্ত, নিভৃত, নিরবচ্ছিন্ন সংসারী জীবন। অন্য পাঁচজনের মত মুরলীও ব্যবসাবানিজ্য করবে, বুড়ো বাপের সাহায্য করবে, অনুগতা স্ত্রীর ঘর-গৃহস্থালীতে সহযোগিতা করবে, ছোট মেয়ে ললিতাকে লেখাপড়া শিখিয়ে আদব কায়দায় চাল-

চলনে কলকাতার শিক্ষিত উঁচুজাতের ভদ্রসমাজের মেয়ের মত করে গড়ে তুলবে, মেয়েমানুষ নিয়ে আর কোন রকম ছেলেমানুষি করবেনা মুরলী।

কিন্তু মনোরমার মুখে মঙ্গলা আর অজিতের পরস্পরের প্রশংসা আর গুণগ্রাহিতার কথা শুনে অদ্ভুত এক ঈর্ষার কাঁটা মুরলীর মনে এসে বিধল। সমস্ত সাধু সংকল্প সেই কাঁটায় গাঁথা হয়ে গেল। অবশ্য এই কাঁটার খোঁচার মধ্যে যদি কেবল যন্ত্রনাই থাকত তাহ'লে কোন-না-কোন উপায়ে তার উপশমেরও চেষ্টা চলত, কিন্তু এই তীব্র জ্বালার মধ্যে এক ধরনের আনন্দও আছে। কাঁটার দলের মধ্যে আছে ফুল, আছে ফুলের মত একখানি মুখ। বারংবার ইচ্ছা করতে লাগল মুরলীর কোন না-কোন ছলে একবার গিয়ে দেখে আসে সেই মুখ, মুখোমুখি ব'সে দু'একটি কথা ব'লে আসে। কিন্তু দীর্ঘদিনের কারবারে নারীচরিত্র সম্বন্ধে মুরলার যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছে তাতে নিজের ইচ্ছার ওপর খুব বেশি নির্ভর করবার সাহস আর মুরলীর নেই। অতি গরজে সব পণ্ড করে লাভ নেই কিছু।

দিনকয়েক কাটল। মঙ্গলার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার নূতন নূতন কৌশল আসতে লাগল মুরলীর মাথায়। মাত্র কয়েক মিনিটের পথ, কয়েকখানা বাড়ির পরেই বাড়ি, কিন্তু মুরলীর ভাবভঙ্গীতে মনে হ'ল দূরত্বের যেন আর সীমা নেই, এই পথটুকু পার হ'তে যেন অসংখ্য রকমের যানবাহন আর অনন্য-সাধারণ সাহসের প্রয়োজন। মন দিয়ে যাকে একান্তভাবে কামনা করছে মুরলী তার সঙ্গে বাইরের ব্যবধানকে দুর্লঙ্ঘ্য, দুরতিক্রম্য কল্পনা ক'রে আর সেই সাতসমুদ্র তেরনদীর পার হবার নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করেও মুরলীর কম আনন্দ হচ্ছে না।

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরে মঙ্গলা একটু ঘুমোবার আয়োজন করছিল। সাধারণত দিনে সে ঘুমোয় না। পাট দিয়ে পাড়ের সুতো

দিয়ে কোন দিন শিকে বোনে, কোন দিন বা খেজুরের পাতার মাদুর আর আসন, নিতান্তই যেদিন মন টেঁকেনা ঘরে সেদিন দরজায় তালা দিয়ে আলতাদের বাড়ি যায় কড়ি খেলতে। কিন্তু খেলাতেও বিশেষ মন বসে না মঙ্গলার। কোনদিন দু'এক হাত খেলে, কোনদিন বা কেবল ব'সে ব'সে অন্য সকলের খেলা দেখে। বউ-ঝিদের ছেলে কাঁদে, কোলের মেয়ে বুকের দুধ চাটে, কোন কোনটি বা পিঠের ওপর ঝুঁকে গলা জড়িয়ে ধরে, তবু তাদের মা-জেঠিদের নেশা চটে না। দানের পর দান দেয়, এক দুই ক'রে ঘরের পর ঘর গুণতে থাকে। খানিকক্ষণ ব'সে থেকে হঠাৎ ফাঁকে উঠে আসে মঙ্গলা। ঘরে আজও মঙ্গলার মন ঠিক ছিল না। ইচ্ছা করছিল না কোন বোনার কাজ নিয়ে বসে। কিন্তু শরীরেও তেমন জুৎ পাচ্ছিল না যে উঠে গিয়ে কারো বাড়িতে ব'সে কড়ি খেলে কি গল্পগুজব করে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই পাতলা একখানা কাঁথা মুড়ি দিয়ে মঙ্গলা শুয়ে পড়েছিল। অবশ্য বেশিক্ষণ যে সে এভাবে থাকতে পারবেনা শুতে না শুতেই মঙ্গলা তা টের পেয়েছিল। আর খানিকক্ষণ বাদেই তার পিঠ ব্যথা করতে শুরু করবে, নিঃশ্বাস আসতে চাইবে বন্ধ হয়ে, তখন তাকে উঠে বসতেই হবে।

কিন্তু শুয়ে কাঁথাটা মুখ পর্যন্ত টেনে দিয়ে কেবল একটু চোখ বুজেছে মঙ্গলা, দোরের বাইরে থেকে মিষ্টিগলা ভেসে এল, 'জেঠিমা, ঘুমিয়েছ নাকি, ও জেঠিমা?'

মঙ্গলা মাথা তুলে দোরের একটা পাল্লা একটু ফাঁক করে বলল, 'কে?' ললিতা ততক্ষণে সেই ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বিনা ডাকেই মঙ্গলার বিছানার একপাশে ললিতা বসে পড়ল, তারপর তার কপালে ছোট হাতখানি চেপে ধ'রে খানিকটা কৌতূহল খানিকটা উদ্বেগ মেশানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি অসুখ করেছে তোমার জেঠিমা? জ্বর?'

নিজের হাতখানা তুলে সেই কচি হাতখানা চেপে ধরল মঙ্গলা, ভারি মিঠে লাগল ললিতার গলা, ভারি নরম, ভারি মধুর মনে হল ললিতার সেই হাতখানির স্পর্শ। না, জ্বর মঙ্গলার হয়নি, কিন্তু হ'লেই যেন আজ ভাল হ'ত।

মঙ্গলার মনে পড়ল সেদিন সন্ধ্যাবেলা নদীর ঘাটে মায়ের শিখিয়ে দেওয়া কি কর্কশ কথাগুলিই না বলেছিল। রাগে দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছিল মঙ্গলা, ইচ্ছা হয়েছিল ছুটে গিয়ে দু'হাতে চেপে ধরে ওর গলা। আর আজ সেই গলা চিনির মত মিষ্টি, মধুর চেয়েও মধুর। সেই সব শেখানো কথা আজ হয়তো ওর আর এক বর্ণও মনে নেই, বেমালুম সব ভুলে বসে আছে। মঙ্গলা মনে মনে ভাবল, ভাবি অদ্ভুত এই সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মন, ভারি চমৎকার তাদের মুখের কথা। এমন যদি একটি মেয়ে থাকত মঙ্গলার সে কিছুতেই তাকে কড়া কথা, খারাপ কথা শেখাতনা, শত্রুকে বলবার জন্যও নয়। বেছে বেছে ভালো ভালো কথা, ভালো ভালো শ্লোক মুখস্থ করাত, শুনে লোকের কান জুড়িয়ে যেত। আর মেয়ে না হয়ে যদি এমন একটি ছেলে থাকত মঙ্গলার সে তাকে অজিতের মত সহরে পাঠাত ডাক্তারি পড়তে, সুবলের মত কিছুতেই লঙ্কা হলুদের ঝাঁকা মাথায় বয়ে গঞ্জে গঞ্জে হাটে হাটে বিক্রি করতে দিতনা।

হঠাৎ নিজের ভাবনার কথা টের পেয়ে মঙ্গলা মনে মনে লজ্জিত হয়ে উঠল। ছি ছি ছি, এসব কি সে ভাবছে! ছেলেমেয়ে না ঢেঁকি! ঘর নোংরা করত, দোর নোংরা করত, ঝেড়ে পুছে গুছিয়ে তুলতে মঙ্গলার জান যেত শেষ হয়ে। দুচক্ষে তাদের আবার দেখতে পারত নাকি মঙ্গলা? দেখে ত পাড়ার পাঁচজন বউঝিকে। একপাল ছেলেপুলে নিয়ে কি সুখে এক একজন আছে!

তবু ললিতার হাতখানা মঙ্গলার হাতের মধ্যে ধরাই রইল। মুঠির

ভিতরে নিয়ে হাতখানিতে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে মঙ্গলা বলল, 'হঠাৎ এসময়ে কেন এলিরে ললিতা ? এই দুপুর বেলায় এক গা গহনা নিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস ! ভয় করেনা, বাপ-মা বকবেনা তোকে ?' ললিতা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, 'হু, বকবে না হাতী ! বাবাই তো চুপি চুপি আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলে ।'

কথা শুনে মঙ্গলার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। একবার ললিতার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মঙ্গলা। পাড়া গাঁয়ের মেয়ের দশবছর বয়স কম নয়। এই বয়সে মঙ্গলার বিয়ে হয়েছিল, অনেক কিছু বুঝতে হয়েছিল। কিন্তু ললিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা আশ্বস্ত হোল, ওর মুখে কোন ছলনা নেই, কোন কুটিল ধূর্ততা নেই, খোলা মনে সাদা সিধেভাবেই কথাটা বলে ফেলেছে ললিতা। তবু মুরলীর কথা ভেবে মঙ্গলার মন ছি ছি করে উঠল। কোন রকম কাণ্ডজ্ঞান চক্ষুলজ্জা যদি থাকে লোকটার। শেষ পর্যন্ত কিনা নিজের মেয়েকে পাঠিয়েছে তার খোঁজ নিতে !

মঙ্গলা বলল, 'কিন্তু তোর বাবার এত ভয় কিসের রে ললিতা যে চুপি চুপি তোকে আমার কাছে সে পাঠিয়ে দেয় ?'

ললিতা বলল, 'বাঃ রে ভয়ের জন্য বুঝি ! তুমি কিচ্ছু বোঝনা জেঠিমা, ভয় নয়, মজার জন্য ।'

মঙ্গলা বিস্ময়ের ভাণ করে বলল, 'মজার জন্য ! এতে মজার আবার কি হোল তা তুইই জানিস আর তোর সেই মজাদার বাবা জানে। যাকগে, এই দুপুর রোদে টো টো করে ঘুরে বেড়াবি, না শুয়ে থাকবি আমার কাছে ?'

ললিতা হেসে উঠল, 'তুমি একেবারে ঠিক আমার মার মত কথা বল জেঠিমা। তুমি কি আমার মা আর আমি কি বিশুর বোন টগরির মত

কচি খুকি যে তোমার কাছে আমি চুপটি করে শুয়ে থাকব? কত রাজ্যের কাজ পড়ে আছে আমার।'

ললিতার কথা বলার ভঙ্গি দেখে হাসি পেল মঙ্গলার। বলল, 'তাই নাকি? তাহলে যাও কাজকর্মের তোমার আমি ক্ষতি করতে চাইনে। এতক্ষণে তোমার এক পাল ছেলেমেয়ে বোধহয় মা-মা বলে কান্না সুরু করে দিয়েছে। গোটাদুয়েক মোয়া দিচ্ছি নিয়ে যাও। হাতে দিয়ে তাদের শান্ত কোরো'—বলে মঙ্গলা সত্যিই বিছানা থেকে উঠে কালোরঙের ছোট একটি মেটে হাঁড়ির ভিতর থেকে সগুবাঁধা দুটি মুড়ির মোয়া বের ক'রে ললিতার হাতে দিল। লোভে আর উল্লাসে ললিতার চোখ দুটি যে চক চক ক'রে উঠল তা মঙ্গলার চোখ এড়াল না।

মঙ্গলা বলল 'এখানে বসেই খেয়ে নে ললিতা'।

ললিতা বলল, 'তা খেতে পারি। কিন্তু তুমি আবার কিছু ভাববে না তো জেঠিমা। আমার হয়েছে মহা মুশকিল। এখানে বসে খেলে তুমি ভাববে হ্যাংলা, আবার বাড়িতে নিয়ে গেলে যাও তাই মনে করবে।'

মঙ্গলা মৃদু হেসে বলল, 'কথা শোন মেয়ের। এই বয়সেই একেবারে বুড়ির একশেষ হয়ে উঠেছিস তুই।'

শক্ত মুড়ির মোয়া ছোট ছোট দাঁতে ভেঙে ভেঙে খেতে লাগল ললিতা। আর মঙ্গলা এক লক্ষ্যে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। যেন দশ বছর বয়সের হৃষ্টপুষ্ট বাড়ন্ত গড়নের মেয়ে নয় ললিতা। বয়স কমতে কমতে মঙ্গলার চোখে সে যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে। যখন ওর বয়স আরো কম ছিল, যখন বছরও পোরেনি ওর বয়স তখন কেমন দেখতে ছিল ললিতা, একটু ছুঁলে একটু আদর করলে তখনো কি ও এতখানি খুশি হয়ে উঠত, আহ্লাদে এমনি চক্ চক্ করত ওর চোখ?

মোয়া খাওয়া শেষ করে রান্নাঘরে গিয়ে গ্লাসে করে নিজেই জল গড়িয়ে খেল ললিতা, মঙ্গলার গামছায় মুখ মুছে বলল, 'যাই জেঠিমা। মোয়া খাওয়ার কথা কাউকে যেন আবার বলো না। কে কি ভাববে তার ঠিক কি।'

মঙ্গলা বলল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা বুড়োঠাকরুণ, আর তোমাকে বুড়োটেপণা করতে হবে না। এবার এসো।'

ললিতার চ'লে যাওয়ার পর মঙ্গলার মনে হোল ছেলেপুলে সম্বন্ধে হঠাৎ সে যেন ভারি আদেখলেপণা করে ফেলেছে। ভাগ্যিস ললিতা ছাড়া আর কেউ এখানে ছিল না। তা হ'লে সন্তান-হীনা মঙ্গলার এমন কাঙালপনা দেখে নিশ্চয়ই মনে মনে সে হাসত। ললিতার মত ছেলেপুলে সম্বন্ধে পাছে মঙ্গলাকেও কেউ হ্যাংলা মনে করে সেজন্য সতর্কতার অন্ত নেই তার। নিজের কোলেই যখন কিছু এল না তখন পরের ছেলেপুলে নিয়ে টানাটানি করতে বড় একটা যায় না মঙ্গলা। বরং এমন একটা ভাব দেখিয়ে বেড়ায় যেন ছেলেপুলে সম্বন্ধে তার মোটেই কোন আসক্তি নেই, ছেলেমেয়ে না হওয়ার জন্য একটুও দুঃখ নেই মনে। কিন্তু ভাবটাকে একনাগাদ খুব বেশি দিন বজায় রাখতে রাখতে হঠাৎ এক এক মুহূর্তে ধরা পড়ে যায় মঙ্গলা, অন্যের চোখ হয়তো এড়িয়ে আসে, মা জেঠিদের চোখের আড়ালে তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে আচমকা হঠাৎ এক ফাঁকে আদর ক'রে নেয়, কিন্তু চোখ ঠেরে নিজের মনকে থামাতে পারেনা, অত অল্পে অত তাড়াতাড়ি নিজের শূন্য হৃদয়কে ভরতে পারে না, বুকটা অনেকক্ষণ ধরে কেবলি খালি খালি লাগতে থাকে।

১১

ফাল্গুন মাস পড়তে না পড়তেই পাড়ায় এবার বসন্ত শুরু হ'ল। আম গাছগুলিতে নতুন বোল এল, গাব গাছের ডালে ডালে তামাটে কচি পাতার উদ্‌গম হোল, ফুল ধরল মুরলীর চারা গাছগুলিতে আর সঙ্গে সঙ্গে খবর পাওয়া গেল বিষ্টু সার নাতি নিমাই সার মা'র অনুগ্রহ হয়েছে।

প্রথমটায় এ খবরে কেউ যে তেমন বিচলিত হোল তা নয়। জল বসন্ত এ অঞ্চলে প্রত্যেক বছরেই দু'একজনের হয়ে থাকে। তার জন্য ডাক্তার কবিরাজ লাগে না, ওষুধপথ্যেরও বিশেষ দরকার হয় না। নমঃশূদ্র পাড়ার নন্দর মা খবর পেয়ে নিজেই আসে, মন্ত্র পড়ে, জল পড়া দেয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে বলে, পথ্যাপথ্যের বিধান করে আর তার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মা শীতলার কাছে রোগীর ইচ্ছামত ও সাধ্যমত মানত করবার অনুরোধ জানায়। কিছুদিন পরই রোগ নিরাময় হয়। সুতরাং এজন্য কাউকেই বড় একটা বিচলিত হতে দেখা যায় না। রোগী বাড়ীতে মশারির মধ্যে শুয়ে কখনো বা ছট্‌ফট্ করে, কখনো ঘুমায়, বাড়ীর পুরুষেরা দৈনন্দিন হাটে বাজারে যায়, অবসর সময় তাস খেলতে বসে। মেয়েরা রাঁধাবাড়া এবং ঘরের আরো পাঁচটা কাজকর্ম সেরে অন্য সরিকের বউঝিদের সঙ্গে গল্প করে, ঝগড়া করে, ঘরের রোগ যে কারো মনকে খুব অশান্ত এবং উদ্বিগ্ন ক'রে তোলে তা সহসা মনে হয় না।

কিন্তু নিমাইর গায়ে দু' একটা বসন্তের গোটা উঠতে না উঠতেই তার মা ননীবালা সেই যে ছেলের মাথার শিয়রে গিয়ে বসেছে আর তাকে সহজে ওঠানো যায়নি। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে তবে

দুবেলা দুটি তাকে খাওয়ানো যায়। কোন দিন দুএক গ্রাস মুখে দেয় কোনদিন বা দেয়ওনা, বসবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে।

ছেলের বউয়ের কাণ্ড দেখে গন্ধেশ্বরী দিনরাত তাকে ধমকাচ্ছে তো ধমকাচ্ছেই।

'মায়ের অনুগ্রহ এই কি প্রথম দেখলাম বাছা? কিন্তু তোমার মত এমন আদিখ্যেতা আমার বাপের বয়সেও দেখিনি। দিনরাত কু ভাবনা ভেবে ওর অমঙ্গল ডেকে না এনে তুমি ছাড়বে না। আর না খেয়ে না দেয়ে কেবল ছেলের কাছে বসে থাকলেই বুঝি রোগ সারে, না তার চেষ্টা যত্ন আছে, ওষুধপথ্য আছে। এই বুড়ো বয়সে দুবেলা দু'সাত জনের পিণ্ডির ব্যবস্থা করব, রোগীর পথ্য করব, সব এক জায়গায় এনে দেব আর ছেলের সামনে গিয়ে তুমি চুপচাপ বসে বসে ভাববে, মজা মন্দ নয়।'

অন্যদিন হোলে ননীবালা শাশুড়ীকে এত কথা বলবার সময় দিত না, রুখে উঠত মুখের উপর, এক কথায় তিন কথা শুনিয়ে দিত; কিন্তু আজ যেন ননীবালার মুখ দিয়ে কথা যোটে বেরুতে চায় না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর ননীবালা আস্তে আস্তে বলল, 'কটা দিন যাক, তারপর তো সব আবার করতেই হবে।'

গন্ধেশ্বরী তবু গজ গজ করতে করতে বলল 'হ্যাঁ, এতদিন করে সব উল্টিয়ে দিয়েছ, এরপর কটা দিন বাদে কি করবে না করবে তা আমার জানাই আছে।'

কথাটা ননীবালার কানে গেল কি গেল না। নন্দর মা নিমাইকে প্রথমটায় দেখেই যে-রকম মুখের ভাব করেছিল সেই দৃশ্যটা তার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগল।

শাশুড়ী বাড়িতে ছিলনা। ননীবালা নন্দর মার পিছনে পিছনে

গেল, অমন ক'রে আঁৎকে উঠলে কেন মাসী? নিমুর আমার খারাপ জাতের কিছু হয়নি তো। জল বসন্ত তো ঠিক?'

নন্দর মা আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা ঠিক যেন তেমন ক'রে ফুটে উঠল না।

নন্দর মা বলল, 'কি যে বল বউমা! খারাপ জাতের কেন হ'তে যাবে। তবে ঠিক জল বসন্তও নয়। জাতটা একটু আলাদা ধরনের। সাবধানে রাখবে, ভয় কি! মা শেতলা আছেন আমার বাড়ীতে, জাগ্রত দেবতা। তাঁকে ডাকো, তিনিই রক্ষা করবেন। ভয় কি!'

সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে সুবল হলুদ আর শুকনো লঙ্কার ঝাঁকা নিয়ে পাশের গাঁ চরকান্দার হাটে বেরিয়ে গেলে মঙ্গলাও তাড়াতাড়ি নেয়েখেয়ে নিল। তারপর আলতাদের বাড়ী গিয়ে বলল, 'চল্ ঠাকুরঝি, ও বাড়ির নিমুকে একবারটি দেখে আসি।'

আলতা বলল, 'বল কি বউদি, এই দুপুরের সময়!'

মঙ্গলা বলল, 'এবাড়ি থেকে ও বাড়ি, তার আবার সময় আর অসময়! আচ্ছা চল তুই, না হয় আমাকে পৌঁছে দিয়েই চ'লে আসবি।'

আলতা খানিকক্ষণ ইতস্তত ক'রে মঙ্গলার সঙ্গে চল্‌ল। তাব দ্বিধা দেখে মনে মনে হাসল মঙ্গলা। এসব রোগব্যাধিকে আলতা ভারি ভয় করে। সহজে কাছে ঘেঁষতে চায় না। কিন্তু প্রাণেব ওপর এত মায়া কেন আলতার। স্বামী নেই, সংসার নেই, ছেলেপুলে নেই, পরেব মন জুগিয়ে, পরেব সংসারের কাজকর্ম ক'রে মা আব মেয়ের দু বেলার অন্ন জোটাতে হয়, তবুতো বাঁচবার সাধের অন্ত নেই আলতার। আর তার তুলনায় মঙ্গলা বলতে গেলে ঢের সুখে আছে, কিন্তু তাই বলে অত ভয়ে ভয়ে বাঁচতে মঙ্গলার প্রবৃত্তি হয় না। মরণ যদি আসে আসবে। তার জন্য মঙ্গলা অমন সব সময় পাহারাদারী করবে না।

মুকুন্দ আর ননীবালা যে ছোট টিনের ঘরখানায় থাকে সেই ঘরের মেঝেতেই রুগ্ন ছেলের বিছানা করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ির অন্য ঘরখানা বড়। জানালাদরজাও এর চেয়ে বেশী। কিন্তু সেখানায় বিষ্টু সা বড় ছেলের ঘরের নাতিনাতনী নিয়ে থাকে। তা ছাড়া হাঁড়িকুড়ি বাক্স-সিন্দুকে সে ঘরে আর পা ফেলবার জায়গা নেই। এই ছোঁয়াচে রোগীকে সে-ঘরে কি করে রাখা যায়।

ননীবালা ছেলের মাথার কাছে নিশ্চল হয়ে বসেছিল, মঙ্গলা আর আলতাকে দেখে বলল 'এসো দিদি।' তারপর উঠে গিয়ে ছোট ছোট দুখানা পিঁড়ি পেতে দিল বসতে।

আলতা একবার ভাবল দোর থেকেই ফিরে যায়, কিন্তু মঙ্গলা যখন ঘরে ঢুকে পিঁড়িতে গিয়ে বসল তখন তার পক্ষে এভাবে ফিরে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। তাই পাশের পিঁড়িতে সেও এসে বসল।

মঙ্গলা বলল, 'কেমন আছে এখন? মশারিটা তোল দেখি, কি রকম উঠেছে দেখি একবার। ননীবালা নিঃশব্দে মশারির একটা দিকে তুলে ধরল।

ছোট ছোট ক্ষতে নিমাইর সর্বাঙ্গ একবারে ছেয়ে গেছে, নিমাই এতক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ছিল, এবার জেগে উঠে যন্ত্রণায় ছটফট করতে সুরু করেছে। আলতা আতঙ্কে চোখ বুজল। একটু পরে বলল, 'আমি যাই বউদি।'

মঙ্গলা ঘাড় নেড়ে বল্‌ল 'আচ্ছা।'

তারপর ননীবালার শংকিত মুখের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা বলল, 'খুব উঠেছে দেখতে পাচ্ছি। তা এক হিসাবে উঠে যাওয়াই ভালো। অত ভাববার কি আছে।' 'তুমি আমাকে মিথ্যে ভরসা দিচ্ছ দিদি। জাতটা ভাল নয়।'

মঙ্গলা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ননীবালাকে চুপ করতে বলল। আট ন বছরের ছেলে নিমাই, ভালমন্দ সবই সে বুঝে। এসব কথা কানে গেলে মনটা তার কেমন করতে থাকবে।

মঙ্গলা ধমকের সুরে বলল, 'কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে। যাও এবার উঠে গিয়ে নেয়ে খেয়ে এসো। আমি বসি এখানে।'

মঙ্গলা ননীবালার হাত থেকে পাখা তুলে নিল। ননীবালা মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখল, তারপর বলল, 'তুমি বেশ আছ দিদি, ছেলেপুলে মানুষের না হওয়াই ভালো।'

মঙ্গলা একটু হাসল, 'সে কথা ঠিক। কিন্তু ছেলেপুলের যখন অসুখবিসুখ হয় কেবল তখনই এসব কথা মানুষের মনে আসে। কিন্তু ছেলে যখন সুস্থ হয়ে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে আদর করবে তখন কথাটা একবার বলো দেখি শুনব। নাও এবার ওঠ।'

মঙ্গলা আর একবার তাড়া দিল ননীবালাকে।

গন্ধেশ্বরী এতক্ষণ কি কাজে ব্যস্ত ছিল। মঙ্গলার সাড়া পেয়ে এঘরে উপস্থিত হয়ে বলল, 'এই যে মা এসেছ। আচ্ছা, তোমরাই বল অসুখ-বিসুখ সকলের ঘরেই হয়, কিন্তু এমন আদিখ্যেতা দেখেছ কোথাও? শাশুড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই ননীবালা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলা গন্ধেশ্বরীর কথার জবাবে বলল, 'তা কি আর করবেন খুড়িমা, সকলের মনের জোর তো সমান নয় আর আপনার মেজবউ একটু বেশি ঘাবড়ে যাওয়া প্রকৃতির মানুষ। বেচারা ওকে দোষ দেওয়া যায়না, ঐতো একটি মাত্র সলতে সম্বল। নিমুর পরে বুঝি তিনটি হয়েছিল? না খুড়িমা? ভাগ্যটা দেখুন একবার। তিনটিই—। ঘাবড়াবার যে কথাই খুড়িমা।'

ননীবালার ওপর মঙ্গলার এই ধরনের সহানুভূতিতে গন্ধেশ্বরী একটু লজ্জিত না হয়ে পারল না। মঙ্গলার মত একজন বাঁজা মেয়েমানুষ মৃতবৎসার দুঃখ, ছেলের অসুখে মায়ের গভীর উদ্বেগের

কথা এমন ভাবে বুঝল কি করে ! বিশেষ করে যে মঙ্গলা নিতান্ত কাঠখোট্টা স্বভাবের মানুষ, ছেলেপুলে যে দুচক্ষে কোন দিন দেখতে পারে না, তার মুখে এসব কথা কেবল নতুন আর অদ্ভুতই নয়, মধুরও শোনাল গন্ধেশ্বরীর কাছে। অপ্রতিভের মত গন্ধেশ্বরী বলল, 'সে তো ঠিকই মা, সেকথা যখন ভাবি।'

মঙ্গলা সযত্নে নিমাইএর বিছানা ঝাড়ল, টুকটাক জিনিষপত্রগুলি এলোমেলো হয়েছিল, গুছিয়ে রাখল এদিকে, ধুনোচিতে ধূপ ছিটিয়ে দিল একটু, নিমাই জল চাওয়ায় ঝিনুকে করে অল্প একটু ডাবের জল খাইয়ে দিয়ে ফের পাখা নিয়ে শিয়রে এসে বসল।

আর একবার ঘুরে এসে গন্ধেশ্বরী ঘরের অবস্থার দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে বলল, 'এখন বোঝা যায় যে ঘরে মা লক্ষীর পা পড়েছে।' কিন্তু বেলা যে অনেক হোল, তোমার কি নাওয়া-খাওয়া নেই মা'? মঙ্গলা বলল, 'কিছু ভাববেন না খুড়িমা, আমি সব সেরে এসেছি।'

নিমাইর কাছে সারা দুপুর আর বিকালটা কাটিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে মঙ্গলা বাড়ি ফিরল। গন্ধেশ্বরী নিজেই এগিয়ে দিয়ে এল; ফেরবার সময় বলল, 'তুমি কালও একবার এসো মা, তোমাকে দেখলে ভারি ভরসা পাই। কেমন দেখলে আমার নিমুকে? মনে ভারি চিন্তা ঢুকেছে মা। কি আছে ভাগ্যে কে জানে।'

মঙ্গলা শুকনো মুখে বলল, 'ভাববেন না।'

সন্ধ্যার পর আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর হাট সেরে সুবল ফিরল ঘরে। থলিতে করে মাছ আর তরকারি নিয়ে এসেছে।

সুবল থলেটা স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে ধর, চিংড়ী মাছ আর কুমড়ো। সেদিনের মত অত ঝোল রেখে নয়, বেশ একটু শুকনো শুকনো করে রাঁধবি আজ বুঝলি।' কিন্তু স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে

সুবল রান্নার নির্দেশ দেওয়া বন্ধ করে বলল, 'ব্যাপার কি! আজ আবার হঠাৎ অমন মুখ গোমরা ক'রে রয়েছিস যে!'

মঙ্গলা স্বামীর হাত থেকে থলেটা নিতে নিতে জবাব দিল 'সব সময়েই মুখখানাকে মানুষ হাসিখুসি ভরা রাখতে পারে নাকি?'

সুবল বলল, 'মেয়ে মানুষের তাই রাখতে হয়। সব সময় না হোক, সোয়ামী যখন হাটবাজার থেকে হয়রান হয়ে ফেরে তখন অন্তত: হাঁড়িপানা একখানা মুখ নিয়ে সামনে এসে হাজির হতে নেই।'

মঙ্গলা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখল, তারপর অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'বেশ তো, হাঁড়িপানা মুখ আর না ভালো লাগে, ছুঁড়িপানা মুখ একখানা দেখেশুনে এবার নিয়ে এসো। সে তো আমি অনেক কাল থেকেই বলছি।'

ব'লে মুখ ঘুরিয়ে মঙ্গলা মাছ-তরকারীর থলেটা নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

বারাণ্ডায় বালতিতে করে জল তোলা রয়েছে। কাছেই ফিতেওয়ালা খড়ম জোড়া, ছোট একটা ঘটির ওপর ভিজে গামছাখানা ভাঁজ ক'রে রেখে দিয়েছে মঙ্গলা। সবদিন এসব চোখে পড়ে না সুবলের। যেদিন পড়ে সেদিন হঠাৎ যেন ভারি অদ্ভুত লাগে। অনেক কালের ভুলে যাওয়া প্রিয় কোন গানের সুর মনে পড়বার প্রসন্ন মাধুর্যে সমস্ত অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। মুহূর্তকাল আগে যতখানি ক্ষোভ সুবলের মনে এসে জমা হয়েছিল, মঙ্গলার চিরপরিরিচিত এইটুকু মাত্র সেবার পরিচয়ে তার অনেকখানিই যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সুবল মনে মনে ভাবল মঙ্গলার মুখের ভাব মাঝে মাঝে বদলায় বটে, কিন্তু হাত দুখানির সেই নিপুণ মধুর পরিচর্যাটুকু তেমনি আছে।

হাতমুখ ধুয়ে তামাক সাজতে বসল সুবল। মালসায় আগুন গন্

গন্ করছে। কাছেই হুঁকো কল্কে আগুন তুলবার চিমটে, ছোট একটু বাঁশের চোঙায় সুবলের নিজে হাতে মাখা তামাক গুলি করে রাখা। কল্কিতে আগুন দিয়ে হুঁকোর ওপর তুলে গোটা কয়েক টান দিয়ে সুবল তামাকটা একটু ধরিয়ে নিল, তারপর হুঁকোটা হাতে নিয়েই দাঁড়াল গিয়ে মঙ্গলার রান্নাঘরের দোরের সামনে। হুঁকোতে আরো কয়েকটা টান দিয়ে সুবল মঙ্গলাকে উদ্দেশ করে বলল, 'বলি ব্যাপারখানা কি? একটু শোনা যায় না? এর মধ্যে গূহ্য কথা-টথা কিছু আছে?'

মঙ্গলা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গূহ্য কথা আবার কি। ওবাড়ির মুকুন্দ ঠাকুরপোর ছেলের মায়ের অনুগ্রহের কথা শুনেছ তো?'

সুবল বলল, 'হ্যাঁ, শুনলুম খুব নাকি উঠেছে। তাই কি?'

মঙ্গলা তরকারি কোটা রেখে স্বামীর দিকে চেয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অথচ চাপা ফিসফিসানির সুরে বলল, 'খুব মানে দারুন। দেখো, আমার কিন্তু মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। নিমাইকে দেখে আসা অবধি এত খারাপ লাগছে।

সুবল বলল 'ওবাড়ি গিয়েছিলে বুঝি দেখতে?'

মঙ্গলা বলল, 'হ্যাঁ, এতক্ষণ তো সেখানেই ছিলাম। উঃ! সমস্ত দুপুরটা ভরে ছেলেটা কেমন ছটফট করেছে আর যন্ত্রণায় চেঁচিয়েছে। আহা, ওইটুকু তো ছেলে। তুমি যদি দেখতে—'

সুবল একলক্ষ্যে স্ত্রীর মুখের দিকেই চেয়ে দেখছিল। এ যেন আর কারো মুখ। এ মুখে মঙ্গলার সেই স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ নেই, আছে কেবল পরের ছেলের জন্য অতিরিক্ত কাতরতা। উদ্বেগে ব্যাকুল সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেন যেন সুবলের ভারি দুঃসহ লাগল। রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'তাকে দেখবার আর দরকার কি, তোমার দশা দেখেই বুঝতে পারছি।'

হুঁকোয় আবার মুখ দিল সুবল। তারপর খড়মের শব্দ করতে করতে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল।

মঙ্গলা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে স্বামীর যাওয়ার দিকে চেয়ে রইল। তারপর কি মনে হওয়ায় নিজের মনেই একটু হাসল। কি অদ্ভুত স্বভাব সুবলের আর কি অদ্ভুত তার মন! নিজের ছেলেপুলে হোল না বলে অন্যের ছেলেকে আদর করাই যে সে সহ্য করতে পারে না তাই নয়, অসুখবিসুখে মঙ্গলা যদি গিয়ে কারো ছেলেমেয়ের একটু সেবা-যত্ন করে তাতেও সুবলের বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে। যেন সুবলকে ফাঁকি দিয়ে সুবলের কাছে গোপন রেখে একা একা সে কোন নিষিদ্ধ জিনিস উপভোগ করছে, সুবলকে তার ভাগ দিচ্ছে না।

পাড়ার কোন ছেলেপুলে সম্বন্ধে সুবলের মন যে স্নেহপ্রবণ নয় তা মঙ্গলা জানে। তারা কেউ এলে একটু হৈচৈ করলে সুবলের বিরক্তির অবধি থাকে না, এমন কি তাদের মা-বাপের কাছে পর্যন্ত অশোভনভাবে মনের সেই বিরক্তি প্রকাশ ক'রে ফেলে। ছেলেপুলে নেই বলেই যে অন্যের ছেলেমেয়ে নিয়ে অতিরিক্ত রকমের আদর আহ্লাদ করা, তাদের কোলেপিঠে নিয়ে ডলে, কচলিয়ে চুমু খেয়ে সোহাগ জানানো, ঘরের নাড়ুমোয়া তাদের হাতে দেওয়া, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে তাদের খেলনা কিনে দেওয়া এ সব আদেখলেপনা মঙ্গলারও নেই। কিন্তু তাই বলে কারো অসুখবিসুখ হলেও যে চোখ উলটিয়ে থাকতে হবে এমনই বা কোন্ কথা আছে! আহা! ওই ত কচি বয়স। ওই বয়সে রোগের যন্ত্রণা কি ওরা সহ্য করতে পারে। যে-সব ছেলেমেয়ে খুব চঞ্চল আর দুরন্ত, অসুখ বিসুখ হলে তারাই যেন এলিয়ে পড়ে সব চেয়ে বেশী। মঙ্গলা এ রকম অনেক দেখেছে, এমন নরম আর অসহায় হয়ে পড়ে যে মায়া হয় দেখলে। ইচ্ছা হয় সেই রুগ্ন দুর্বল শিশুকে নিজের বুকের মধ্যে

টেনে নিয়ে আগলে রাখে। তা কি করবে মঙ্গলা। সকলের মন তো আর সুবলের মত নিষ্ঠুর নয়। মায়াদয়া, স্নেহমমতা, সকলেই তো আর মন থেকে ধুয়েমুছে ফেলতে পারে না।

সুবল খেয়ে গেলে নিজের খাওয়া সেরে রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে ঘরে এল মঙ্গলা। পিতলের ছোট পানের বাটা টেনে নিয়ে ভালো ক'রে একটি পান সাজল; তারপর সেই পানটিকে মুখে ফেলে দীপ নিভিয়ে আলগোছে স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। ভাবল সুবলই প্রথম কোন একটা কথা বলবে, কি হাতখানা তুলে দেবে গায়ের উপর যেমন অন্যান্য দিন করে। কিন্তু সুবলের দিক থেকে তেমন কোন সাড়াশব্দ এলনা, অথচ মানুষটি যে দিব্যি জেগে আছে মঙ্গলা তা জানে। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর মঙ্গলা আর থাকতে পারল না, স্বামীর গায়ে অল্প একটু ঠেলা দিয়ে বলল, 'কথা বলছ না যে, কি ভাবছ?'

অন্ধকারের মধ্যে যেন অনেক দূর থেকে সুবল বলল, 'ভাবছি একটি পোষ্যপুত্র নিলে কেমন হয়। ছেলেপুলে যখন হোলই না, আর হবেই না।' মঙ্গলা বিস্মিত হয়ে বলল, 'পোষ্যপুত্র!'

সুবল বলল, 'হাঁ খুব অল্প বয়স, দেখতে শুনতে বেশ ভালো, এমন একটি ছেলে চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করে নিয়ে পোষ্য রাখাটা মন্দ কি। সুখের সময় সোহাগ করতে পারবে, অসুখের সময় শুশ্রূষা করতে পারবে, বেশ হবে। শত হোলেও মেয়েমানুষ তো। কোলের মধ্যে কিছু একটা না পেলে মনটা খাঁ খাঁ করতে থাকে, তাই নয়?

অন্ধকারের মধ্যে মঙ্গলার অল্প একটু হাসির শব্দ শোনা গেল, 'এতদিনে তা হোলে কথাটা বুঝতে পেরেছ। আর আমার আফশোষ কিসের। কিন্তু পোষ্য যে নেবে বিষয়সম্পত্তিটা আগে একটু ভালো

মত ক'রে নাও, জমিয়ে নাও লাখখানেক টাকা. না হোলে ছেলে এসে ওড়াবে কি ?'

মঙ্গলা আবার হেসে উঠল।

এই হাসির শব্দ সুবলের পরিচিত। মঙ্গলা ফের তার সেই প্রগলভতায় ফিরে এসেছে। এই হাসি দিয়ে মঙ্গলাকে মঙ্গলা বলে ফের চিনতে পারছে সুবল। অন্যের ছেলের বসন্ত হয়েছে বলে সেই উদ্বেগ অশান্তি এখন আর নেই, নেই সেই অতিবাৎসল্যের নরম ভিজে ভিজে কথা ; এ হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণতা আছে, উপহাসের খোঁচা আছে, তবু এ হাসি সুবলের স্ত্রী মঙ্গলার। এখন অনায়াসে সুবল তাকে নিজের রোমশ বুকের মধ্যে টেনে নিতে পারে, আদরে সোহাগে দুজনেই এমন অস্থির আর উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে যে পৃথিবীর অন্য কোন কথাই তাদের মনে উঠবে না, মুখে আসবে না। কিন্তু কেন জানি সুবলের আজ ওসব প্রবৃত্তিই হল না, ইচ্ছা হোল হাতটা একবার এগিয়ে মঙ্গলাকে অন্তত একটু স্পর্শ করে, কিন্তু হাতখানা যেন নড়তে চাইল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মঙ্গলা বলল, 'কি হোল, রাগ করলে নাকি ?'

সুবল বলল, 'না।'

মঙ্গলা আর একটু সরে এসে সুবলের গা ঘেঁষে বলল, 'তবে অমন করে রয়েছ যে ?' সুবল তেমনি নিস্পৃহ উদাস গলায় বলল, 'এমনিই।'

কথার ভঙ্গির মধ্যে কথার ধ্বনির মধ্যে অদ্ভুত এক দূরত্বের ভাব। মঙ্গলা বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ আজ কি হোল সুবলের। নিজেদের দারিদ্র্য নিয়ে ঠাট্টাতামাসা তো মঙ্গলা এমন অনেকদিনই করে। মঙ্গলা চটে যায়, রাগ করে, কিন্তু কোন দিনই এমন গম্ভীর হয়ে চুপ

ক'রে থাকেনা। তবে কি ছেলেপুলে নিয়ে যেসব কথা এতক্ষণ হোল সেই জন্যই মন খারাপ হয়েছে সুবলের? আহা বেচারা। যেন সুবল নিজেই একটি ছেলেমানুষ। মনে মনে অনর্থক কষ্ট পাচ্ছে। তাকে শান্ত করবার জন্য, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মৃদু হেসে মঙ্গলা তাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু সুবল আস্তে আস্তে তার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তেমনি নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'এখন থাক্ মঙ্গল, ঘুমো, একটু ঘুমোতে দে।'

মঙ্গলা আহত হয়ে বলল, 'তা হোলে তুমি সত্যই রাগ করেছ।'

সুবল বিরক্ত হয়ে বলল, 'না এখনো করিনি, কিন্তু অমন ন্যাকামি করলে সত্যই এরপর রাগ হবে।' মঙ্গলা পাশ ফিরে শুয়ে বলল, 'রাগ অন্য মানুষেরও হ'তে পারে। তারও রক্তমাংসের শরীর, কিন্তু দুপুর রাতে রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটির চেয়ে ঘুমোনো ভালো।'

আজ সমস্ত দুপুর আর বিকেলটা পরের বাড়িতে গিয়ে আদর আপ্যায়ন প্রশংসা সুখ্যাতি কম পায়নি মঙ্গলা। গন্ধেশ্বরীর মত জবরদস্ত ঝগড়াটে কোঁদুলে মেয়েমানুষও মঙ্গলাকে বহুবার মা লক্ষ্মী বলে আদর ক'রেছে। তার বলবার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। নিমাইর মাও কতবার বলেছে, 'দিদি, তোমার মত মানুষ হয় না। তোমার প্রশংসা পাড়ার সব বাড়ীতে।'

কিন্তু সেসব স্তুতি-প্রশংসা এই মুহূর্তে মঙ্গলার কাছে যেন একেবারেই নিরর্থক হয়ে গেছে। একরাত্রে স্বামীর এই একটুখানি অবজ্ঞায়, একটুখানি ঔদাসীন্যে মঙ্গলার মনে দুঃখ যেন উদ্বেল হয়ে উঠতে চাচ্ছে। একজন মানুষের সামান্য একটু ছোঁয়ায় একটু কথায় যে আনন্দ, হাজার হাজার লোকের প্রশংসা কুড়িয়েও কি তা মেলে? তাতে কি তেমন ক'রে মন ভরে, বুক জুড়োয়? মঙ্গলার মনে হতে লাগল এ যেন কেবল একটি রাত নয়, জীবন ভরে রাতের পর রাত

যেন সে এমনই বঞ্চিত রয়ে গেছে, কাঙালিনীর মত একজনের পিছনে পিছনে ফিরেছে, কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে কিছুই সে তাকে কোন দিন দেয়নি, কিছুই নয়।

১২

ভোর হ'তে না হ'তেই বিনোদের মা সৌদামিনী এসে উপস্থিত হোল. 'উঠেছ নাকি বউমা?'

মঙ্গলা উঠেছে অনেকক্ষণ, মুখ হাত ধুয়ে ঘর ঝাঁট দিয়েছে, উঠান ঝাঁট দিয়েছে, তারপর উঠানে গোবর জলের ছড়া দেওয়ার আয়োজন করছে। শরীরই খারাপ থাকুক আর মনই খারাপ থাকুক, নিতান্ত শয্যাগত না হয়ে পড়লে এসব দৈনন্দিন সাংসারিক কাজের একচুলও এদিক-ওদিক হয় না মঙ্গলার। অভ্যস্ত কাজগুলি শুরু না করতে পারলে অস্বস্তি যেন আরো বেশি লাগে।

মঙ্গলা সৌদামিনীর কথার জবাবে বলল, 'উঠব না কেন খুড়িমা, রাত কি এখন ভোর হয়েছে নাকি?'

সৌদামিনী বলল, 'না তা হবে কেন মা, বলে কোথাকার লোক এর মধ্যে কোথায় চ'লে গিয়েছে। আমার বিনোদও তো গোঁসাই-কান্দা এতক্ষণ ধর ধর হোল বলে কিন্তু তোমার তো বউমা কোন ঝক্কি ঝামেলা নেই। বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলেই বা কি।' মঙ্গলা গম্ভীর মুখে বলল, 'সে তো ঠিকই। কিন্তু রাত পোহাতে না পোহাতে এত সাত তাড়াতাড়ি বিনোদ ঠাকুরপোরই বা গোঁসাই-কান্দা যাওয়ার কি দরকার পড়ল। গাঁয়ে মা'র অনুগ্রহ শুরু হয়েছে বলে নাকি?' সৌদামিনী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এ তোমার কি রকম কথার ধারা বউমা? সকাল বেলায় তুমি কি আমার সাথে ঝগড়া করবার জন্য কোমর বেঁধে

লাগলে নাকি ? বিনোদ গেছে তার নিজের কাজে। গোঁসাইকান্দার রায় বাড়ির ছোটকর্তা খবর পাঠিয়েছেন, তাই গেছে। তার সঙ্গে গাঁয়ে মার অনুগ্রহ হওয়ার কি সম্বন্ধ !'

মঙ্গলা হাসিমুখে বলল, 'কথায় কথায় আপনি এমন চটে যান খুড়িমা, যে আপনাকে কিছু বলবার জো নেই। সত্যি সত্যিই কি আর বিনোদ ঠাকুরপো প্রাণের ভয়ে পালিয়েছে ? আমি তামাসা করছিলাম।'

সৌদামিনী তেমনি অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'এও কি তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের কথা হোল বউ মা ? পাড়া ভরে তোমার বুদ্ধির আমরা কত তারিফ করি। আর তুমি কি'না বললে তামাসা করছিলাম। আমার মত বুড়ো মানুষের সঙ্গে তোমার কি তামাসা করবার সম্পর্ক ?'

মঙ্গলা তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিল, 'ভারি অন্যায় হয়ে গেছে খুড়িমা। কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন, আপনি বারাণ্ডায় উঠে বসুন, আমিও ততক্ষণ উঠানটা সেরে আসি।'

সৌদামিনী বলল, 'না বউমা, বসব না, পাড়ায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমারই তো বলতে হবে। যত দায় পড়েছে আমার। এসব দিকে আর তো কারো কোন চৈতন্য নেই। থাকলে এসব রোগ ব্যামো হবেই বা কেন। সব পাড়া ঠাণ্ডা রইল, আর মা অনুগ্রহ করলেন এসে এখানে! ছোটখাট পাপতাপ কিছু না থাকলে কি এমন হয় ? শুনেছ বোধ হয় মুকুন্দের বউটার গায়েও ফুটে বেরিয়েছে।'

মঙ্গলা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিন্তু আমি যে কাল বিকেলেও তাকে ভালো দেখে এলাম।'

সৌদামিনী বলল, 'আর আমি এইমাত্র সেখান থেকে আসছি। এখন কেবল এই রকমই শুনবে বউমা। সকালে দুজনের, বিকেলে পাঁচজনের, এমনি করেই ছড়াবে। আর দেরি করোনা, এখনো

ভালোয় ভালোয় মা শীতলা রক্ষাচণ্ডীর কুলো নামাও। মা যদি রক্ষা করেন তবেই সব রক্ষা পাবে, না হ'লে ডাক্তার বৈদ্যের সাধ্য নেই যে এ রোগে—

মঙ্গলা বলল, 'বেশ তো, আপনারা পাঁচজনে যদি মত দেন—'

সৌদামিনী একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, 'মত না দেওয়ার আবার কি আছে। সবাই মত দেবে। দেবদেবতার ব্যাপার। একি খেলার কথা যে ইচ্ছা হোল মত দিলাম আর ইচ্ছা হোল দিলাম না।'

মঙ্গলা বলল, 'কিন্তু করতে চান কবে?'

সৌদামিনী জবাব দিল, 'কবে আবার, কালই। দেরি করবার আর সময় আছে নাকি? কালই তো মঙ্গলবার, বেশ যোগ্য দিন পড়েছে, কালই করতে হবে পুজো।'

মঙ্গলা বলল, 'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি হয়ে উঠবে? দুখানা প্রতিমাও তো দরকার।'

সৌদামিনী বলল, 'সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। মোহন বৈরাগীর ঘরে অমন দু'চারখানা প্রতিমা সব সময় তৈরীই থাকে। খরচ পাওয়া মাত্র দু'দণ্ডের মধ্যে রঙ কোরে দেবে। শীতলা রক্ষাচণ্ডী যদি গড়ানো নাই থাকে, পুরোণ মনসা কি জগদ্ধাত্রীর রঙ ফিরিয়ে মোহন কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। নিদেন পক্ষে পুরোণ রাধা কি লক্ষ্মী সরস্বতীর দু'খানা হাতের সঙ্গে আরো দু'খানা করে হাত জুড়ে নিলেই হবে। সে জন্য ভেবনা তুমি। যারা এসব কাজ করে তাদের ঘরে কত রকম কত পুরোণ প্রতিমা থাকে। নগদ টাকা পেলেই তোমার দরকার মত রঙ বদলে দেবে, নাম বদলে দেবে।'

মঙ্গলা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'লোকে যে বলে সব দেবতাই এক, কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়।'

সৌদামিনী দার্শনিকের মত মুখ গম্ভীর করে বলল, 'কে বলল

মিথ্যা। শোননি সেবার কথক ঠাকুরের মুখে, তিনি এক থেকে বহু আবার বহু থেকে এক। কিন্তু দেবদেবতার নামে অমন করে হাসতে নেই মঙ্গল বউ, ওতে অমঙ্গল হয়। একেই তো দেশের যা অবস্থা—'

মঙ্গলা অপ্রতিভ হয়ে চুপ ক'রে রইল।

সৌদামিনী বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রত্যেকের কাছেই কথাটা পাড়তে লাগল এবং অবিলম্বে পুজো করার প্রয়োজনীয়তা সকলকে বুঝিয়ে দিল।

নবদ্বীপ বলল, 'বেশ তো ক'রে কম্মিয়ে নাও, আমি তো আছিই।'

ব'লেই গঞ্জের দিকে যেতে উদ্যত হোল নবদ্বীপ। সৌদামিনী বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আরও একটা কথা আছে যে ধন ঠাকুরপো।' নবদ্বীপ একটু বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বলল,' 'আবার কি কথা!'

সৌদামিনী বলল, 'ওমা, আসল কথাই তো রয়ে গেল। টাকা পয়সার দরকার না?'

নবদ্বীপ বলল, বেশ দশজনে যা দেবে আমিও তাই দেব।'

খাটো ঘোমটার আড়ালে সৌদামিনী একটু হাসল, 'এ কি একটা কথার মত কথা হোল ধন ঠাকুরপো। আপনি কি পাড়ার আর দশ জনের মত! ঠাট্টাতামাসা রাখুন। কাজটা অবশ্য দশজনেরই। কিন্তু হাতের দশটা আঙুল কি সমান? তা ছাড়া বৈঠক ক'রে মাথট তুলে যে কাজে হাত দেবেন তার সময় কই। অত দেরি মার কি এবার সইবে। দেখছেন না পাড়ার অবস্থা। পুজোর খরচটা আপনিই চালিয়ে দিন। তারপর সবাইর কাছ থেকে যে মাথট ওঠে আপনি নিয়ে নেবেন।'

নবদ্বীপ মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'দেখি ভেবে।'

তারপর সোজা বাজারের পথ ধরল।

সৌদামিনী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে চ'লে যাচ্ছিল।

ঘর থেকে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল মুরলী ; তারপর সৌদামিনীকে ডেকে বলল, 'রাগ করলেন নাকি খুড়িমা। ভাববেন না আপনি। বাবার ঐ রকমই কথাবার্তা। আপনি যান, আর জোগাড় টোগাড দেখুন। পূজো কালকেই হবে। টাকা পয়সার জন্য আটকাবে না।'

সৌদামিনী বলল, 'বেঁচে থাকো বাবা, ভারি খুশি হলাম তোমার কথা শুনে। এই তো কথার মত কথা। দশজনের অবস্থা তোমরা না দেখলে দেখবে কে। ভগবান দেখতে দিযেছেন তোমাদেব।'

যেতে যেতে সৌদামিনী ভাবল, না মুবলীব যত নিন্দা লোকে করে আসলে তত মন্দ সে নয়। ছেলেটির চরিত্রই কেবল নেই, তা ছাড়া আর সবই আছে। আলাপ-আপ্যায়নে কি রকম প্রাণ কেড়ে নেয়, দযা-দাক্ষিণ্যে হাত কত দরাজ। দরকারের সময় টাকাটা আধুলিটা থেকে পাঁচ দশ টাকা পর্যন্ত সৌদামিনী মুরলীর কাছ থেকে পেয়েছে। কোন বারই মুরলী না করেনি। শোধ দেওয়ার জন্ত তাগিদ দেয়নি আর পাঁচ জনের মত। ভারি চমৎকার ছেলে। মুরলীর নিন্দা শুনলে, তার কোন রকম কোন লাঞ্ছনার কথা শুনলে সৌদামিনীর মনে কেমন যেন একটা খোঁচা লাগে। আহা এত ভালো ছেলে, স্বভাব চরিত্রটা যদি শুধু একটু ভালো হোত তাহলে লোকে আর অমন ক'রে বলতে পারত না। এ নিয়ে কোন কোন সময় মুবলীকে একটু আধটু বুঝাবারও চেষ্টা ক'বেছে সৌদামিনী, 'ওসব এখন ছেড়ে দাও বাবা, অমন লক্ষ্মীব মত বউ রয়েছে ঘরে, মেয়ে রয়েছে তোমার'। মুরলী হেসে মাথা নেড়েছে, 'ওসব থাক খুড়ি মা, আর কি কি যেন সব বলছিলেন তাই বলুন।'

সৌদামিনী আহত হয়ে চুপ ক'রে গেছে। তারপর মনে মনেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে, এক এক জনের থাকে এ রকম দোষ।

বয়সে ভাটি না পড়লে যায় না। কারো কারো বুড়ো বয়সেও থাকে। এমন সৌদামিনী অনেক দেখেছে।

শীতলা রক্ষাচণ্ডী পূজোর কথাটা পাড়ায় প্রচারিত হ'তে বেশি সময় লাগল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। সময় বেশি নেই, কয়েকটা ঘণ্টা কেবল মধ্যে। লোক গেল মদন বৈরাগীর বাড়ী প্রতিমার ব্যবস্থা করতে। সুবল নিল চাঁদা তোলার ভার। ফটিককে বলল, ওসব হবে না, দশজনের পূজো দশজনের চাঁদাতেই হবে, মুরলীরা আছে বড় লোক। তাই বলে গোটা কয়েক টাকা বেশি দিয়েছে সেই খোঁটা দেবে বছর ভরে আর বাপবেটায় সকলের ওপর মাতব্বরি করবে তা চলবে না।

কথাটি অনেকেরই পছন্দ হোল না। দেবদেবীর পূজোয় নিজেদের কল্যাণের জন্য চাঁদা তো সাধ্যমত প্রত্যেকে দেবেই, কিন্তু মুরলী যদি কিছু বেশি খরচ করে তো করুক না। তাতে আমোদে স্ফূর্তির মাত্রাটা বাড়বে, প্রসাদের পরিমাণ এবং উৎকর্ষ বেশি হবে, সে সুবিধাটুকু সকলেই ভোগ করবে। তা নিয়ে সুবলের এত মাথা ব্যথা কিসের, এত মান অপমান বোধই বা কিসের জন্য!

পূজো হবে ঘাটের ধারে, হিজল গাছের তলায়। শীতলা রক্ষাচণ্ডীর পূজো প্রতিবারই এখানে হয় ব'লে এ অঞ্চলে এর আর এক নাম হয়েছে ঘাট পূজো। শুধু এ পাড়ায় নয়, ব্রাহ্মণ কায়স্থদের পাড়ায়ও সবাই নদীর ঘাটে আসে পূজো ক'রতে। একেক পাড়ার দখলে দু'তিনটি কি তারো বেশি আছে ঘাট। কিন্তু নির্বিচারে সব ঘাটে পূজো নেই। যে ঘাটে পুরুষানুক্রমে বছরের পর বছর পূজো হয়ে আসছে সে ঘাট যত অপরিসর আর যত অসুবিধাজনকই হোক পূজো সেখানেই হবে। গায়ের জোরে আর টাকার জোরে কায়েত পাড়ার বোসেরা একবার ঘাট বদলে ছিল। বছরও ঘুরল না, সেই বোসেদের বাড়ির

চার চারজন মানুষ খাটে চড়ে এল সেই ঘাটে। এর পর কোন পাড়ায় শিগগির আর এ রকম গোয়ার্তুমি কেউ করেনি।

নদীপারের এ সব চটানে বর্ষার সময় অবশ্য ডুব জল থাকে। তখন নদী হয় সমুদ্রের মত। বর্ষার শেষে সেই জল সরে গিয়ে থক থক করতে থাকে কাদা। সারাটা অগ্রহায়ণ মাস ভরে সেই কাদা একটু একটু ক'রে শুকিয়ে আসে। পৌষ মাঘে শুকাতে থাকে নদী। পারের দিকটা প্রসারিত হ'তে হ'তে এত বড় হয় যে সেখানে ছোটখাটো পূজার্চনা কেন, দু'চার গাঁয়ের মানুষের মেলাও বসিয়ে দেওয়া যায়।

আগের দিন বিকেলেই সৌদামিনী আলতা আর তার মাকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটের ধারে হিজল গাছের তলাটা ভালো করে ঝাঁট দিয়ে গোবর জল ছিটিয়ে এল। পরদিন ভোরে লেপ পড়ল আর একবার। দণ্ড চারেক বেলা হ'তে না হ'তেই লোকজনে গিজগিজ করতে লাগল ঘাট। মদনের বাড়ি থেকে মাথায় ক'রে প্রতিমা নিয়ে এল ছেলেরা। শীতলা আর রক্ষাচণ্ডী। শীতলার হাতে ঝাঁটা মাথায় কুলো চম্পকবর্ণা, রক্ষা চণ্ডীর চারি হাতে শঙ্খ চক্র পদ্ম আর বরাভয়। হাত কয়েক ব্যবধান রেখে ছোট দুখানা জল চৌকি পেতে বসান হোল প্রতিমা। ঘাটের কাছাকাছি যে-সব বাড়ি সেই সব বাড়ি থেকে আসতে লাগল মাদুর, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁজ বারকোষ ভরে ফুলবেলপাতা, পুজোর বিচিত্র রকমের উপচার।

ভোর হ'তে না হ'তেই পাড়ার বউঝিরা সব নদীতে গিয়ে স্নান ক'রে এসেছে। তারপর চলেছে সাজসজ্জার পালা। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী যারা তাদের বউঝিদের বাক্স সিন্দুক থেকে বেরুচ্ছে ভারি ভারি সোনার গহনা, আর যে-সব মেয়েদের স্বামী পুত্ররা নিতান্তই অল্প মূলধনের ব্যাপারী, বাজারের মাঝখানে খোলা জায়গায় পাটের চট পেতে বসে যারা পদ্মপাতায় নুনের পুঁটুলি বেঁধে খদ্দেরের হাতে

তুলে দেয়, তাদের ঝাঁপিতে বাক্সে সোনাদানা অবশ্য অত নেই। তবু দু'চারখানা গহনার সঙ্গে রঙীন শাড়িশেমিজ প্রায় সকলের তহবিল থেকেই বেরুচ্ছে। এসব শাড়ি সচরাচর বউদের গায়ে ওঠে না। পূজাপার্বন উৎসব আনন্দের জন্যই এসব তোলা থাকে। বছরের অন্য সব দিন আটপৌরে খাটো খাটো ময়লা আর জীর্ণ শাড়িতে দিন কাটে। কেবল এই সব বিশেষ দু'একটি দিনের জন্য নামে রঙ বেরঙের শাড়ি। আর সেই শাড়ির রঙের সঙ্গে সঙ্গে রঙ ধরে মনে, চোখের কোনে আর ঠোঁটের কোনে সেই রঙীন আনন্দ ঝিলিক দিতে থাকে। আটপৌরে সব গৃহস্থ বউদের মনে হয় দেবলোকের অপ্সরীর মত। সমস্ত গাঁ খানারই যেন রূপ বদলে যায়, রঙ বদলে যায়।

গাঁয়ের বউঝিদের জীবনে এই দিনটি বছর বছর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। সারা বছরটা রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে আনাগোনায় কাটে, বড়জোর শাশুড়ী-ননদের অভিভাবকতায় পুকুরের ঘাট কি নদীর ঘাট পর্যন্ত সীমাটা একটু বিস্তৃত হয়; কেবল এই শীতলা রক্ষা-চণ্ডীর পুজোর দিনটিতে পৃথিবীটা আকস্মিক ভাবে অনেকখানি ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। এদিন দলের সঙ্গে বউঝিরা মাঙতে, মাঙতে, সমস্ত গাঁ, গাঁয়ের সমস্ত বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারে। অনেক আম কাঁঠালের বাগান, ঝোপে জঙ্গলে ভরা পোড়ো ভিটে, আর, বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। খাটো ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে নানারকমের গাছপালা, নানা আকারের ঘরবাড়ি, অপরিচিত অর্ধপরিচিত মানুষের নানা ধরণের মুখ, মানুষের বিভিন্ন রকমের গলা, কানে অদ্ভুত শোনায়। বিস্তৃতি আর বৈচিত্র্যের মাঝখানে সেই শোবার ঘর আর ছোট্ট রান্নাঘর কোথায় মিলিয়ে যায়, মনেই থাকে না যে আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে।

সিঁদুরের পুত্তলি আঁকা নতুন দুখানা বড় বড় কুলো শীতলা রক্ষাচণ্ডীর

পায়ে ছুঁয়ে আনা হয়েছে। এই কুলো নিয়ে মেয়েদের দল বেরোবে মাগুনে। প্রত্যেক বাড়ি থেকে গৃহিনীরা চাল ঢেলে দেবে এই কুলোয়। মেয়েদের কাঁখ থেকে কাঁখে কুলো ফিরতে থাকবে। চালের ভারে কুলো যখন ভেঙে পড়তে চাইবে, চালগুলি ঢেলে দেওয়া হবে বয়স্কদের কাঁখের ধামায়, তারপর ধামায়ও যখন চাল আর ধরতে চাইবে না সামনে যে বাড়ি পাওয়া যাবে সে বাড়ির হেফাজতেই চালগুলি রেখে আসা হবে।

সমস্ত বাড়ির মাগুন শেষ হয়ে গেলে এই চাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে পরে নিয়ে গেলেই চলবে।

নবদ্বীপের বাড়ি থেকেই কুলো প্রথম বেরোবে। বছর বছর এই নিয়মই চলে আসছে। নবদ্বীপের স্ত্রী মাতঙ্গিনী বেঁচে থাকতে সেই রক্ষাচণ্ডীর কুলো আগে কাঁখে নিত। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সম্মান দেওয়া হবে এখন তার পুত্রবধূ মনোরমাকে। শীতলার কুলো প্রথম নেয় বিনোদের মা সৌদামিনী। তারপর পালাক্রমে দুখানা কুলোই বিভিন্ন বাড়ির বউঝিদের কাঁখে কাঁখে ঘোরে।

কিন্তু এবার ভালো মানুষিতা করতে গিয়ে প্রায় একটা গোলমাল বাঁধিয়ে তুলল ওবাড়ির বিষ্টু সার বউ।

উঠানে আলপনা দেওয়া দুখানা পিঁড়ির ওপর কুলো দুখানা পাশাপাশি রয়েছে। কাছাকাছি কয়েক বাড়ির বউঝি যারা ইতিমধ্যে এসে দলে জুটতে পেরেছে পিছনে দাঁড়িয়েছে সারি বেঁধে। ঘর থেকে মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে এল মনোরমা। পাতলা চেহারা সোনার ভরিতে ভারি হয়ে উঠেছে। গা দেখা যায় না, মনোরমার সর্বাঙ্গে কেবল পাকা সোনার দ্যুতি ঝিক ঝিক করছে। গায়ে সোনার গহণা প্রত্যেকেরই দু'চার খানা ক'রে আছে। কিন্তু মনোরমার ঐশ্বর্যের সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। তার দিকে তাকিয়ে আর সকলের চোখ শুধু ঝলসেই গেল না, ঈর্ষ্যায় জলতেও লাগল।

পাশেই দাঁড়িয়েছিল মঙ্গলা, সেই পুরোণো লালপেড়ে গরদের শাড়িখানা পরণে। গলায় একগাছা সরু হার আর হাতে কয়েক গাছা ক'রে চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নেই। কিন্তু এইটুকু সজ্জাতেই মঙ্গলার ভারি অদ্ভুত এক রূপ খুলে গেছে। যেন এর চেয়ে বেশি অলংকার তাকে মানায় না। মঙ্গলাকে দেখা যাচ্ছে শুভ্র গম্ভীর একখানা শ্বেতপাথরের মূর্তির মত। অলংকারের প্রাচুর্য নেই, কিন্তু অলংকার যেন প্রতি অঙ্গে থমকে আছে।

বিষ্টু সার বউ মঙ্গলার দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'এই পূজোআচ্চার দিনে যাকেই কিন্তু আমাদের মামায় ভালো। যেন সাক্ষাৎ একেবারে মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি। তোমাদের অনেক কালের নিয়ম না হলে মঙ্গলাই এসে না হয় আগে তুলত রক্ষাচণ্ডীর কুলো। চমৎকার মানাত কিন্তু। কাল আমার নিমাইর পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বসেছিল। নিজের ছেলের জন্যও মানুষে অতখানি করতে পারে না। বউ উঠে আসতে নিমাই বলে কি, ঠাকুমা আমার কাছে এসে মা রক্ষাচণ্ডী বসে ছিল, আমি স্বপ্নে দেখলাম। মনে মনে ভাবলাম, আহা! তাই যেন হয়। আমার মা মঙ্গলার হাত দিয়ে রক্ষাচণ্ডীই তোকে যেন রক্ষা করেন। আসছে বারে আমি জোড়া মূর্তি গড়িয়ে পূজো দেব। মাগুন সাজ হয়ে গেলে বিকালের দিকে একবার যেয়ো কিন্তু বউ মা। রাত থেকে ওর মা আবাগীও পড়েছে। কেন, এখন দেখিস না তোর ছেলে? হাড় আমার চিবিয়ে খেল সবাই মিলে।'

কথা একবার আরম্ভ করলে নিমাইর ঠাকুরমা কোন দিন থামতে জানে না। মাঝখানে পড়ে কাউকে না কাউকে থামাতেই হয়। মনোরমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'যাক, আপনাদের বাদ-বিসংবাদের কথা এখানে শোনবার তো কারো সময় নেই খুড়িমা, সে ঝগড়া বাড়ী

গিয়ে বউয়ের সঙ্গেই করবেন।' তারপর একটু ক্লেশের হাসি হেসে ঝাঁজ দিয়ে বলল 'এবার আপনাদের যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে রক্ষাচণ্ডীর কুলো স্বয়ং মঙ্গলচণ্ডীর কাঁধেই প্রথমে তুলে দেবেন, বেশ তো তাই দিন, তাতে আপত্তির তো কারো কিছু নেই।'

কিছুক্ষণের জন্য কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না।

ঘরের মধ্যে মুরলী ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে মেয়েদের সব কথা শুনছিল; মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিল বাইরের দিকে। মনোরমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে এবার সে একেবারে খোলা বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল, কৃত্রিম একটু কাস দিয়ে বলল, 'এদিকে আসুন খুড়িমা, আপনাদের বিবাদটা কি নিয়ে একটু শুনি।'

মুরলীর সাড়া পেয়ে অন্যান্য বাড়ির বউঝিরা যেন হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে নড়েচড়ে উঠল, তারপর সেখানেই ফের সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাছাকাছি কোন বেড়ার আড়াল থাকলে যেন সেখানে গিয়ে মুরলীর দৃষ্টি থেকে তারা আত্মগোপন করত। তাদের ভাব দেখে মুরলী মনে মনে হাসল। সৌদামিনী আর বিষ্টু সার স্ত্রী এগিয়ে এল মুরলীর সামনে।

সৌদামিনী বলল, 'না, বিবাদ আবার কোথায় দেখলে বাবা।'

বিষ্টু সার স্ত্রী একটু হাসির ভান ক'রে বলল, 'এসব আমাদের মেয়েদের মেয়েলী কথাবার্তা—'

মুরলী হেসে বলল, 'তবু তার মধ্যে পুরুষের মতামত খানিকটা থাকা ভালো। কুলো নেওয়া সম্বন্ধে যে নিয়ম চলে আসছে তাই চলবে। এবাড়ির বউই চিরকাল ধরে কুলা প্রথম তোলে, আজও সেই তুলবে, এখানে আর কারো কথা তো উঠতেই পারে না, তা তিনি আপনাদের রক্ষাচণ্ডীই হোন আর মঙ্গলচণ্ডীই হোন।'

কয়েকটি অল্পবয়সী মেয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। মঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হোল পাতলা গৌরবর্ণ চামড়ার নিচে রক্ত যেন টলটল করছে।

নিজেকে এতক্ষণ ভারি অসহায় বোধ হচ্ছিল মনোরমার। স্বামী হঠাৎ তার পক্ষ সমর্থন করতে আসায় সে একটু লজ্জিত হোলেও মনে মনে বেশ খানিকটা গর্ব আর আনন্দও বোধ করল।

মুরলী অসচ্চরিত্র, দেশবিদেশের অন্যান্য মেয়েরা তার মন আকর্ষণ করে। ঘর ছেড়ে তাদের পিছনে যে ছোটে মুরলী, এতে দুঃখ আর দুর্ভাগ্য যত বড়ই থাকুক অপমানটাই মনোরমার মনে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে বেঁধে। অন্যান্য মেয়ের কাছে সে মুখ দেখাতে পারে না, সামনে আড়ালে তাদের নীরব আর সরব সমালোচনা মনোরমার চোখকানকে পীড়িত করতে থাকে। রূপের যদি তেমন জলুষ থাকত মনোরমার, গুণের যদি থাকত তেমন মুগ্ধ করার শক্তি, তাহলে কি আর মুরলীর অমন বারটান হোত। ছলায়কলায় সেবাযত্নে আদরেসোহাগে স্বামীকে যে সে একান্ত ক'রে ঘরে রাখতে পারে না সে তো মনোরমারই দোষ, মনোরমারই অক্ষমতা। কিন্তু আজ একবাড়ি লোকের সামনে মুরলী যে তার সম্মান রাখবার জন্য এগিয়ে এলো এতে কি মনোরমার সেই অপমানের অনেকখানি ক্ষালন হয়ে গেল না। মনোরমা কি এখন সকলের মুখের ওপর শুনিয়ে দিতে পারবে না যে আসলে স্ত্রীকেই ভালোবাসে মুরলী, তার মানসম্মান রাখবার জন্যই সে ব্যাকুল। অন্য মেয়েদের পিছনে যে সে ছোটে সেটা তার খেলা, সেটা তার কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়।

আর কোন কথা উঠল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই কুলো নিয়ে মেয়েদের দল বেরিয়ে পড়ল গাঁয়ের পথে পথে। তারা একেক বাড়িতে গিয়ে ওঠে আর কলকণ্ঠে সমস্বরে হুলুধ্বনি দেয়। তাদের কথায় শুকনো

পাতাগুলি মর্মরিত হতে থাকে, এতক্ষণে বোঝা যায় সত্যিই এঅঞ্চলে বসন্ত বাঁধা পড়েছে এদের অঞ্চলে।

কুলোর সঙ্গে সঙ্গে খানিকক্ষণ ঘুরবার পর মঙ্গলা হঠাৎ বলল, 'আমি ভাই যাই।'

বিস্মিত হয়ে অনেকেই মঙ্গলার দিকে তাকাল, 'সে কি মঙ্গলাদি, এখনই যাবে কোথায়!'

মঙ্গলা বলল, 'যাই একটু নিমাইর মার কাছে, শুনেছি তারও গায়ে বসন্ত উঠেছে, রোগা ছেলে নিয়ে একা একা পড়ে আছে বেচারা।'

ব'লেই মঙ্গলা চলতে শুরু করল।

কয়েকজন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কেউ কেউ একটু মুচকি হাসল। নিমাইর মাব কাছে যাওয়া একটা অছিলা আসলে রাগ আর অভিমান হয়েছে মঙ্গলার। দেখলে না রক্ষাচণ্ডীর কুলো একবারও সে কাঁখে নিলে না। সত্যি, বাড়ির ওপব পেয়ে মুরলী মা একেবারে যা তা বলে দিল। এর একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রত্যেকেই একেবারে মুখ বুজে রইল, যেন ছুঁচে সুতায় সেলাই ক'রে রেখেছে ঠোঁট দুটি, খুলবার জো নেই।

হারাণ সার মেয়ে পুনটুরী বলল, 'এখন তো খুব খই ফুটছে মুখ দিয়ে, তখন বললেই পারতে, বুঝতাম ক্ষমতা।'

পাড়া ছাড়িয়ে দল একেবারে অন্য পাড়ায় এসে পড়েছিল। ঝোঁকের মাথায় খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে মল্লিকদের গাব আর খুদে জাম গাছের ভিটায় এসে মঙ্গলার হঠাৎ তা খেয়াল হোল। কিন্তু তাই বলে মঙ্গলা একটুও বিচলিত হোল না; এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় কেন, এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়েও মঙ্গলা ইচ্ছা করলে একা একা চলে যেতে পারে। আর এতো তার চেনা পথ, ফি বছরেই একবার এখান দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। পথের কথা নয়, নিজের

বিসদৃশ আচরণের কথাই এতক্ষণে মনে পড়ল মঙ্গলার। কুলোর সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্যন্ত না গিয়ে এভাবে একা একা চলে আসায় সবাই যে তার অসাক্ষাতে খুব হাসাহাসি করবে তাতে মঙ্গলার সন্দেহ রইল না। তা হাসুক। অসাক্ষাতে ওরা যাই বলাবলি করুক, হেসে একেবারে যতই গড়িয়ে পড়ুক, মঙ্গলার সাক্ষাতে তাকে যে ওরা তুচ্ছ করতে পারে না, রীতিমত ভয় করে এওতো মঙ্গলা দেখেছে। অসাক্ষাতে কে কি করল না করল, বলল না বলল, তা নিয়ে মঙ্গলা মাথা ঘামাতে যায় না। কিন্তু মুরলীকে কিছু শুনিয়ে দিয়ে আসা উচিত ছিল, ঠিক ঝগড়ার মত ক'রে নয়, শ্লেষ করে খোঁচা দিয়ে দিয়ে, মুরলীকে ঠিক সম্বোধন করে নয়, আর কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মুরলীর কথাগুলির বেশ শানানো জবাব দিয়ে আশা যেত, এমন সুযোগ কি আর কোন দিন হবে যে পাড়ার অতগুলি বউঝির সামনে মাত্র কয়েকটি কথার খোঁচায় মুরলীকে সে চরম অপমান করে একেবারে নির্বাক করে দিতে পারবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে মঙ্গলার খেয়াল হোল যে বিষ্টু সার বাড়ি নয়, অন্যমনস্ক ভাবে ঘুরেফিরে সে একেবারে নিজেদের বাড়িতে এসেই উপস্থিত হয়েছে। এই ভুলে মনে মনে একটু যেন পরিতৃপ্তিই বোধ করল মঙ্গলা। থাক ভালই হোল, নিজের ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে পারবে, একটু গড়িয়ে নেওয়া যাবে। তারপরে না হয় যাবে নিমাই আর তাঁর মাকে দেখতে। এবেলা রান্না খাওয়ার ঝঞ্ঝাট নেই, নিতান্ত ছেলেপুলে যারা থাকতে পারে না তারা ছাড়া বয়স্কদের মধ্যে পাড়ায় কেউ আজ আর এবেলা ভাত খাবে না, ঘাটের পূজো শেষ হলে সেখানেই পেট ভরে চরু খাবে: মিষ্টি ছাড়া কেবল দুধে আর চালের মিষ্টান্ন। অথচ অদ্ভুত তার স্বাদ। কিন্তু কেবল ঐ একদিন ঘাটে ঠাকুরের হাতে যেমন তেমন করে আধাআধি জল মেশানো

দুধে মোটা চাল সিদ্ধর স্বাদ বছর ভরে মুখে লেগে থাকে, ঘরে খাঁটি দুধে অনেক যত্ন ক'রে নিজের হাতে তৈরী জিনিষেও তেমন স্বাদ পাওয়া যায় না। সুবল অবশ্য বলে, সারাদিন উপবাসেব পর বিষ পর্যন্ত অমৃতের মত ঠেকে। সুবল কিন্তু মঙ্গলার মত একেবারে না খেয়ে থাকে না।

সকালে মুড়িচিঁড়া পেট ভরে খেয়ে নেয়। তারপর যায় ঘাটে। সতরঞ্চি বিছিয়ে সকাল থেকেই সেখানে পুরুষরা তাসপাশা খেলতে শুরু করে। কোন বেটাছেলেই প্রায় বাড়ি থাকে না, সমস্ত পাড়াটা এই একটি মাত্র দিন তারা মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে আসে। মেয়েরা দিন ভরে মাগুন মাগে, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে একেক বাড়িতে ব'সে বিশ্রাম করে, গল্প করে, পরস্পরের খোঁজখবর নেয়। ঘর সংসারের জন্য কোন তাড়া নেই, কোন চিন্তা নেই। পুরুষদের মধ্যেও দু'চারজন ছাড়া এদিন ব্যবসাবাণিজ্যে কেউ বড় একটা যায় না। একেক গাছের তলায় ছোট ছোট মাদুর বিছিয়ে তাসপাশা বসে, জন চারেকে খেলে আর বিশ পঁচিশজন তাদের ওপর ঝুঁকে পড়ে খেলা দেখে, তামাক ভরে আর তামাক খায়। এমন যে কাজের মানুষ সুবল সেও আজ ওদের সঙ্গে বেমালুম মিশে গেছে। সারাদিনের মধ্যেও আজ আর তার দেখা মিলবে না।

বাড়িতে পা দিয়েই মঙ্গলা চমকে উঠল। উঠানের ওপর সজনে গাছটির ধারে কে ওখানে দাঁড়িয়ে, ও বাড়ির মুরলীর মত মনে হচ্ছে যেন! আরো কয়েক পা এগুতেই মঙ্গলার আর কোন সংশয় রইল না, মুরলীই। বুকের ভিতরটা মঙ্গলার হঠাৎ কেঁপে উঠল। ও আবার এসেছে কেন এখানে! মঙ্গলাকে দেখে মুরলীও ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। মঙ্গলা কোন কথা বলবার আগেই মুরলী বলল, 'ক্ষমা চাইতে এলাম।'

মুরলীর মুখের মৃদু হাসি দেখে অবশ্য মনে করা যায় যে, সত্যিই সে কোন অপরাধ ক'রেছে কিংবা অপরাধের জন্য নিদারুণ আত্ম-গ্লানিতে অন্তর তার দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মঙ্গলা একবার সভয়ে চারিদিকে তাকাল। খাঁ খাঁ করছে দুপুরের রোদ। সমস্ত পাড়াটা জনশূন্য পরিত্যক্ত বলে মনে হচ্ছে। সবচেয়ে কাছে একমাত্র আলতাদের বাড়ি। কিন্তু মা আর মেয়ে দুজনেই তো বেরিয়েছে কুলোর সঙ্গে, মনের সাধে সমস্ত গ্রাম আজ তারা ঘুরবে, তারপর ফিরবে একেবারে সেই বিকাল বেলায়। বাড়ির তিন দিকে পাতলা আগাছার জঙ্গল, ফাঁকে ফাঁকে পড়শীদের তালা দেওয়া ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে।

মঙ্গলা বলল, 'দরকার নেই আমার ক্ষমায়। আর অপরাধ করলে তো তার ক্ষমা। এবার আপনি বাড়ি যান মুরলী ঠাকুরপো,' বলে বারাণ্ডায় উঠে মুরলীর দিকে পিছন ফিরে ঘরের তালা খুলল মঙ্গলা, তারপর দরজা ঠেলে সোজা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

মুরলী মনে মনে হাসল। আশ্চর্য মঙ্গলার মত শক্ত জবরদস্ত মেয়েও তাকে ভয় করে! এ ভয় কি মঙ্গলার মুরলীকে, না নিজেকেই নিজে ভয় করছে মঙ্গলা?

মুরলী উঠান থেকে উঠল বারাণ্ডায়, বারাণ্ডা থেকে একেবারে দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, হেসে বলল, 'সেই ভালো, খোলা উঠানে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলাটা ভালো দেখাচ্ছিল না। তাছাড়া তুমি যে ভাবে চারদিকে বার বার তাকাচ্ছিলে। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তার সত্যি জবাব দেবে?'

মঙ্গলা শক্ত হয়ে বলল, 'না, আমার জিজ্ঞাসায়ও দরকার নেই, জবাবেও দরকার নেই। বাড়ি যান এবার আপনি।'

মুরলীর যেন সে কথা কানেই গেল না। সে তার আগের কথার

জের টেনেই বলল, 'সত্যি সত্যি অমন করে কি দেখছিলে, বলো তো? কিসের ভয় করছিলে? লোকজন কেউ নেই বলে, না লোকজন হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে বলে?'

মঙ্গলা বিস্ময়ে একমুহূর্ত চুপ করে রইল, জবাব যেন সহসা তার মুখে যোগাল না।

মুরলী এই অবসরে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা দিল ভেজিয়ে।

আর দুতিন হাত জায়গা মাত্র ব্যবধান। কিন্তু মঙ্গলা কোন রকম বাধা দিল না, আতঙ্কে ভয়ে কোন রকম চীৎকার করে উঠল না, কেবল অদ্ভুত একটু হাসল, তারপর খুব শান্ত কিন্তু কঠিন কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা মুরলী ঠাকুরপো, তোমার তো ধর্ম নেই, লজ্জা নেই, মান অপমান বোধ নেই, কিন্তু জীবনেরও কি কোন ভয় নেই তোমার?'

মুরলী যেন মুহূর্তকাল পরে স্তম্ভিত হয়ে রইল, এতক্ষণ কোন মোহ না থাক, অনুরাগ না থাক, দু'চোখ ভরে হরিণীর মত ভয় ছিল মঙ্গলার। আর তার সেই ভয়ই মুরলীকে মুগ্ধ করছিল, আকর্ষণ করে আনছিল। সেই ভয়ের বদলে দু'চোখে কেবল ঘৃণা আর অবজ্ঞায় ছেয়ে আছে মঙ্গলার। ঠাণ্ডা নিরুত্তেজ নিরুত্তাপ ঘৃণা। নারীর চোখের ভয়েরও তবু যেন একটা রং আছে, উত্তাপ আছে, কিন্তু এমন ঘৃণার সঙ্গে এর আগে কোন দিন যেন পরিচয় ঘটেনি মুরলীর। তার সেই ঘৃণার স্পর্শে মুরলীর সমস্ত মোহ সমস্ত বাসনা যেন কঠিন নিশ্চল বরফের স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে যাবে!

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর মুরলী বলল, 'জীবনের ভয়? না, তাও বোধ হয় নেই। তাহলে তোমার সামনে এমন ক'রে এসে দাঁড়াতে পারতাম না।'

এতক্ষণে মঙ্গলার মুখে হাসি ফুটল, ঘৃণার বদলে দুচোখে তরল

কৌতুক যেন টল টল করতে লাগল, বলল, 'আমার সামনে দাঁড়ালে তোমার জীবনের পর্যন্ত আশঙ্কা আছে এত ভয়ও ছিল তোমার মনে! আমার শক্তির ওপর এতখানি বিশ্বাস ছিল যে তোমাকে মেরে পর্যন্ত ফেলতে পারি!'

চাপা হাসিতে সমস্ত মুখ ছেয়ে গেল মঙ্গলার। টোল পড়েছে দুটি গালে।

মুরলী সেই দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'তা ছিল।'

মঙ্গলাও তেমনি সহাস্যে বলল, "তবু এসে দাঁড়িয়েছ আমার সামনে! দুরু দুরু বুকে মরবার এতখানি ভয় নিয়েও!'

মুরলী মঙ্গলার দিকে তাকাল। সেই বরফের স্তূপ কখন গলতে শুরু করেছে। রঙ্গে আর কৌতুকে মঙ্গলাকে মনে হয় স্রোতস্বিনীর মত। কলকণ্ঠে দুটি কান ভ'রে নিল মুরলী। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'হ্যাঁ তবুও দাঁড়িয়েছি। কেননা তোমার মধ্যে ম'রেও সুখ, তোমার মধ্যে পুড়েও আনন্দ।'

বলতে বলতে এগিয়ে এসে সহসা দুই হাতে মুরলী মুখখানি তুলে ধরল মঙ্গলার। হাতের তলে ঢাকা রইল খানিক আগের খুশিতে উজ্জ্বল সেই টোল পড়া দুটি গাল।

চমকে মঙ্গলা ঈষৎ আর্তনাদ ক'রে উঠল, 'পায়ে পড়ি, পায়ে পড়ি তোমার, আমায় ছেড়ে দাও, ও গো আজ নয়, আজ নয়।'

মুরলী থমকে দাঁড়াল—বলল, 'কেন'?

মঙ্গলা বলল, 'আজ যে রক্ষাচণ্ডীর পূজা—'

মুরলী আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল তার মুখ, সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মঙ্গলার, লালপেড়ে গরদের শাড়িতে মঙ্গলাকে দেবী-মন্দিরের পূজারিনীর মতই মনে হচ্ছে বটে।

কোন দিন এমন হয়নি মুরলীর। এত সান্নিধ্যে এসে কোন মেয়ে

তার কাছ থেকে ছাড়া পায়নি। কিন্তু মঙ্গলা পেল। রক্ষাচণ্ডীর দোহাই পেড়ে নয়, ওসব মুরলী গ্রাহ্য করে না, কিন্তু মঙ্গলার ভয়, তার কাতর অনুনয়কে কি গ্রাহ্য না করলে চলে? গাব আর চোখউদানি গাছের পাতলা জঙ্গল পার হ'তে হ'তে মুরলীর দুই কান ভ'রে যেন তখনো বাজতে লাগল, 'আজ নয়—আজ নয়'।

কিন্তু আশ্চর্য, এই নিষেধে মুরলীর মন ক্ষোভে আর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ল না, মঙ্গলার নিষেধ মধুর সঙ্গীতের মতই মুরলীর মনের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল। আজকের এই নিষেধে যেন কেবল নিষেধই নেই, আর একদিনের আবাহনের গুঞ্জনও রয়েছে।

১৩

যথারীতি সমারোহের সঙ্গে ঘাটের শীতলা রক্ষাচণ্ডীর পূজা শেষ হোল। পাড়ার ছেলে বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সবাই ঘাটের চটানে বসে কলার পাতায় পেট পুরে প্রসাদ খেলে। পুরোহিত প্রচুর দক্ষিণা পেয়ে প্রসন্ন মনে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'মা এবার ঠাণ্ডা হবেন। আর কোন ভয় নেই।'

সমস্ত রাতটা অদ্ভুত এক অবস্থার মধ্যে কাটল মঙ্গলার। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলোনা। চোখ বুজলেই মুরলীর সেই মুগ্ধ দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখতে পায়। সে দৃষ্টিতে সমস্ত শরীর মঙ্গলার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এই শিহরণের মধ্যে আনন্দ আর আতঙ্কের অনুভূতি যেন মেশামেশি করে রয়েছে।

পাশে শুয়ে সুবল দু' একবার বলল, 'হয়েছে কি, অমন করছিস কেন? শরীর কি খারাপ লাগছে?'

মঙ্গলা বলল 'না'।

সুবল পাশ ফিরল।

পাতলা তন্দ্রার মধ্যে মঙ্গলার মনে হোল ছ' খানা হাতে কে যেন তার মুখখানাকে আবার তুলে ধরছে। মঙ্গলা গালে হাত বুলাল। মুরলীর আঙুলগুলির স্পর্শ এখনো যেন লেগে রয়েছে।

মঙ্গলার মনে পড়তে লাগল, এর আগেও অনেকদিন মুরলীর এই দৃষ্টি সে লক্ষ্য করেছে। কথা বলতে বলতে অনেকবার অপলকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুরলী। হাসি তামাসাচ্ছলে সে এর আগেও কতবার মঙ্গলাকে স্পর্শ করতে গেছে। কিন্তু মঙ্গলা তার মতলব বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে, কিছুতেই ধরা দেয়নি। পাড়ায় মুরলীর অখ্যাতি, বয়স নির্বিশেষে, রূপগুণ নির্বিশেষে সমস্ত মেয়ে সম্বন্ধেই তার অস্বাভাবিক লুব্ধতা মঙ্গলার মনে তার সম্বন্ধে তেমন কোন মোহের সঞ্চার করতে দেয়নি, বরং এক ধরনের ঘৃণা আর অবজ্ঞার ভাবই এনেছে। কিন্তু মুরলীর আজকের কামনার এই উগ্রতা অভূতপূর্ব। এই উন্মাদনার তীব্র আবেগে মুরলীর সমস্ত কলঙ্ক যেন আগুন হয়ে জ্বলে উঠেছে। আর সেই অগ্নিময় উত্তাপ মঙ্গলার শরীরের সমস্ত রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন সঞ্চারিত হয়ে গেছে। মুরলীর চরিত্রে যে কোন নিষ্ঠা নেই, প্রশংসনীয় কোন রকম গুণই যে তার মধ্যে নেই, তাকে যে বিশ্বাস করা চলে না, মুহূর্তের জন্যও যে তার উপর নির্ভর করা চলেনা, এসব কথা এসব বিবেচনা সেই উত্তাপে জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। নিজের দেহ মনকে একান্ত করে সেই উগ্র কামনার কুণ্ডে সঁপে দেওয়ার কল্পনা রাত্রির অন্ধকারে বার বার মঙ্গলার মনে আসতে লাগল আর বার বার নিজের মনকে সে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'ছিঃ'! কিন্তু ধমকটা যেন তেমন জোর শোনালনা; তার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়টাই যেন মনের মধ্যে বার বার উঁকি দিতে লাগল। আর এই লুকোচুরি সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করতে লাগল মঙ্গলা। আর্তনাদে অনুনয়ে আজ যদি অমন করে মুরলীকে বাধা না দিত

মঙ্গলা তাহ'লে কি হোত, তাহ'লে কিইবা হোত না! কল্পনা ক'রে মঙ্গলা আর একবার শিউরে উঠল।

অন্তদিনের মতই খুব ভোরে ঘুম ভাঙল মঙ্গলার। ঘরের মধ্যে তখন পাতলা অন্ধকার। আবছা আবছা দেখা যায় সুবলের মুখ। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস আসছে। শিকের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলার নিজের হাতে বাঁধা লাউয়ের মাচা, পাতাগুলির বড় বড় ডগাগুলি মোটা মোটা, ছোট বড় নানা আকারের লাউ নিচে ঝুলে পড়েছে।

ঘরের এদিকটায় আগে জানালা ছিলনা। সুবল নিজেই করাত দিয়ে বেড়া কেটে এখানে জানালা ক'রে দিয়েছে। মঙ্গলার ঠিক শিয়রের কাছটায়। হাতুড়ী বাঁটালি দিয়ে ঠুকঠুক করে নিজেই বানিয়েছে কাঠের ছুটো পাল্লা। সুবল না জানে এমন কাজ নেই। ঘুমন্ত সুবলের দিকে একবার তাকাল মঙ্গলা। অমন যে জবরদস্ত পুরুষ সেও কেমন শিশুর মত কোলকুঁজো হয়ে ঘুমাচ্ছে দেখ। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ ভারি মায়া হোল, ভারি আপন বলে মনে হোল মঙ্গলার। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল কালকের নির্লজ্জ ছুপুর আর সেই ছুপুরকে ঘিরে ঘিরে রাত্রির গভীর অন্ধকারে নিজের অশোভন অসম্ভব যত কামনা কল্পনার কথা। সমস্ত মন মঙ্গলার ছি ছি করে উঠল। ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শুয়ে কি বাজে চিন্তায়, কি পাপ চিন্তায়ই না তার কেটেছে। ছি ছি ছি! পাশ ফিরে স্বামীকে সে আলগোছে একটু জড়িয়ে ধরল। পাতলা অন্ধকারে সব যে দেখা যাচ্ছে। দেখবার আর কেউ নেই, এমন কি সুবল নিজেই চোখ বুজে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু নিজের চোখ তো চেয়ে রয়েছে। মঙ্গলার লজ্জাটা যে সেই ছুটো পোড়া চোখের কাছেই বেশি।

কিন্তু আলগা আলিঙ্গনের চেয়ে ভোর ভোর সময়কার পাতলা তন্দ্রা

টুকুর উপর সুবলের আসক্তি বেশি ; সেই তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভিতর থেকেই সুবল বলল, 'আঃ ! এখন ওঠ মঙ্গলা, ভোর হয়ে গেছে। কি যেন বলে, কাল গেলে মাংটামি সার। রাত কাটালি মড়ার মত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এখন সকাল বেলায় সোহাগের ঘটাখানা দেখ। একবার ওঠ দেখি লক্ষ্মী, উঠে ভালো করে এক ছিলিম তামাক ভরে নিয়ে আয় দেখি।' ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তামাক খাওয়া সুবলের সবচেয়ে বড় নবাবী। আর সে তামাক বউয়ের হাতের ভরা না হলে তার মন ওঠে না।

অন্যদিন মঙ্গলা মুখে আগে নানা ওজরআপত্তি জানায়। বলে, 'আমি কি দাসী বাঁদী, আমি কি ঝি চাকর যে সকালবেলায় সব কাজ ফেলে তোমার তামাক সাজতে শুরু করব। সারা দিন এই তামাকের বিশ্রী গন্ধ আমার হাত থেকে যায় না। পারবনা আমি, দরকার থাকে নিজে খাও গিয়ে সেজে।'

কিন্তু আজ আর কোন কথা বললনা মঙ্গলা। কোন বাদ প্রতিবাদ করলনা। একেবারে লক্ষ্মী বউয়ের মতই বিনা বাক্যে উঠল বিছানা থেকে, তারপর চলল তামাক সাজবার আয়োজনে।

হুঁকো কলকে, তামাকের টিকা, আগুন-মালসা সব শোবার ঘরের এককোনে সাজানোই থাকে। সন্ধ্যার সময়ই এসব ঠিকঠাক করে রাখে মঙ্গলা। রাত্রে প্রায় রোজই সুবলের একবার তামাক খাওয়া চাই।

কলকেতে তামাক ভ'রে আগুন-মালসা থেকে চিমটে দিয়ে আগুন তুলতে গিয়ে মঙ্গলা দেখল মালসা যেন একেবারে জল হয়ে গেছে, একটুও আগুন নেই তাতে। আগুন করবার উপায় আছে আরো। শুকনো নারকেলের ছোবড়া থেকে চিলতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে তাতে দিয়াশলাইর কাঠি ধরিয়ে দিলেই হবে। নারকেলের ছোবড়াগুলি আছে বারান্দায় একটি ঝাঁকার মধ্যে।

কিন্তু ছোবড়া আনবার জন্য দোর খুলে বেরিয়ে বারাণ্ডায় কেবল পা দিয়েছে এমন সময় মঙ্গলা দেখতে পেল, বিনোদের মা সৌদামিনা প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে।

মঙ্গলার হাতের কলকে হাতেই রইল, বলল, 'ব্যাপাব কি খুড়িমা ?'

সৌদামিনী বলল, 'আর ব্যাপার। সব শেষ হয়ে গেল বউ।'

মঙ্গলার বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল, বলল, 'কার কি হোল ? একবার ছাই খুলেই বলুন না।'

সৌদামিনী বলল, 'মুকুন্দের ছেলের কথাই বলছি। ভোর ভোর সময় শেষ হয়ে গেল। এদিকে মা'টা তো একেবারে বেহুঁস।'

খবর শুনে মঙ্গলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। নিমাই মারা গেল ! মনে পড়ল কাল বিকালে তাকে মঙ্গলার দেখে আসবার কথা ছিল ; আর সেই বিকালটা সে কি করে কাটিয়েছে। ছি ছি ছি। ধিক্কাব আর আত্মগ্লানিতে মঙ্গলার অন্তর ভ'রে উঠল। মনে পড়ল মঙ্গলার, নিমাই তাকে রক্ষাচণ্ডীর মূর্তিতে স্বপ্ন দেখেছিল, এমন কি নিমাইর ঠাকুরমাবও একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, সতীসাধ্বী মঙ্গলা দেবী রক্ষাচণ্ডীরই প্রতিনিধি। এই নিয়ে মুরলীর স্ত্রী মনোরমা অবশ্য শ্লেষ আর ব্যঙ্গেব হাসি হেসেছিল। আজ তার সেই উপহাসটাই সত্য হয়ে দাঁড়াল। নিমাইর শ্রদ্ধা আর তার ঠাকুরমার বিশ্বাসের মর্যাদা মঙ্গলা রাখতে পারল না। মঙ্গলার মনে হতে লাগল, নিমাইর যে এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হোল এ কেবল তারই পাপে, আর কিছুর জন্য নয় আত্ম নিবেদনের জন্য সে অবশ্য মুরলীর কাছে নিজে এগিয়ে যায়নি, কিন্তু মুরলীকে সে তেমন করে বাধাও ত দেয়নি। সে নিন্দা করেনি, তিরস্কার করেনি তার এই অশোভন, অন্যায় আচরণের। বরং রাত্রির অন্ধকারে মঙ্গলা তার সঙ্গ মনে মনে উপভোগ করেছে। নিজের

মনের কাছে তো কোন পাপ গোপন নেই মঙ্গলার। আজ এই দিনের আলোয় রাত্রির সেই মত্ততার কথা মনে করে লজ্জা আর গ্লানির সীমা রইল না মঙ্গলার।

নারকেলের ছোবড়ার ভিতরের আঁশ চিলতে কবে সযত্নে দু'হাতের তালুতে গুলি পাকাল মঙ্গলা। আগুন ধরাল দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে, তারপর তামাকভরা কল্কের উপর সেই জ্বলন্ত ছোবড়ার গুলি রেখে চিমটের মাথা দিয়ে ভেঙে তাকে গুঁড়ো করে দিল। হুঁকোটা স্বামীর হাতে দিয়ে মঙ্গলা বলল, 'তুমি ততক্ষণ তামাক খাও, আমি একটু নিমাইদের বাড়ি থেকে আসি।'

নিমাইদেব বাড়ি বলতেই মঙ্গলার বুকের ভিতরটা যেন ধক্ করে উঠল। নিমাইদেরই বাড়ি, কিন্তু নিমাই আর নেই। সুবল বলল, 'এই সাত সকালে পাড়া বেড়ানোর এত সখ কেন?'

বেশ একটু চেষ্টা ক'রেই মেজাজটা মঙ্গলা চড়তে দিল না। ক্ষণিকের জন্য অনুশোচনাটা বোধ হয় মনের মধ্যে তখনো ছিল।

মঙ্গলা বলল, 'পাড়া বেড়ানো নয় গো। নিমাই আজ ভোরের সময় মারা গেছে, তার মা রয়েছে বেহুঁস হয়ে। ওবাড়ির বিনোদ ঠাকুর-পোর মা এসে বলে গেলেন। আমাকে এখন একটু যেতেই হবে। ভয় নেই বেশী দেরী হবে না। তোমার তামাক খাওয়া শেষ হ'তে না হতেই আমি ফিরব।'

বলে মঙ্গলা আর দাঁড়াল না।

পথে আকস্মিক ভাবে দেখা হয়ে গেল বিনোদের সঙ্গে। বাঁশ ঝাঁড়ের কাছটায় আর একটু হ'লে তারা একেবারে একজন আর এক জনের গায়ের ওপর পড়ে গিয়েছিল আর কি। অন্য মনস্কের মত বিনোদ ছুটছিল হন হন করে। খাটো ঘোমটায় মুখ ঢেকে মঙ্গলাও প্রায় চলছিল পুরুষের বেগে, কাছাকাছি এসে দু'জনেই থমকে দাঁড়াল।

অপ্রতিভ হয়ে বিনোদ বলল, 'মাফ কর বউঠান, আমি আগে দেখতে পাইনি।'

মঙ্গলা একবার ভাবল কিছু না বলেই সে চলে যায়। বিনোদের সঙ্গে সে কোনদিন সামনাসামনি কথা বলেনা, কিন্তু আজ হঠাৎ কি খেয়াল গেল কথা বলতে।'

মৃদুস্বরে মঙ্গলা বলল, 'মাফ করবার কি আছে। আমিও ত ঠিক পথ দেখে চলছিলাম না, কিন্তু এখনই গাঁয়ে ফিরলেন যে!'

মঙ্গলার কথা বলায় কম বিস্মিত হয়নি বিনোদ, কিন্তু কথার ধরণে আরও বেশি বিস্মিত হোল, বলল, 'কেন, গাঁয়ে ফিরব না কেন?'

মঙ্গলা বলল, 'গাঁ থেকে রোগব্যামো যে এখনো যায়নি বরং আরও বাড়ছে।'

বিনোদ এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'কে বলেছে আপনাকে যে রোগব্যামোর ভয়ে আমি গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম।'

বিনোদের গলার স্বরে কেমন যেন একটা বিস্ময় আর বেদনার আভাস ফুটে বেরোল। তাতে আরও যেন কিছু কৌতুক বোধ করল মঙ্গলা, মৃদু কিন্তু পরিহাস তরল কণ্ঠে জবাব দিল, 'ও! লোকে যা বলাবলি করেছিল তা হলে তা নয়?'

বিনোদ বলল, 'লোকে বলাবলি করছিল বলেই আপনি বিশ্বাস করলেন! আমি গিয়েছিলাম কীর্তনের দল আনতে, ভেবেছিলাম নগরকীর্তনে বেরোব। কিন্তু এখানকার অসুখের খবর যেন কি ক'রে এর আগেই পৌছে গেছে সেখানে, কেউ আসতে চাইল না বউঠান। কেবল ওজরআপত্তি আর অছিলা-অজুহাত। আগের মত কারোই আর মনের জোর নেই বউঠান, ভগবানের নামের কাছে যে এই সব রোগব্যাধি টিঁকতে পারেনা এ বিশ্বাস আর নেই মানুষের মনে।

সেই জন্যই তো রোগশোক দুঃখদুর্দশা মানুষকে বেড়াজালে এমন ক'রে ঘিরে ধরেছে চার পাশ থেকে।'

বিনোদের গভীর বিশ্বাস আর গভীরতর বেদনাবোধে টলে উঠল মঙ্গলার মন। দুটো চোখ ছল ছল ক'রে উঠল, কিন্তু জবাব দিল সে তেমনি তরল স্বরেই, বলল, 'আমিও তাই বলি ঠাকুরপো। সেদিন যখন আর নেইই তখন তার জন্য হায় আপশোষ ক'রে আর লাভ কি? তার চেয়ে আপনিও এদিনের মানুষ হয়ে পড়ুন চট্ করে।' ব'লে মঙ্গলা হাঁটতে শুরু করল।

বিনোদ কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আর পাঁচজনের মত মঙ্গলাও কি ঠাট্টা করে গেল বিনোদকে! কিন্তু ঠাট্টা হলেও আর পাঁচজনের ভঙ্গির সঙ্গে মঙ্গলার বলবার ভঙ্গির মিল নেই, তার কথার মধ্যে অনেক মাধুর্য আছে, আছে অনেকখানি আপন আপন ভাব। এমন ঠাট্টা বা এমন গঞ্জনা কেবল একজনের মুখেই শুনেছে বিনোদ। মৃত স্ত্রী মালতীর মুখে। অনেক কাল বাদে তার কথা মনে পড়ে বুকের ভিতরটা টন টন করে উঠল বিনোদের। কিন্তু চেষ্টা করেও মালতীর মুখের আদলটা বিনোদ আর মনে আনতে পারলনা, কেবল ছাঁদ আসতে লাগল সেখানে মঙ্গলার মুখের। মঙ্গলা বলেছে বিনোদকে, এ দিনের মানুষ হয়ে পড়ুন চট্ করে। কথাটার মানে কি মঙ্গলার? তবে কি সত্যিই একালের এদিনের মানুষ নয় বিনোদ, মঙ্গলার কালের মঙ্গলার দিনের, মঙ্গলার পছন্দের মানুষ নয়? কথাটার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বিনোদের অদ্ভুতভাবে মনে পড়ে গেল মঙ্গলা আজ তার সঙ্গে প্রথম কথা বলেছে। বিনোদ যেদিনের মানুষই হোক তার সঙ্গে মঙ্গলার আজ এই প্রথম কথা বলার দিন।

নিমাইদের বাড়িতে কাঁদছে কেবল নিমাইর ঠাকুরমা। নিমাইর

মা মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে এক পাশে। সে দিকে ফিরে ও কেউ তাকাচ্ছেনা। বিষ্টু সা মাঝে মাঝে কোঁচাব খুঁটে চোখ মুছছে আর বসে বসে তামাক টানছে। কিন্তু এত বড ঘটনাতেও নিমাইর বাবা মুকুন্দের কোন ভাববৈলক্ষণ্য ঘটেনি। খাটো ঘোমটার ফাঁকে একবার তার মুখের দিকে তাকাল মঙ্গলা। ঠাণ্ডা, কালো পাথরের মতই ঠাণ্ডা আর স্তব্ধ মুকুন্দের মুখ! যেন কিছুই ঘটেনি, যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। অথচ গত বছরের আগের বছর একটি মেয়ে মারা যাওয়ায় এই মানুষটিই কেঁদে একেবারে ভাসিয়ে দিযেছিল। দাপাদাপি ধূলোয় গডাগড়ি কবেছিল ঠিক মেয়েমানুষের মত।

মঙ্গলা গিয়ে ঢুকল মুকুন্দের ঘরের মধ্যে। যেখানে নিমাইর মা রয়েছে সংজ্ঞাহীন হয়ে। পাড়ার আরও দু' চাব জন বয়স্কা গিন্নীবান্নির দল সেখানে এসে জড়ো হয়েছে।

মঙ্গলাকে দেখে নিমাইর ঠাকুরমা আর একবার তারস্বরে কেঁদে উঠল, 'আর কি দেখতে এসেছ মা, নিমাই আমার চলে গিয়েছে। বড় ভালোবাসত নিমাই তোমাকে, বড় আদরেব ছেলে ছিল নিমাই তোমার মা।'

মঙ্গলা আর্দ্রকণ্ঠে বলল, 'অমন কববেননা খুড়িমা। এবার বউকে দেখুন।' বলে জলেব ঝাপটার বাতাসে নিমাইর মার জ্ঞান ফিরাবার জন্য চেষ্টা শুরু করল মঙ্গলা।

নিমাইর ঠাকুরমা বলল, 'তুমিই দেখ মা, তুমিই দেখ। হতভাগীকে ডেকে তোল, জাগাও হতভাগীকে। চোখ মেলে চেয়ে দেখুক, কে ওর ছেলেকে কেড়ে নিয়ে গেল। পারে যদি ধরুক টেনে হতচ্ছাড়া মুখপোড়া সেই যমকে। শেষে মানুষ কে যে দুষবে তা কিন্তু পারবেনা, তা কিন্তু পারবেনা।'

নিমাইকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আয়োজন হতে লাগল। জন

কয়েকে মিলে একটি ছোট মত আম গাছ পেড়ে ফেলেছে মাটিতে। গামছা মাজায় বেঁধে কুড়ুল দিয়ে চেলা করছে তা। ঠক ঠক শব্দ ভেসে আসছে ঘরের মধ্যে। আসছে তাদের বিড়ি-তামাক চাইবার তাগিদ। তাদের মধ্যে সুবলেরও গলার সাড়া পেল মঙ্গলা, এতক্ষণে সেও এসে পৌঁচেছে। কার হাতের কুড়ুল কেড়ে নিয়ে সুবল বলছে 'দে, আমার কাছে দে কুড়ুল। ওই ভাবে কুড়ুল ধরলে তাতে পা কাটে, কাঠ কাটেনা'।

নিঃশব্দে শ্মশানযাত্রীদের ফাইফরমাশ খাটছে মুকুন্দ। এগিয়ে দিচ্ছে আগুন, তামাক, দা কুড়ুল; দড়ি পাকাবার জন্ম ঘরের ভিতর থেকে একসময় পাট নিয়ে গেল এক গোছা। মঙ্গলা মনে মনে ভাবল, অদ্ভুত মানুষ! একমাত্র ছেলে চলে গেল, বউটা এমন মর মর ঘরের মধ্যে, কিন্তু কোন শব্দ নেই মুখে, এককোঁটা জল নেই চোখের কোনে! একেক পুরুষ একেক রকম। কিন্তু সব পুরুষই কোননা কোন রকমে রহস্যময়। সুবল, মুরলী, বিনোদ, মুকুন্দ কত যে বিচিত্র রকমের মানুষ আছে এই পাড়াটুকুর মধ্যে তার ঠিক নেই। কারোরই যেন তল নেই কোন। জানালার নিচে ঢালু জায়গাটা এখন শুকনো খট্ খট্ করছে, ভরা বর্ষার সময় একদিন ওখানেই থৈ মিলবেনা।

১৪

কিন্তু মানুষের মনের শ্মশানবৈরাগ্য আর দেহের রোগব্যাধি চিরদিন থাকবার জন্ম নয়। ভুগে ভুগে কেউ মরে, কেউ ফের তাজা হয়ে ওঠে। হাড়ে মাংস গজায়, ভাঙ্গা চোয়াল ভরে ওঠে, তারপর সেই ভরাপুরো মুখের উপর চিক্ চিক করতে থাকে লাবণ্য। মনের শ্মশানেও চিতা নেভে, বাতাসে উড়তে থাকে ভস্মের রাশ, শেষে একসময় কোথায় উধাও হয়ে যায়। তারপর সেই চিতার এক এক

কোণে অলক্ষ্যে গজিয়ে ওঠে তুলসীর চারা, সবুজ শ্যামল পাতার ভিতর থেকে ছড়ায় ছড়ায় বেরোতে থাকে তুলসী মঞ্জরী।

সাহাপাড়ার মারী বসন্তও মাস খানেক যেতে না যেতেই প্রশমিত হয়ে এল। নিমাইর মত আরো কেউ কেউ মরল, তার মার মত ভুগে উঠল আরো অনেকে, হাতে পায়ে নাকে মুখে গভীর ক্ষতগুলি ভরে উঠতে লাগল, সেই সঙ্গে শুকিয়ে আসতে লাগল শোকের অশ্রু, নিভে আসতে লাগল হৃদয়ের জ্বালা।

শুকাবার লক্ষণ দেখা গেল না কেবল আলতার। মারাত্মক বসন্তে অনেকদিন ভুগে ভুগে যদি বা সে বেঁচে উঠল, সারা মুখের ক্ষত চিহ্নগুলি তার চেহারাকে আরও বিকৃত এবং কুশ্রী করে তুলল। তার চোখ বেয়ে সেই যে জলের ধারা নামল, দিনেরাতে তার আর বিরাম রইলনা।

বাল বিধবা আলতার রূপ অবশ্য কোন দিনই ছিলনা, এমন কি রূপের প্রয়োজন তার যে আছে কি থাকতে পারে একথাও কোনদিন কারো মনে হয়নি। যারা বুড়ো আর হিসেবী তারা বরং বিধবা আলতার এই কুরূপে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। রূপের অভাবটা তার নিজের পক্ষেও ভালো, পাড়ার সব ছেলেছোকরার পক্ষেও কল্যাণকর। যে রূপের নির্দিষ্ট শাস্ত্রসঙ্গত কোন ভোক্তা রইল না, অশাস্ত্রীয় কাজে প্রলুব্ধ করবার জন্য সে রূপেরই বা থেকে দরকার কি। সে রূপ চিতার আগুনে ঝল্‌সে দিতে পারলেই সকলের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

তবু বুড়োদের হিসাব ঠিক মিললনা। রূপ না থাকা সত্ত্বেও পাড়ার কিশোর বয়সী কৌতুহলী ছেলেদের আলতা যে-কোন রূপবতীর মতই তার চারপাশে আকর্ষণ করতে লাগল। তাদের কাছে রূপটা বাহুল্য, রহস্যটাই বড়। প্রথম বিড়ি খাওয়ার অভিজ্ঞতাটি কোন

ছেলের পক্ষেই খুব প্রীতিকর নয়। গন্ধে নাক সিঁটকে আসে, কাসতে কাসতে বমি আসবার জো হয়, চোখ দিয়ে বেরোয় জল। তবু বিড়ি তাদের আকর্ষণ করে। প্রীতির জন্য নয়, সুখের জন্য নয়, সেই অদ্ভুত অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে যে অভিনব অনাস্বাদিত রস আর রহস্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার জন্যই।

নারীহৃদয়ের, নারীদেহের অজ্ঞাত রহস্যের হাতছানি দিয়ে আলতাও তাদের অনেককে কাছে ডেকে আনল। রসোপভোগের হাতেখড়ি হোল বহু কিশোরের, বহু যুবকেব। বৃদ্ধেরা প্রমাদ গণল। শাসন তিরস্কারের ধারা বইল বহুমুখী হয়ে। এর জন্য আলতাকেও মাঝে মাঝে কম বিপদ কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি। প্রথম প্রথম প্রায়ই এদিক ওদিক তাকে গা ঢাকা দিতে হোত। তারপর একদিন সবই শান্ত হয়ে এল। সয়ে গেল, হজম হয়ে গেল সব। পাড়ার লোকের কৌতূহলী দৃষ্টি পাত্রান্তরে গিয়ে পড়ল। আলতার প্রণয়ীর দল ছেলেপুলে নিয়ে হয়ে উঠল সংসারী। সুখদুঃখে মিশানো সেই স্মৃতি রইল কেবল আলতার।

সেই রহস্যের টানে এপাড়ার অনেকেই এসেছিল আলতার কাছে। একমাত্র বিনোদকেই আলতা টেনে আনতে পারেনি। বোকা বিনোদ, ভালো মানুষ বিনোদ, কীর্তনীয়া, বাউল বৈরাগীর মত উদাসীন বিনোদ অন্য সকলের কাছেই উপেক্ষিত হয়েছে, কিন্তু আলতার চোখে সে রয়েছে কিন্নরের মত। কতবার ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হয়েছে সেই রূপের সমুদ্রে, দুই হাতে আঁজলায় আঁজলায় যদি মুখে তোলা যেত তাহ'লে বিনোদের সেই তরল লাবণ্যের ধারা যেন আকণ্ঠ পান করত আলতা। কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরাছোঁয়া যায়নি। কোন রকম রঙ্গ রসিকতার ইঙ্গিতে বিনোদের চোখ ভৎর্সনায় তিরস্কারে বিরূপ হয়ে উঠেছে। ক্রমেই দূরে সরে গেছে বিনোদ। আলতা আহত হয়ে, বিস্মিত হয়ে

ভেবেছে অঙ্গে অঙ্গে যার এত রূপ, কণ্ঠে যার এত মাধুর্য, হৃদয় তার এমন পাষাণ, এমন নীরস হোল কেন।

আলতার এই দুর্বিপাকে মনে মনে মঙ্গলা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল, কিন্তু তার শোকের তীব্রতা দেখে সে স্তব্ধ হয়ে রইল। এত কথা বলতে পারে মঙ্গলা, কিন্তু আলতাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কোন কথাই যেন তার মুখে এলনা। এবারকার বসন্তে মুকুন্দের ছেলে মরেছে, চার বছরের একটি মেয়ে গেছে ফটিকের, স্বামী মরেছে ওপাড়ার খোঁড়া সোহাগীর, কিন্তু আলতার ভাবখানা দেখে মনে হোল যেন সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তারই। বিকৃত বিরূপ হয়ে বেঁচে থাকার মত এমন শাস্তি এমন দুঃখ যেন আর কিছুতে নেই।

আলতার মুখোমুখি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল মঙ্গলা। তারপর বলল, 'তবু তো বেঁচে উঠেছ ঠাকুরঝি।'

আলতা বলল, 'তুমি আমায় ঠাট্টা করছ বউদি-। এই প্রাণের কোন দাম আছে? লাভ আছে কোন এই রকম বেঁচে থাকাব?

মঙ্গলা বলল, 'কেন লাভই বা থাকবে না কেন! খাওয়াপরা দেখাশোনা কিছুই তো তোমার আটকাচ্ছেনা।'

আলতা বলল, 'কিন্তু আমার দিকে মানুষ যে আর তাকাবেনা, ভয়ে আর ঘেন্নায় আমার মুখের ওপর থেকে তারা যে চোখ ফিরিয়ে নেবে।'

মঙ্গলা বলল, 'তুমি অবাক করলে ঠাকুরঝি। নিজের ক্ষতির চেয়ে আর কেউ যে চোখ তুলে তোমার দিকে তাকাবেনা এই দুঃখই তোমার মনে এত বড় হয়ে উঠল।'

আলতা এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল, তারপর বলল, 'মুখের দিকে মানুষের না তাকাবার দুঃখ তুমি বুঝতে পারবে না বউদি। নিজের তোমার রূপ আছে কি না। পাড়া ভ'রে মানুষ নানা ছলে ঘোমটার

ভিতরে তোমার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে কিনা, তাই এ দুঃখের কথা তুমি ভাবতেও পার না। নিজের চোখমুখ তো মানুষ নিজে দেখতে পায় না, সেই চোখমুখের দিকে অন্যে যখন তাকায়, অন্যে যখন চেয়ে দেখে তখনই তো খেয়াল হয়, হ্যাঁ চোখমুখ বলে একটা জিনিস আমার আছে। না হ'লে নিজের কথা, নিজের চোখ মুখের কথা মানুষের কত সময় মনে থাকে বউদি। গা-ভরা তোমার রূপ তাই মানুষের রূপ না থাকার দুঃখে তোমার হাসি পেতে পারে. কিন্তু ভগবান না করুন, এই রূপ যদি কোনদিন যায়, এই রূপ যদি হঠাৎ এক দিন খোয়াতে হয়, তাহ'লে সেইদিন আমার দুঃখ বুঝতে পারবে, মানে বুঝতে পারবে আমার কথার।'

শুনতে শুনতে গায়ের মধ্যে শির্ শির্ ক'রে উঠল মঙ্গলার। এমন ক'রে আলতাকে কথা বলতে সে কোন দিন শোনেনি। অবশ্য নিজের রূপ না থাকায় দুঃখ এর আগেও সে অনেকবার অনেক দিন জানিয়েছে, মঙ্গলার রূপ থাকা নিয়ে ঈর্ষাও নানা ঢঙে নানা ভঙ্গিতে আলতা না করেছে এমন নয়। কিন্তু আজকের মত এমন গভীর স্বরে, অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আলতা যেন কোন দিন কথা বলে ওঠেনি। সেই চটুল প্রগল্‌ভ হালকা স্বভাবের মানুষও যে এমন ক'রে কথা বলতে পারে, তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করত না মঙ্গলা, বিশ্বাস করত না নিজের চোখে না দেখলে।

আলতার রূপ হারাবার দুঃখ মঙ্গলাকে আজ তার নিজের সম্বন্ধে যেন হঠাৎ সচেতন ক'রে তুলল। মনের মধ্যে চিন্তিত ভাবে অদ্ভুত একটা অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল মঙ্গলা। ঘরের মধ্যে দক্ষিণ দিকে মাঝখানের খুঁটিটার পেরেকের সঙ্গে বড় একখানা হাতআয়না ঝুলান আছে মঙ্গলার, এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেয়ে এসে মঙ্গলা মাথা আঁচড়ায়, রোজ সিঁথিতে কপালে সিঁদুর পরে। ঘরে ঢুকেই

আয়নাখানা পেড়ে নিজের মুখের সামনে সেখানা মঙ্গলা তুলে ধরল। ভারি সুন্দর লাগল যেন আজ নিজের মুখকে, নতুন ক'রে চোখে পড়ল নিজের রূপ। সেবা শুশ্রূষার সময় কত বসন্ত রোগীকে ছুঁতে হয়েছে, নাড়াচাড়া ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে। ছোঁয়াচে রোগ তো, হঠাৎ তারও যদি হয়ে বসত, আর সেই রোগে আলতার মত নিজেরও চোখ মুখ যদি বিকৃত হয়ে যেত মঙ্গলার! কল্পনা করতেই ভয়ে চোখ যেন বুজে এল। তাহ'লে কি এমন ক'রে চোখের সামনে আয়নাখানা তুলে ধরতে পারত মঙ্গলা, পারত নিজের দিকে এমন ক'রে অপলকে তাকিয়ে থাকতে! নিজের রূপকে আজ হঠাৎ ভারি দামী, ভারি দুর্লভ বলে মনে হোল মঙ্গলার। যেন হাবাতে হারাতে তা হারায়নি, যেন এই দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য লোভনীয় সামগ্রীকে হারাতে হারাতে মঙ্গলা ফের ফিরে পেয়েছে।

একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ছাড়া চড়া রকমের সাজসজ্জার দিকে মঙ্গলার কোনদিন লক্ষ্য ছিল না। রূপ যে তার আছে এ তথ্য তার কাছে গোপন থাকবার কথা নয়, গোপন ছিল না, কিন্তু সে সম্বন্ধে এমন সচেতন ভাবও তার মনে কোন দিন আসেনি, যত্ন করেনি, সাজায়নি নিজের দেহকে যেন অত্যন্ত উদাস অমনোযোগের সঙ্গেই এতদিন বয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আজ নিজের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলার যেন নতুন ক'রে মনে হোল এ দেহ দুর্লভ, এই রূপ পরম আদরের, পরম উপভোগের সামগ্রী।

মনে পড়ল নিজের সম্বন্ধে সে যে নিজেই কেবল এতদিন উদাসীন ছিল তাই নয়, তার স্বামী সুবলও তাই। মঙ্গলার রূপ নিয়ে তাকেও কোনদিন উৎফুল্ল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখা যায়নি। মঙ্গলার যে রূপ আছে সেটা যেন তেমন কোন বিস্ময়ের বস্তু নয় সুবলের কাছে, গর্ব অহঙ্কারের বস্তু নয়। সেই রূপের দিকে না তাকালেও যেন চলে,

তার কথা কোনদিন একটু উল্লেখ না করলেও যেন কিছু এসে যায় না।

'মঙ্গল বউঠান!'

চমকে উঠে মঙ্গলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখা যায় লাউয়ের মাচা, ডান দিকের আগাছার ঝোপটা, জনমানুষ আর কিছু দেখা যায় না। এ গলা তো ভুলবার নয়, এ কণ্ঠে গায়ের সমস্ত রোমগুলি খাড়া হয়ে উঠল মঙ্গলার।

মুরলী ততক্ষণে বাইরে থেকে জানালার শিক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ফিস ফিস ক'রে আর একবার ডাকল মুরলী, 'মঙ্গল, মঙ্গল বউঠান।'

এক মুহূর্ত যেন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঙ্গলা। তারপর জানালার আরও কাছে এসে তেমনি ফিস ফিস ক'রে বলল, 'তোমার কি লজ্জা নেই মুরলী ঠাকুরপো!'

মুরলী বলল, 'না।'

মঙ্গলা বলল, 'কিন্তু ঘেন্নাপিত্তি, তাও কি সব ধুয়ে মুছে ফেলেছ! এত নিষেধ করেছি, এত বারণ করেছি তবু কি তুমি শুনবে না? আমার স্বামীর কাছে সব না বলা পর্যন্ত কিছুতেই কি থামবেনা তুমি? এত দিন তো বেশ চুপচাপ ছিলে, আজ আবার এমন মতি হোল কেন?'

মনে হোল মুরলী যেন একটু হাসল, 'এ মতি কেবল আজই নয় মঙ্গল বউঠান। এ মতি মন থেকে আমার একদিনও মিলায়নি। তারপরও রোজ আমি এসেছি।'

মঙ্গলা শিউরে উঠল, 'রোজ'!

মুরলী বলল, 'হ্যাঁ, রোজ। দিনে একবার না একবার পলকের জন্যও তোমাকে না দেখে গিয়ে আমি থাকতে পারিনি। তুমি চলেছ,

ফিরেছ, ঘর গুছিয়েছ, ঘাট থেকে কাঁখে করে জল ভরে নিয়ে এসেছ কলসীতে। ঝোপের আড়াল থেকে একেকদিন একেক ভঙ্গিতে তোমাকে দেখেছি। কিন্তু আয়নায় এতক্ষণ ধরে নিজের মুখ দেখতে কোন দিন দেখিনি। কি দেখলে নিজের মুখে?'

মঙ্গলার সমস্ত শরীর আবার যেন কাঁটা দিয়ে উঠল, একটু চুপ ক'রে থেকে মঙ্গলা বলল, 'তোমরা কি দেখ?'

মুরলী বলল, 'আমরা যা দেখি তা কেবল মুখে বললে ফুরোয় না মঙ্গল বউঠান, সর্ব অঙ্গ দিয়ে তা আমরা বলতে চাই।'

তারপর আস্তে আস্তে ঘরের কানাচ ঘুরে ভেজানো দোর ঠেলে প্রায় নিঃশব্দে কখন যে মুরলী তার পাশে এসে দাঁড়াল তা যেন মঙ্গলার খেয়ালই রইল না। মুরলীর সবল বাহু বেষ্টনীর মধ্যে মুহূর্তের জন্য একবার যেন অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল মঙ্গলা, কিন্তু সে স্বর তার কণ্ঠের মধ্যেই রুদ্ধ হয়ে রইল।

ঘরে ঘরে বাকি-বকেয়া আদায় ক'রে সওদাপত্র সেরে হাট থেকে ফিরতে বেশ একটু রাতই হোল সুবলের। মাছ আর তরকারির থলে হাতে নিয়ে একপাছা শুকনো পাঁকাটির মুখে আগুন জেলে সুবল নিজের বাড়ীর উঠানের উপর এসে দাঁড়াল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা সড়ক বেয়ে অন্য হাটুরেদের সঙ্গে বাজার দর আর পাড়ার হালচাল নিয়ে আলোচনা করতে করতে এতক্ষণ আঁধারে আঁধারেই এসেছে সুবল। কৃষ্ণ পক্ষের রাত হলেও তারার আলোয় বেশ পথ দেখা যায়, কিন্তু অসুবিধা হলো নিজেদের গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে। ঝোপঝাড় গাছপালায় মাথার উপরকার আকাশও দেখা যায় না, পায়ের নীচের মাটিও চোখে পড়েনা, তবু ছেলেবেলা থেকে এ পথ সকলেরই চেনা, একেবারে মুখস্থের মত হয়ে গেছে। উঁচু নিচু জায়গায় অভ্যস্ত পা আপনা থেকেই ওঠে নামে, চোখের সাহায্যের দরকার হয় না, কিন্তু ফটিকদের ঘরের

কাছে উঁচু একটা গাবের শিকড়ে বেশ বড় রকমেরই এক হোঁচট খেল সুবল। সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠল সে ফটিককে, 'বাড়ির পথঘাটটাও একটু পরিষ্কার রাখতে পারিস না ফটকে? দিনের পর দিন তোরা কি হয়ে উঠলি বল দেখি!'

ফটিক অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'রাস্তাটা সত্যিই ভারি খারাপ হয়েছে। একটা আলো এখান থেকে নিয়ে যাও সুবলদা।'

বাড়িতে ডেকে পাঁকাটি জেলে কেবল আলোর ব্যবস্থাই ক'রে দিল না ফটিক, তার আগে সযত্নে এক ছিলিম তামাক ভ'রেও খাওয়াল। সুবল খুসি হয়ে বলল, 'যাই এবার, বউটা একা একা রয়েছে।'

উঠানে উঠে জ্বলন্ত পাঁকাটির মুখটা মাটিতে চেপে ধরে আগুন নিভিয়ে ফেলল সুবল। তারপর ঘরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা অন্ধকার, ভিতর থেকে একটুও আলো আসছে না, ব্যাপার কি! এত সকাল সকাল ঘরে দোর দিয়ে শুয়ে পড়ল নাকি মঙ্গলা। এমন তো কোন দিনই হয়না, কি হোল আজ তার হঠাৎ।

পা টিপে টিপে অগত্যা সুবল দোরের সামনে এসে দাঁড়াল, 'কিরে, আজ সন্ধ্যা হতে না হতেই চোখে ঘুমের ঘোর নেমে এল না কি মঙ্গল বউ, ওঠ দোর খুলে দে।'

ঘরের ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না। বিরক্ত হয়ে দোরে একটা ধাক্কা দিতে গিয়ে পড়তে পড়তে সুবল সামলে নিল। দোরটা আলগোছে ভেজানো রয়েছে ভিতর থেকে, খিল দেওয়া নেই।

ঘরে ঢুকে নিজের পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে একটা কাঠি জ্বালল সুবল। তারপর মঙ্গলার ভাব দেখে চমকে উঠল, ম্লান আলোয় চোখে পড়ল বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে বিছানায় পড়ে রয়েছে মঙ্গলা, বেশবাস অ্যালু থালু, মাথায় আঁচল নেই, চুলের রাশ এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কাঠির আগুন যতক্ষণ না আঙুলে

এসে ছুঁল, তাপ লেগে উঠল আঙুলে, ততক্ষণ দুই আঙুলের মাঝখানে কাঠিটা ধরে রইল সুবল। অপলকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মঙ্গলার দিকে। তারপর কাঠিটা নিভে গিয়ে আবার অন্ধকার হয়ে গেল ঘর।

সুবল এবার উচ্চকণ্ঠে আদেশের সুরে ডাকল, 'মঙ্গলা।' শুয়ে শুয়ে মঙ্গলা সবই টের পাচ্ছিল। বাইরে থেকে তার নাম ধরে ডেকে সুবল ঘরে ঢুকল, দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে আলো জ্বালল, কিন্তু তবু উঠি উঠি করে উঠতে ইচ্ছা করল না মঙ্গলার। অদ্ভুত একটা অবসাদ আর আলস্যে সমস্ত অঙ্গ যেন শিথিল অবশ হয়ে এসেছে, কিছুতেই তারা যেন আর বশে আসবে না মঙ্গলার। কিন্তু সুবলের শেষ বারের ডাকে মঙ্গলা আর শুয়ে থাকতে পারল না, ধড়মড় ক'রে উঠে বসল।

সুবল বলল, 'সন্ধ্যার সময় এমন গা ছেড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলি যে! হয়েছে কি তোর, ঘরে আলো নেই, দোরটা খোলা, যদি চোরটোর কেউ ঢুকত ঘরে।'

মঙ্গলা কোন কথা বলল না, বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে নিঃশব্দে উঠে মাটির দীপটা জ্বালাল। কিন্তু সোজাসুজি স্বামীর মুখের দিকে আজ আর তাকাতে পারল না মঙ্গলা, জবাব দিল না তার কথার।

সুবল ছাড়ল না, বিরক্ত হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি হলো, কথা বলছিস না যে? ছুঁচ সুতা দিয়ে কেউ কি ঠোঁট দুটো সেলাই ক'রে রেখে গেছে নাকি তোর?'

মঙ্গলা মৃদু স্বরে বলল, 'শরীরটা ভালো নেই আজ।'

সুবল একটু অবাক হোল। শরীর ভালো না থাকার কথা মঙ্গলা সহজে বলে না। এমন কি জ্বর-জারি অসুখবিসুখ হোলেও মুখে কখনো বলে না মঙ্গলা যে দেহ তার খারাপ হয়েছে।

সুবল একটু নরম স্বরে বলল, 'শরীর ভালো না থাকার মত কি হোল আবার। তোদের মেয়ে মানুষের দেহ আর মেয়ে মানুষের মন এক আজব জিনিষ। সময় নাই, অসময় নাই, খারাপ হোলেই হোল।'

মঙ্গলা এ কথার ও জবাব দিল না। নিরুত্তরে মাটির দীপ থেকে কেরোসিনের ডিবাটা ধরিয়ে নিল, তারপর হাটের থলে হাতে ক'রে চলল রান্না ঘরের দিকে।

সুবল চটে উঠে বলল, 'এতখানি রাতের মধ্যে উনানও ধরাতে পারিসনি! শরীর এতই পচেগলে গেছে একেবারে? বেশ তাহলে ফের গিয়ে শুয়ে থাক তুই, রান্নার দরকার নেই আর, এখন হাঁড়ি চড়ালে তোর ভাত ফুটতে ফুটতে রাত ভোর হয়ে যাবে।'

মঙ্গলা ম্লান একটু হাসল, 'না গো না, রাতের এখনো অনেক বাকি, হাত মুখ ধুয়ে তোমার এক ছিলিম তামাক শেষ হ'তে না হ'তে ভাত তরকারি আমার নেমে যাবে, ভেবোনা।'

যেন অবুঝ ক্ষুধার্ত ছোট ছেলেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মঙ্গলা। তেমনি শান্ত আর স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ। কিন্তু সুবলের মনে হোল মঙ্গলার হাসিতে যেন তেমন ঔজ্জ্বল্য নেই, এ হাসি যেন সত্যিই কোন অসুস্থ মানুষের।

খানিক বাদে সুবল গিয়ে মঙ্গলার রান্না ঘরের সামনে দাঁড়াল। কড়াতে কি একটা তরকারি উঠিয়ে দিয়েছে মঙ্গলা।

সুবলের পায়ের শব্দে মঙ্গলা ফিরে তাকাল, কৈফিয়তের সুরে বলল, 'একটুখানি সবুর কর, বেশি দেরি নেই আর।'

সুবল বলল, 'তুই ভেবেছিস কি বল দেখি, আমি কি কচি ছেলে নাকি যে খিদেয় একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি।'

মঙ্গলা কোন জবাব দিলনা।

একটু চুপ করে থেকে সুবল বলল, 'কিন্তু শরীর যদি খারাপই

হয়েছিল এত রাতে ফের কষ্ট ক'রে এলি কেন রাঁধতে, একবেলা না হয় মুড়িচিঁড়ে খেয়েই থাকতাম, এত কষ্টের দরকার ছিল কি।'

মঙ্গলা কোন কথা বলল না। চোখ দুটো তার অকস্মাৎ ছল ছল ক'রে উঠল। সুবলের এত স্নেহের, এত বিশ্বাসের, এত ভালবাসার কোন মর্যাদাই আর সে রাখেনি।

অন্য দিনের মতই ঠাঁই ক'রে ভাত বেড়ে স্বামীকে মঙ্গলা খেতে দিল, কিন্তু অন্য দিনের মত প্রতি গ্রাসে আজ আর সে ফোঁড়ন কাটলনা, অভিযোগে, আক্রোশে, পরিহাসে মুহূর্তে মুহূর্তে রূপান্তর ঘটলনা অপরূপ আয়ত সুন্দর দুটি চোখের। আনত চোখ দুটি মাটির দিকেই সারাক্ষণ নিবদ্ধ হয়ে রইল।

খেতে খেতে সুবল বলল, 'রান্নার সময় বৈষম ভ'রে বুঝি নুন নিয়ে বসেছিলি আজ। সব তরকারিতে মুঠোয় মুঠোয় নুন দিয়েছিস ছড়িয়ে।'

মঙ্গলা চমকে উঠে অপরাধীর স্বরে বলল, 'পুড়ে গেছে বুঝি?'

সুবল রসিকতা করে বলল, 'না পুড়বে কেন, চমৎকার স্বাদ হয়েছে, ভেবেছিলি যত নুন খাওয়াবি তত গুণ গাইব।'

কিন্তু মঙ্গলার চোখের দিকে তাকিয়ে সুবলের হাসি থেমে গেল, বড় বড় চোখ দুটির কোলে অশ্রু টলটল করছে মঙ্গলার। গাল দুটিতে ভিজে দাগ এখনো লেগে রয়েছে জলের।

থমকে মুহূর্তকাল সুবল চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোর মঙ্গল বউ, সত্যি ক'রে বল দেখি। লুকোসনি কিন্তু আমার কাছে।'

মঙ্গলা মুখ নিচু করে জবাব দিল, 'কিছু হয়নি, তুমি খাও।'

কিন্তু হাতের গ্রাস মুখে না তুলে সেটিকে ফের আবার ভাতের থালার ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে সুবল জবাব দিল, 'কি ক'রে খাই

বল। নুনে পোড়া তরকারি এক আধদিন জিভে সয় বলে, তুই কি ভেবেছিস চোখের জলে নোন্‌তা ভাততরকারিও মানুষের মুখে রোচে ?'

পিঁড়ি থেকে সুবল তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেই মঙ্গলা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'উঠো না, মাথা খাও আমার, আমি আবার সব রেঁধে দিচ্ছি।'

সুবল বলল, 'কাজ কি অত কষ্টে। দেহ যখন সত্যিই তোর ভালো নেই মঙ্গলা, জোর ক'রে কেন এলি রাঁধতে। কিন্তু ভেবে অবাক হচ্ছি এই দণ্ডকয়েকের মধ্যে কি এমন মারাত্মক ব্যাধি তোর হোল যে বিছানা ছেড়ে তুই উঠতে পারিসনে, রাঁধতে বসলে চোখ দিয়ে তোর জল বেরোয় ঝর ঝর করে !'

জলের ঘটিটা তুলে নিয়ে আঁচাবার জন্ত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সুবল। খড়মের শব্দ খট্‌ খট্‌ করতে করতে লাউমাচা ছাড়িয়ে উঠানের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে থেমে গেল। স্বামীর অর্ধভুক্ত ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে মঙ্গলা বসে রইল স্তব্ধ হয়ে।

১৫

বসন্ত মারীর সময় পাড়ার অনেকদিনের বুড়ো নিধু সারও হঠাৎ মৃত্যু হোল। বসন্তে নয়, দু'দিনের জ্বর বিকারে। পাড়ার সবাই বলল 'ভালই হয়েছে, বেশিদিন ভুগতে হয়নি বুড়োকে, কষ্ট পেতে হয়নি বেশি।'

চার ছেলে, চার জনই পৃথগন্ন। বাড়ির সরিকানা নিয়ে ঝগড়া ঝাঁটি, মামলা মোকদ্দমাও মাঝে মাঝে হয়। বছরে তিন মাস ক'রে বুড়ো বাপ একেক ছেলের ঘরে খেয়েছে। ব্যাধির চিকিৎসা শুশ্রূষা

নিয়ে চার ভাই আর চার বউয়ের মধ্যে অনেকবার অনেক ঠেলাঠেলি হয়েছে। কিন্তু কোন ছেলের কোন খরচপত্র না ক'রে বুড়ো যখন এবার সত্যি সত্যি মরেই গেল, বড় ভাই কুঞ্জ অন্য সব ভাইদের ডেকে প্রস্তাব করল, 'এতকাল যা হয়েছে হয়েছে, বাবার শ্রাদ্ধটা আয় চার জনে মিলে মিশেই করি। বুড়োর মনের ইচ্ছাও ছিল তাই। অন্তত তাঁর শেষ কাজটায় যেন আমাদের মধ্যে কোন রেষারেষি ঠেলাঠেলি বিবাদ বিসংবাদ না হয়।' বলতে বলতে কুঞ্জর গলা ধ'রে এল।

ভাইরা পরস্পরের দিকে তাকাল। প্রত্যেকের হাতে একখানা ক'রে কুশাসন, পরনে তেউনি, গলায় একটা ক'রে ধরা। এতদিনে তারা যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করল তারা আপন চার ভাই, একই বাপমায়ের সন্তান। অকস্মাৎ একই অনুভূতিতে চার জনের চোখ ছল ছল ক'রে উঠল।

তিরিশ দিন অশৌচ পালনের পর শ্রাদ্ধ। উদ্যোগ আয়োজন গোড়া থেকেই শুরু হোল। চার ভাইকে এমন এক সঙ্গে চলা ফেরা কাজকর্ম করতে দেখে পাড়ার সবাই অবাক হয়ে গেল।

কিন্তু চার ভাই মিললে হবে কি, পাড়ার দলাদলিটা এই উপলক্ষে ফের মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। নবদ্বীপের দোকান ঘরে, বাড়ির বেড়াঘেরা বারণ্ডায় প্রায়ই ছোট ছোট বৈঠক বসতে লাগল। কুঞ্জদের চারভাইকে হাত করে সুবলের ছোট দলটিকে এবারো কিভাবে জব্দ করা যায়, হুঁকো টানতে টানতে নবদ্বীপ সে সম্বন্ধে মাথা খেলাতে লাগল।

সুবল মঙ্গলাকে বলল, 'দেখছিস বুড়োর কাণ্ড। তলে তলে কেবল আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা। কিন্তু আমিও একবার দেখে নেব। ওদের চেয়ে আমরা কুঞ্জদের আরো নিকট জ্ঞাতি। এখনো তিন পুরুষ

পার হয়নি। আমাকে বাদ দিয়ে কি ক'রে সে পারে একবার দেখব।' মঙ্গলা বলল, 'দল বল তো তোমারও আছে। এত ভয় কিসের ওদের।'

কিন্তু কথাটায় তেমন যেন জোর লাগল না। দলাদলিতে তেমন যেন উৎসাহ দেখা গেল না মঙ্গলার।

এদিকে আর এক কথা শোনা গেল ওপক্ষ থেকে। নবদ্বীপের দলাদলির চেষ্টায় মুরলী নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবার বাধা দিয়েছে। মুরলী বলেছে, 'ওসব এবার থাক বাবা! ওরা চার ভাই যখন একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছে, আমরাও মিলেমিশেই তাদের বাড়িতে সব নিমন্ত্রণ রাখতে যাব, তাছাড়া সুবলদার সঙ্গে আবার একটা দলাদলি কিসের, তার সঙ্গে কোন বাদবিসংবাদ তো নেই আমাদের।'

নবদ্বীপ নাকি ভ্রূ কুঞ্চিত করে জবাব দিয়েছে, 'আছে কি না আছে তার তুই কি বুঝবি? চিরকাল ইয়ে নিয়ে কাটালি, পুরুষ মানুষের সমাজ সামাজিকতা দলাদলির তুই কিছু বুঝিস, না জানিস, যে এর মধ্যে কথা বলতে এসেছিস!'

কিন্তু মুরলী তার বাবার ধমকে ভয় পায়নি। দলাদলির প্রস্তাবে কান না দেওয়ার জন্য মুরলী কুঞ্জদের চার ভাইকে গিয়েও নাকি অনুরোধ করেছে। নবদ্বীপের সাঙ্গ পাঙ্গদেরও শ্লেষ আর তিরস্কার ক'রতে বাকি রাখেনি। কোন বারই এসব ব্যাপারে মুরলীর উৎসাহ দেখা যায় না। বিয়ে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে বড় একটা যোগও দেয় না সে। কিন্তু এবারকার সামাজিক ব্যাপারে তার সাগ্রহ সহযোগ রীতিমত বিস্ময়কর হয়ে উঠেছে। আরও আশ্চর্য লাগছে বাপের বিরুদ্ধে সুবলকে সে সমর্থন করছে বলে। অবশ্য মুরলী কোনদিনই পিতৃভক্ত নয়। কিন্তু ঘরের মধ্যে যত তর্ক বিতর্ক,

ঝগড়াঝাঁটিই বাপের সঙ্গে মুরলী করুক, বাইরে কোনদিনই সে নবদ্বীপের বিরোধিতা করেনি।

এবার তার এই নতুন ধরণের আচরণে আভাসে ইসারায় পাড়ায় আর একটা কথাও ফিস ফিস শব্দে শোনা যাচ্ছে। সেটা মুরলীর সঙ্গে সুবলের স্ত্রীর মাখামাখির ব্যাপারটা, ইতিমধ্যে মেয়েপুরুষ অনেকেরই বিষয়টা চোখে পড়েছে। অনেকেই একাধিক দিন তাদের দু'জনকে নিভৃতে আলাপ করতে দেখেছে। কেউ কেউ নাকি সুবলের অনুপস্থিতিতে তার বাড়ি থেকে বিভিন্ন সময়ে মুরলীকে বেড়িয়ে আসতেও দেখে ফেলেছে। মঙ্গলার দেমাক, তার সাহস, এত কালের তার নির্মল স্বভাব চরিত্রের খ্যাতির কথা মনে করেই তুলি তুলি ক'রে কথাটা তেমন ভাবে তুলতে কেউ সাহস পায়নি। তাছাড়া সুবলের একরোখা স্বভাবের কথাও লোকে জানে। কিন্তু সুবলদের ওপর মুরলীর এই পক্ষপাতিত্বে চাপতে চাপতেও কথাটা আবার উঠে পড়েছে। ঘরে ঘরে গুজ গুজ ফিস্ ফিস চলছেই।

বিষ্টু সা সেদিন স্পষ্টই বলল, 'অবশ্য বউমা সম্বন্ধে এসব কথা মুখে আনাও পাপ। ছেলেবেলা থেকেই তো তাকে আমরা দেখে আসছি। এমন বউ পাড়ায় আর দু'জন নেই। পরের বিপদে আপদে তাকে ডেকে আনতে হয় না। মা লক্ষ্মী নিজেই যেচে এসে উপস্থিত হন। উৎসব অনুষ্ঠানে বাড়িতে মঙ্গল বউমা না এলে মনে কারো স্ফূর্তি লাগেনা। রান্নাবাড়ায় এমন মিষ্টি হাত পাড়ায় আর কোন বউ ঝিয়ের নেই। কিন্তু'—বিষ্টু সা গলা খাটো করে বলল, 'মুরলী তো গাঁয়ের একেবারে মার্কামারা ছেলে। তার সঙ্গে কি বউমার এমন মেলা-মেশা করতে দেওয়াটা তোমার ঠিক হয়েছে সুবল, কথায় বলে সন্ন্যাসী চোর নয় দ্রব্যে ঘটায়। বউমাকে তোমার একটু সতর্ক সাবধান করা উচিত ছিল সুবল।'

সুবল মুখ লাল ক'রে বলল, 'কি উচিত না উচিত সে আমি বুঝব বিষ্টু খুড়ো। আমার বউয়ের স্বভাব চরিত্র আমি জানি। তার সম্বন্ধে আর কারো মাথা ব্যথার দরকার করে না। আর এও ঠিক অসতী বলে যে মুহূর্তে তাকে আমি বুঝতে পারব, পরের মুহূর্তে আমার ঘরে তার আর স্থান হবে না, তার হাজার গুণ থাকলেও না। বউকে ভালো-বাসলেও তার দুশ্চরিত্রতা সহ্য করবার মত পুরুষ সুবল সা নয়।'

বিষ্টু সা, ফটিক, নিধিরাম সবাই থতমত খেয়ে গেল। সুবলের ক্রোধদীপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে সামনাসামনি কেউ কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করল না।

ঘরে এসে সুবল জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কি শুনছি ?'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মঙ্গলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ঢিপ ঢিপ করতে লাগল বুকের মধ্যে। নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে মুখ নিচু করে বলল, 'কি শুনেছ না বললে আমি কি করে বুঝব।'

নতমুখ স্ত্রীর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল সুবল। তারপর বলল, 'যা শুনছি তা তুইও মনে মনে জানিস, তুইও মনে মনে বুঝেছিস। ঘৃণায় আমি কথাটা মুখে আনতে পারব না একথা জানিস বলেই 'কি শুনছ' জিজ্ঞাসা করতে তোর মুখে আটকায়নি।'

মরিয়া হয়ে মনের মধ্যে এবার কৃত্রিম জোর আনতে চেষ্টা করল মঙ্গলা। দৃপ্ত ভঙ্গিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মুখের কথা বাদ দাও। স্পষ্টকথা তাতে কোন দিনই আটকায় না। কিন্তু তোমার জিহ্বাতে ও তো ভালমন্দ, কোন কথা কোন দিন আটকে থাকতে দেখিনি। কি শুনেছ বলেই ফেল না। অত ঢাক ঢাক গুড় গুড়ের দরকার কি।'

সুবল বলল, 'না দরকার আর আমার কোন কিছুতেই আজ নেই।

এতই যদি স্পষ্টবাদিনী আমার কথার সত্যি ক'রে জবাব দে দেখি, বুঝব কেমন বাপের বেটি তুই।'

মঙ্গলা বলল, 'বাপ মা তুলে দরকার কি, যা বলবার বলে ফেললেই হয়।'

সুবল হঠাৎ কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'রাঁধতে গিয়ে সেদিন এত যে চোখের জল ফেললি তার কারণটা কি? মুরলীকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে হোল বলে? বেরসিকের মত বাড়ি ফিরে আমি ভারি অন্যায় করেছিলাম, মনে ভারি দাগা দিয়েছিলাম তোর না?'

নিরুত্তরে মঙ্গলা সেখান থেকে উঠে যাচ্ছিল, হঠাৎ থাবা দিয়ে সুবল তার হাতখানা ধরে ফেলল, 'চলে যাচ্ছিস যে বড়, জবাব দিয়ে যা আমার কথার।'

মঙ্গলা ম্লান একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'জবাব দেওয়ার কি আছে। তোমার মুখে না কি কোন কোন কথা আবার আটকে যায়, ভাবছি সে কথাগুলি কোন্ ধরণের।'

সুবল বলল, 'না আর আটকাবার মত কিছু নেই। ভয়ডর, লজ্জা ঘৃণা বলতে কিছুই যখন তুই বাকি রাখিসনি, মঙ্গলা সত্যি করে বল দেখি তারপর আর ক'দিন এসেছিল সে?'

হাত ছাড়িয়ে নিতে এবার আর কোন চেষ্টা করলনা মঙ্গলা, চেষ্টা করলনা বৃথা আত্মরক্ষার, বলল, 'এতই যখন জানো দিনগুলিও কি মনে মনে গুণে রাখনি তুমি।'

মঙ্গলার স্পর্দ্ধায় একমুহূর্ত যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল সুবল, তারপর পরম ঘৃণায় হাতখানা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'সব কটি দিন গুণে না রাখলেও দু'একদিনের কথা তো বলতে পারি। পরের হাটবার তাড়াতাড়ি করতে করতেও বৃষ্টির জন্য একটু রাত হয়ে গেল ফিরতে। সেদিন আর আগের মত বোকামি করিসনি। বেশ সেয়ানা হয়ে

উঠেছিস তত দিনে। এসে দেখি ঘরেও আলো জ্বলছে, বেশবাসও বেশ ঠিকঠাক ক'রে নিয়েছিস। রান্না করতে গিয়ে সেদিন আর চোখ দিয়ে জল ঝরেনি, তার বদলে কাজল চক্‌চক্ ক'রে উঠেছে। বলিহারি তোদের চোখকে।'

মুহূর্তের জন্য আরক্ত হয়ে উঠল মঙ্গলার মুখ। তারপর আবার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সুবলের স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে সর্বাঙ্গ যেন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল মঙ্গলার। কিন্তু আশ্চর্য, সুবল রাগের মাথায় অমানুষিক কোন কাণ্ডই ক'রে বসলনা। ছুটে গিয়ে গলা টিপে ধরলনা মঙ্গলার, উঁচু ক'রে তুললনা চুলের মুঠি ধরে। আগে আগে ছোটখাটো সামান্য একআধটু অবাধ্যতায় যেসব শাস্তি তাকে দিয়েছে সুবল তার কণামাত্রেও এবার আর তার উৎসাহ দেখা গেলনা। নিতান্ত শান্ত শিষ্ট ঠাণ্ডা মনুষের মতই বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে গেল।

গঞ্জের মধ্যে দেখা হোল নবদ্বীপের সঙ্গে। সুবলকে দেখামাত্রই নবদ্বীপ নিজে এগিয়ে এল তার কাছে। তারপর অত্যন্ত অবলীলায় যেন পরম স্নেহে সুবলের কাঁধে হাত রাখল নবদ্বীপ। গলা নামিয়ে বলল, 'এই যে সুবল, তোমাকেই খুঁজছিলাম আমি।'

নবদ্বীপের স্পর্শে ঘৃণায় সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে উঠল সুবলের। বাপবেটা কাউকেই চিনতে আর বাকি নেই তার। বুড়ো শকুন বন্ধুত্বের ছলে আবার কোন্ সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে কে জানে। সর্বনাশের কি-ইবা আর বাকি আছে সুবলের।

সুবল নীরস রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'হঠাৎ আমাকে আবার আপনার কি দরকার পড়ল জেঠামশাই! দলাদলি করে আমাকে কোন্‌ঠাসা করতে চান নিজের মুখেই কথাটা শুনিয়ে দিতে চান বুঝি। কিন্তু

সে তো আমি আগেই শুনেছি।' নবদ্বীপের চোখেমুখে যেন একটা বেদনার ছায়া পড়ল।

নবদ্বীপ বলল, 'না, দলাদলির কথা নয়, সুবল। সে তো সবাই জানে। এ অন্য কথা।'

সুবল বলল, 'তা'হলে বলেই ফেলুন কথাটা।'

নবদ্বীপ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'না এখানে নয়। কথাটা একটু গোপনীয় সুবল। আমার গুদাম ঘরে চল। সেখানেই সুবিধা হবে।'

ঘৃণায় আর আক্রোশে সুবলের মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নবদ্বীপের ভাবভঙ্গি দেখে কৌতুক আর কৌতূহলও তার কম হচ্ছিল না। কি বলে বুড়ো শকুন শোনাই যাক না। দেখাই যাক তার এবারকার চালটা।

তামাকের গুদাম ঘরে গুটি দুই কর্মচারী ছিল। তাদের ইসারায় বেরিয়ে যেতে বলে সুবলকে পাশে ডেকে বসাল নবদ্বীপ। তারপর বলল, 'তুই ভুল করেছিস সুবল। এরপর আর তোর সঙ্গে দলাদলির প্রবৃত্তি নেই আমার।'

সুবল বলল, 'এরপর মানে কিসের পর? কিসের কথা বলছেন আপনি?'

নবদ্বীপ একবার সুবলের দিকে তাকাল, তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'এই যে লোকে যা তা সব বলাবলি করছে, কাণাকাণি ফিস ফিস করছে যত সব অবিশ্বাস্ত অকথ্য কথা নিয়ে। এরপর আর তাদের নিয়ে দল পাকাতে একটুও ইচ্ছে নেই আমার। এই ঘরের তলায় বসে তোকে দিব্যি ক'রে বলছি সুবল, আজ থেকে দলাদলি আমি একেবারেই ছেড়ে দিলাম।'

সুবল অদ্ভুত একটু হাসল, 'মিছামিছি অতবড় দিব্যিটা কেন করতে

গেলেন জেঠামশাই, আপনার ভয় কিসের? আপনার পাহারা ডিঙিয়ে মুরলীর কোন ক্ষতি করবার সাধ্য যে আমার নেই তাতো আপনি আমার চেয়েও ভাল জানেন।'

নবদ্বীপের ছোট ছোট নিষ্প্রভ চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য যেন একবার জ্বলে উঠে আবার স্তিমিত হয়ে গেল।

নবদ্বীপ বলল, 'রাগে তোর মাথার ঠিক নেই সুবল, এ সব কথা শুনলে তা থাকেও না। মুরলীর ক্ষতির ভয় আমি এক ফোঁটাও করি না, যে গুণধর ছেলে আমার তার আবার ক্ষতি বৃদ্ধি! আমি ভাবছি তোদের কথা।'

সুবল বলল, 'আমাদের কথা!'

নবদ্বীপ পুনরাবৃত্তি ক'রে বলল, 'হাঁ তোদের কথাই। যে-রকম একরোখা গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ তুই, নিজের হাতে নিজের কোন ক্ষতি তুই না ক'রে বসিস এই আমার ভাবনা, কিন্তু এ সব বাজে কথায় বাজে গুজবে নিজের মাথা খারাপ ক'রে ফেললে তো চলবে না বাবা। এ সময় মাথা ঠিক রাখতে পারলেই তো পা ঠিক থাকবে, চাল ঠিক থাকবে, চলন ঠিক থাকবে। মাতব্বরী মাতব্বরী করো বাপু এখানেই হলো আসল মাতব্বরী, আসল বুদ্ধির পরীক্ষা। পরের বুদ্ধিতে নিজের সংসার তুমি ছারেখারেও দিতে পারো, আবার তেমন বুদ্ধিমান পুরুষ হ'লে এই সব ঝড়-ঝাপটার মধ্যে নিজের ঘরসংসার বেশ সামলেও রাখতে পারো। বুদ্ধিমানের মত চললে একটু টোপ ও পড়বে না তোমার সংসারে, তোমার সংসারও বাঁচবে, সমাজও বাঁচবে।'

সুবল অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'আপনি বলতে চান কি? যা বলবেন সোজাসুজি পরিষ্কার ক'রে বলুন জেঠামশাই। অত ঘোরপ্যাচ আমার ভালো লাগে না।'

নবদ্বীপ একটু হাসল, 'সংসারটাই যে বড় ঘোরপ্যাচের বাবা। মোটেই সোজা নয়, মোটেই স্পষ্ট আর পরিষ্কার নয়, কথা সোজা হবে কি ক'রে?' একটু চুপ ক'রে থেকে নবদ্বীপ বলল, 'এসব বাজে গুজবে কান দিও না, বিশ্বাস কোরোনা এসব। জোর ক'রে তাদের মুখের উপর ব'লে এসো যে তাদের কথা তুমি মোটেই বিশ্বাস করোনি, তাতে মান বাঁচবে।' তারপর স্ত্রীকে গোপনে গোপনে শাসন করতে হয় করো, রাখো চোখে চোখে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যেয়ো না। তাতে মন বিগড়ে যাবে, শান্তি নষ্ট হবে দুজনেরই, ঘরসংসারে সে মন দিতে পারবে না, আর আয় উপার্জন তোমার খারাপ হতে থাকবে। পুরুষের যে বাপু নানা জ্বালা। তাকে সব দিক দেখতে হয়, তার আটপিঠে না হ'লে চলে না।'

সুবল চলে আসার সময় নবদ্বীপ আবার বলল, 'দলাদলি সম্বন্ধে কোন চিন্তাভাবনা তোমাকে ক'রতে হবে না সুবল। সেসব আমি দেখব।'

হোলও তাই, দলাদলি করতে যেমন নবদ্বীপ ওস্তাদ, দলাদলি মিটাতেও তেমনি। কোনরকম গোলমাল গণ্ডগোলই নিধুসার শ্রাদ্ধে সে হোতে দিল না। একটা দিন দোকান কামাই ক'রে শ্রাদ্ধ বাড়িতে নিজে সে উপস্থিত রইল, শ্রাদ্ধের বেদিতে পুরোহিতের মন্ত্রপড়া থেকে শুরু ক'রে প্রত্যেকটি নিমন্ত্রণের বৈঠকে সে চোখ রাখল, তার ব্যবস্থায় বড় রকমের কোন ক্রটিবিচ্যুতির কথা কেউ তুলতে পারল না।

শ্রাদ্ধের পর রামায়ণ হোল এক পালা। কুঞ্জ বলল, 'আমাদের বিনোদ সাধুর কীর্তন টির্তন কিছু হবে না?'

বিনোদ বলল, 'না কুঞ্জকাকা, গলা ভালো নেই। আমাকে মাপ করো এবার।'

নামকীতন পদকীর্তনের নামে বিনোদের আনন্দের অন্ত থাকে

না। একবারের বেশি দু'বার বলতে হয় না তাকে। পাড়ায় কোন উপলক্ষ ঘটলেই নিজে যেচে গিয়ে কীর্তনের উদ্যোগ আয়োজন করে। এবাড়ি ওবাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে মাদুর সতরঞ্চি এনে নিজেই আসর সাজায়, চৌদ্দলাইট টাঙিয়ে আলো জালবার ব্যবস্থা করে। এসব ব্যাপারে একাধারে নিজেই সে একশ'।

কিন্তু বার বার সাধাসাধি সত্ত্বেও কীর্তন গাইতে বিনোদকে এবার রাজী করানো গেল না। একবার বলল, গলা খারাপ, আর একবার বলল, 'ভগবানের নাম খুশি মনে না করতে পারলে করতে যেতে নেই কুঞ্জ কাকা; তাতে যে শোনে তারও তৃপ্তি হয় না, যে গায় তারও নয়।'

কুঞ্জ বিস্মিত হয়ে ভাবল এমন নির্বিরোধ, শান্ত সহজ মানুষ বিনোদের অখুশি হবার মত কি হোল হঠাৎ!

নিজের মনের অশান্তি আর চাঞ্চল্যের কথা ভেবে বিস্মিত বিনোদ নিজেও কম হয়নি। সেদিন মঙ্গলার প্রথম সম্ভাষণ, তার শ্লেষ আর পরিহাস বিনোদের মনে অদ্ভুত একটা ভাবাবেশের সৃষ্টি করেছিল। কীর্তনের ভাবাচ্ছন্নতার মত এই আবেশকেও মনে মনে উপভোগ ক'রেছিল বিনোদ; শত তিরস্কার, শত ভৎর্সনাতেও মনকে এই আনন্দরতি থেকে সে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

এর আগে মঙ্গলা কোন দিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। কিন্তু সময় অসময়ে দরকার মত বিনোদের অতিথি অভ্যাগতের জন্য চাল, ডাল, তেল, নুন চাওয়া মাত্রই মঙ্গলা যুগিয়েছে। কোন দিন কোন কার্পণ্য দেখায়নি, অপ্রসন্ন করেনি মুখ। গোঁসাই গোবিন্দের অর্চনার জন্য কতদিন বিনোদ মঙ্গলার নিজ হাতে রোয়া গাছ থেকে গাঁদা ফুল তুলে নিয়েছে, ঘরের কানাচের দোপাটি ফুলের ছোট ছোট গাছ থেকে লাল আর সাদা ফুলে ভরে নিয়ে গেছে সাজি। অন্য বাড়ির বউ ঝিয়ের

মত ঘরের ভিতর থেকে কোন নিষেধ জানায়নি মঙ্গলা, কোন আপত্তি করেনি। মঙ্গলার আঙিনায় যে ফুল ফোটে তা যেন কেবল বিনোদের গোঁসাই গোবিন্দের পুজায় লাগবার জন্যই। এই ফুলের আর যেন কোন প্রয়োজন নেই, আর যেন সার্থকতা নেই কোন। যেদিন বিনোদ নিজে আসতে পারেনি, সাজি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে মাকে। সাজির ভিতর তোলা ফুলগুলির সাজাবার ধরণ দেখেই বিনোদ বুঝতে পেরেছে এ তার মাব হাতের কাজ নয়। মঙ্গলার সেই দান, সেই নীরব প্রীতি বিনোদও নিঃশব্দে, কিন্তু আনন্দেই গ্রহণ করেছে।

তারপর সতীসাধ্বী, বুদ্ধিমতী, সহৃদয়া বলে পাড়া ভরে মঙ্গলার যত নাম ছড়াতে লাগল বিনোদের মন গর্বে আর আনন্দে ততই যেন পূর্ণ হয়ে উঠল। মঙ্গলাব খ্যাতিতে লাভ কি বিনোদের! লাভ নয় বা কেন, সাধু সজ্জন বলে বিনোদেরও তো খ্যাতি আছে, ভালো কীর্তন গায় বলে নাম আছে তার গ্রাম গ্রামান্তরে। সেই খ্যাতির সঙ্গে যেন মঙ্গলার খ্যাতি মিলে গেছে, সেই পথের সঙ্গে যেন মিলে গেছে মঙ্গলার পথ। কথা মঙ্গলা তার সঙ্গে নাই-ই বলল, প্রত্যক্ষ আলাপ নাই থাকল পরস্পরের মধ্যে, কিন্তু পরিচয়ও তাই বলে নেই একথা তো সত্য নয়। বরং এই পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিল, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতা যদি কারো সঙ্গে থাকে তো কেবল বিনোদেব সঙ্গেই আছে মঙ্গলার। অন্তরের এই মিল, মনের এই মাধুর্যকে অতি লোভে, কাঙাল-পণা করে বিনোদ নষ্ট করে ফেলবেনা। কীর্তন রসের মত, বৈষ্ণব-মহাজনদের পদলালিত্যের মত এই গোপন রসঘন সম্বন্ধটুকুও অন্তরের মধ্যে বিনোদ উপভোগ করবে। রাধাকৃষ্ণের আসল মিল তো এই অন্তরলোকেই, ভক্তের হৃদিবৃন্দাবনেই তো তাঁদের যথার্থ ভাবসম্মেলন।

এতকাল পরে, এত বছর পরে মধুর ভাবঘন মৌনতা ভঙ্গ করে সেদিন সকালে, নির্জন বাঁশের ঝাড়ের মধ্যে মঙ্গলা তার সঙ্গে কথা বলে

ফেলল। নিন্দা করল তার কীর্তনের, ব্যঙ্গ করল, ভীরু পুরাকালের মানুষ বলে খোঁচা দিতেও ছাড়ল না। বিনোদ দেখল যতখানি সে ভেবেছিল তত মিল মঙ্গলার সঙ্গে তার নেই, মতের, পথের, স্বভাবেরও ভেদ আছে অনেকখানি। কিন্তু তাই বলে মন বিরূপ হয়ে উঠল না বিনোদের, এক ধরণের মোহ ভাঙল বটে, কিন্তু আর এক ধরণের মোহও মনের মধ্যে তিলে তিলে গড়ে উঠতে লাগল। মৌনতা আর কথা তো একজিনিষ নয়। কথায় ধ্বনিও আছে ধারও আছে। তার ধরণ আলাদা, স্বাদ আলাদা। খোঁচা কিছু বিনোদের মনে লাগল বটে, কিন্তু মৌচাক থেকে সে খোঁচায় কেবলই মধু ঝরে পড়তে লাগল। তারপর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত মধুক্ষরণ হঠাৎ সেদিন স্তব্ধ হয়ে গেল বিনোদের। নিজের মার মুখেই শুনতে পেল বিনোদ কথাটা। মঙ্গলার সঙ্গে মুরলীর নাম জড়িয়ে নানা কানঘুষো চলছে পাড়ায়।

বিনোদ বলল, 'ছিঃ, ওসব বাজে কথায় কান দিয়োনা মা। যেয়ো-না ওসব ইতর আলোচনার মধ্যে। কোথায় মঙ্গলা বউঠান আর কোথায় মুরলী! ছিঃ!'

সৌদামিনীর মুখে বেদনার ছায়া পড়ল। একটুকাল চুপ ক'রে থেকে সৌদামিনী বলল, 'আমিও তো তাই জানতাম বিনোদ। আর যাই হোক, মঙ্গলার কোন দিন এমন মতিগতি হবে না। কিন্তু মানুষের মনের গতি কখন যে কোন্ দিকে যাবে তা আগে থেকে কারো জানবার সাধ্য নেই। দেখিসনি টাটকা ঘাস বিচালি, ফেন কুঁড়ো ফেলে গরুতে মাঝে মাঝে গেরস্তের ছাইয়ের কুলোয় মুখ দেয়, আহ্লাদ ক'রে জিভ দিয়ে ছাই চাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এও তেমনি। আমাদের গেরস্তের বউঝিদেরও সেই রকম হয় মাঝে মাঝে। ভালো জিনিস মুখে রোচেনা, ছাই চাটতে সাধ যায়, সোনা রূপা ফেলে ভাঙা কাঁচ কুড়িয়ে আঁচল ভ'রে তোলে।

আমার নিজের চোখে যদি না দেখতাম তাহলে আমিও কি বিশ্বাস করতাম এসব কথায়।'

সৌদামিনী নিজের চোখে কি দেখেছে তা লজ্জায় বিনোদও জিজ্ঞাসা করল না, সৌদামিনী ও বলল না। কিন্তু কেমন একটা অশুচি মালিন্যে বিনোদের সারা মন কালো হয়ে উঠল। মঙ্গলার কলঙ্ক যেন বিনোদকেও স্পর্শ ক'রেছে, কুৎসিত অপবিত্র ক'রে দিয়েছে তার জীবনকে।

কীর্তন গাইতে বিনোদ রাজী না হওয়ায় দীঘলকান্দী থেকে নন্দকিশোর গোঁসাইকে ডেকে আনল কুঞ্জ। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণের মুখে একটু ভাগবত পাঠ শুনুক পাড়ার লোক, এত শোকদুঃখ বিপদ আপদের পরে একটু শান্তি আসুক মনে। এ অঞ্চলের মধ্যে পাঠ আর ব্যাখ্যা মোটামুটি ভালোই করেন নন্দকিশোর, বেশ লালিত্য আছে তার গলায়।

কথায় কথায় নন্দকিশোরকে বিনোদের ভাবান্তরের কথাও বলল কুঞ্জ, জানাল কীর্তন গাইতে তার অসম্মতির কথা।

নন্দকিশোর শুনে হাসলেন, 'জানো কুঞ্জ, শ্রীরাধার মত ভক্তেরও মান অভিমান আছে। বিনোদের সেই অভিমান হয়েছে আমার বঙ্কবিহারীর উপর। মানভঞ্জন তিনি নিজে এসেই করবেন, সে জন্ত আমাদের ব্যস্ত হতে হবে না।'

নন্দকিশোর এসে বিনোদের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ মুচ্‌কে একটু হাসলেন, যেন কিছুই তাঁর জানতে বাকি নেই। তাঁর অনুরোধ বিনোদ অবহেলা করতে পারল না, আসর সাজাতে হোল কুঞ্জের বাড়িতে, সকলের সঙ্গে উপস্থিত থাকতে হোল ভাগবত পাঠের সভায়।

বাড়ির অন্দরের উঠানে চিক ঝুলান বারাণ্ডায় মেয়েদের বসবার ব্যবস্থা হোল। পুরুষেরা বসল বাড়ির উঠানে, বারঝালর

দেওয়া সামিয়ানার তলায়। উঠানের দক্ষিণ দিকে ছোট আধহাত উঁচু একটি তক্তপোষের উপর পুরু তোষক পেতে তার উপর ধবধবে সাদা চাদর বিছিয়ে নন্দকিশোরের আসন তৈরী হোল। মোটা ভাগবতের ওপর শ্বেত চন্দন মাখা তুলসী রাখলেন নন্দকিশোর, পাশের শ্বেত পাথরের রেকাবী থেকে একটা এলাচির দানা মুখে তুলে দিলেন। তারপর মৃদু হেসে নন্দকিশোর জিজ্ঞাসা করলেন বিনোদকে, 'কোন উপাখ্যান আজ পাঠ হবে বিনোদ?'

নবদ্বীপ সা, বিষ্টু সার মত প্রাচীন লোক উপস্থিত থাকাতে সরাসরি উপাখ্যানের কথা জিজ্ঞাসা করায় বিনোদ ভারি লজ্জিত হোল। একটু চুপ করে থেকে বিনোদ সবিনয়ে বলল, 'প্রভুর যা অভিরুচি। সভাস্থ দশজনে যা শুনতে চান—'

নন্দকিশোর স্মিত মুখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তুমিই বল বিনোদ, তাতে কোন দোষ হবে না। দশজনের কথা ভক্ত জনের মুখ দিয়েই বেরোয়।'

নবদ্বীপ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই বল বিনোদ, প্রভু যখন আদেশ করছেন —'

বিনোদ একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'তাহলে কুব্জার উপাখ্যানই বলুন প্রভু।'

কুব্জা উপাখ্যান! অক্রুর সংবাদ, কংসবধ এতসব চমৎকার চমৎকার পালা থাকতে বিনোদ চাইল কিনা কুব্জা উপাখ্যান শুনতে! আসরের অনেকের মুখই অপ্রসন্ন হয়ে উঠল।

কিন্তু নন্দকিশোর আগের মতই হেসে বললেন, 'বেশ, তাই শোন।'

কণ্ঠে অন্তরের সমস্ত মাধুর্য ঢেলে কথাবার্তা শুরু করলেন নন্দকিশোর। ভাগবত থেকে দু'একটি শ্লোক মাঝে মাঝে সুললিত স্বরে পড়ে যান আর তার ব্যাখ্যায় দৃষ্টান্তে উপমায় অলংকারে কখন বা

নিজের সামান্য এক আধটু অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে শাখায় উপশাখায় পত্রপুষ্পে পল্লবিত ক'রে তোলেন সেই শ্লোক।

মথুরার অন্য নাগরিক নাগরিকাদের মত কুব্জারও সাধ হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে একবার সে দুচোখ ভরে দেখে আসবে। রূপের আধার শ্রীকৃষ্ণ। একবার তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকালে চোখ পলক ফেলতে ভুলে যায়। নয়ন থেকে মন, মন থেকে অন্তর কাণায় কাণায় সেই রূপের সুধায় ভরে ওঠে, মাধুর্যের অবধি থাকে না। কুব্জারও সাধ হোল নয়ন ভরে, হৃদয় ভরে সমস্ত জীবন ভরে সেই রূপামৃত পান করবার জন্য।

কিন্তু কি করে, কোন্ লজ্জায় সেই পরমতম রূপবান পুরুষের কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে কুব্জা। তার যে শুধু রূপ নেই তাই নয়, কুরূপেরও অন্ত নেই তার। পিঠের উপর বিশাল এক কুঁজ উঁচু হয়ে রয়েছে। বিসদৃশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোন সুষমা সামঞ্জস্য নেই, এ অঙ্গ বিকল, ও অঙ্গ বিকৃত। লাবণ্য নেই, শ্রী নেই, যৌবন যায় যায় প্রায়। সংকোচে দীনতায় কুব্জার পা সবে না, দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসে জলে।

কিন্তু কংসের আদেশ, যেতেই হবে। এই কুরূপা কুদর্শনা গত যৌবনা কুব্জাই কৃষ্ণের মত ব্যাভিচারী লম্পটের যোগ্য প্রণয়িনী। বাঁকা কুব্জার সঙ্গে চমৎকার মিল হবে বঙ্কবিহারীর। সপারিষদ কংসের উচ্চ উপহাসে চম্‌কে উঠে মথুরা নগরী, পশুপক্ষীরা অবোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত পরম কুণ্ঠায়, পরম লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'তে হোল কুব্জাকে। ভাবল আত্মগোপন ক'রে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে তাঁকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখে আসবে। নিজের এই কুরূপ, বিকৃত, বিকলাঙ্গ দেহ তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরে চোখকে পীড়িত করবে না তাঁর।

কিন্তু নিজে লুকালে হবে কি, পিঠের কুঁজ তো লুকায় না কুব্জার। পর্বত শৃঙ্গের মত সবাইকে ঢেকে সব কিছুকে আড়াল ক'রে, বার বার কেবলই শ্রীকৃষ্ণের চোখে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। আত্মগোপন করলে হবে কি, শ্রীকৃষ্ণের কাছে তো মনের কোন ভাব গোপন থাকে না। কুব্জার কুণ্ঠিত, লজ্জিত, অপ্রকাশিত আত্মনিবেদনও যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়েই পৌঁছায়।

মৃদু হেসে ভিড় ঠেলে শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে চললেন। অসম্ভাষিত, অবজ্ঞাত রূপবতীরা ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল এখানে ওখানে। শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে ধরলেন কুব্জার হাত। সমস্ত অন্তর থর থর ক'রে কেঁপে উঠল কুব্জার। সে স্পর্শে অশ্রু উদ্বেল হয়ে উঠল চোখে, তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে উঠল অন্তরের রসসিন্ধুতে। সেই প্লাবনে কোথায় মিলিয়ে গেল কুব্জা, কোথায় ভেসে গেল কুরূপ, সুচারু দর্শনা, ষোড়শী তন্বী মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার দেখল নিজেকে আর একবার সেই পরম রূপময়ের দিকে লাজনত অনুরাগ মধুর চোখ মেলে তাকাল।

কথা শেষ হোলেও তার ধ্বনি যেন থামতে চায় না। মুগ্ধ শ্রোতাদের চোখের সামনে থেকে মিলাতে চায় না প্রেমের স্পর্শে সেই নব রূপ যৌবনময়ী নারী, পদ্মের কলির মত যার হাতখানি শ্রীকৃষ্ণ ধরে রেখেছেন আপন মুঠির মধ্যে।

আসর ভাঙল অনেক রাত্রে। মুগ্ধ কৃতার্থ শ্রোতার দল নন্দকিশোরের পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রে একে একে বিদায় নিল। গুরু প্রণাম সেরে ভাবমুগ্ধ আবিষ্ট মনে বিনোদও চলল বাড়ির দিকে। সৌদামিনীর মৃদু ধমক আর অনুরোধেও শুতে গেল না বিছানায়। ছোট উঠান ভ'রে ধীরে ধীরে কেবল পায়চারি করতে লাগল, মনে পড়তে লাগল তার মঙ্গলার কথা। মনে পড়তে লাগল কুব্জার কথা। কুব্জার কুরূপ তো কেবল বাইরের নয়, তার দৈন্য আর মালিন্য

অন্তরেরও। কিন্তু প্রেমাস্পদার দেহ মনের সমস্ত কুশ্রীতা, মালিন্য, নির্মল হয়ে উঠতে পারে এক মাত্র প্রেমের স্পর্শে, প্রেমেব দৃষ্টিতে। যেখানে প্রেম রয়েছে, সেখানে কলঙ্ক নেই, দৈন্য নেই, গ্লানি নেই, আছে শুধু অন্তরের বাহিরের নয়নাভিরাম রূপ। তা চিরপবিত্র চিরনির্মল।

ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল আস্তে আস্তে। কৃষ্ণা একাদশীর ক্ষীণ চাঁদ উঠল আকাশে। মৃদু হাওয়ায় দূর থেকে কিসের একটা অদ্ভুত স্নিগ্ধ গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। এ গন্ধ ফুলের নয়, ঘাসপাতার নয়, এ গন্ধ কি পৃথিবীর নিজের?

কিন্তু এ গন্ধের সঙ্গে মেয়েদের চুলের গন্ধের কেমন যেন একটা মিল আছে, মিল আছে গন্ধ তেলের। যেদিক থেকে গন্ধটা আসছে সেদিক তাকাতেই বিনোদ বিস্মিত হয়ে গেল। আগাছার ভিতব দিয়ে আবছা জ্যোৎস্নায় কে এক নারী তারই দিকে এগিয়ে আসছে। মাথায় আঁচল নেই তার, চুলের রাশ পিঠ ভ'রে ছড়ানো। এগুতে এগুতে সে একেবারে অত্যন্ত কাছে চলে এলো বিনোদের। কোন কথা বলবাব আগেই সে হঠাৎ বিনোদের পায়ের ওপর ভেঙ্গে পড়ল। ঘন চুলের রাশে পা ঢেকে গেল বিনোদের।

অদ্ভুত এক সম্মোহনের ভিতর থেকে বিনোদ অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'কে, কে তুমি?' বলে বিনোদ আস্তে আস্তে হাত ধরে তাকে তুলতে চেষ্টা করল। সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল মেয়েটির। সে আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমি আলতা। তোমার ছোঁয়ায় কুব্জার মত আমিও কি বদলে যেতে পারি না?'

বিনোদ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িযে রইল। তারপর হাত ধ'রে আবার তাকে তুলতে চেষ্টা ক'রে স্নিগ্ধ স্বরে বলল, 'এখন বাড়ি যাও আলতা। তোমার কথা আমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করব।'

সুবল মনে মনে ভেবে দেখল নবদ্বীপের কথাই ঠিক। ব্যাপারটা নিয়ে হৈ চৈ করলে সবদিক থেকেই লোকসান। পাড়ার লোক মজা দেখবার জন্য তাহলে আরও বেশি ক'রে জটলা পাকাবে। কেলেঙ্কারী তাতে বাড়বে বই কমবে না। এদিকে মুরলীও খুব সাবধান হয়ে যাবে, তাকে আর আয়ত্তের মধ্যে পাবে না সুবল।

কিন্তু মঙ্গলার ভাবগতিক দেখে সুবল অবাক হয়ে গেল। এরই মধ্যে সে বেশ সামলে নিয়েছে। জল আনছে, ঘর ঝাঁট দিচ্ছে, রান্নার জন্য বঁটি পেতে লাউ কুটছে আগের মত। যেন কিছুই হয়নি, কিছুতেই কিছু এসে যায়নি তার। কিন্তু সুবলের অনেক এসে যায়। অপরাধিনী, অবিশ্বাসিনী স্ত্রী তার চেখের সামনে এমন নির্ভীক ভাবে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে তা দেখে গা জ্বলে যায় সুবলের। কথা কম বলে মঙ্গলা, হাসে আরো কম। কিন্তু হাত দুখানা এক মুহূর্তও বিশ্রাম দেয় না। ঘর সংসারের কোন না কোন কাজে হাত তার লেগেই আছে। এত কাজ কোথেকে জড়ো করল! ভিতরে ভিতরে যে সংসার পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে তাতে ঘি ঢেলে লাভ কি মঙ্গলার।

মৌনমুখী, শান্ত, কর্মরত মঙ্গলাকে দেখে রাগ আরও বেড়ে যায় সুবলের। হাত নিসপিস করতে থাকে, কিন্তু কওয়া নেই বলা নেই হঠাৎ গিয়ে তো আর চুলের মুঠি ধ'রে মানুষে টেনে তুলতে পারে না বউকে, কিংবা ইচ্ছা হলেও পিঠের উপর দমাদম গিয়ে লাথি মারতে শুরু করা যায় না। মারধোরের জন্য শরীরের মধ্যে সত্যি সত্যি ততখানি আর উত্তেজনাও বোধ করেনা সুবল। ভিতরে ভিতরে একটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে তার অন্তরও যেন বরফের মত ঠাণ্ডা আর নিশ্চল হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে নিজেকে ধিক্কার দেয় সুবল। বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে দশজনের সামনে সে যা বলে এসেছিল তার কিছুই করতে সে পারেনি। স্ত্রীকে সন্দেহ করলেও ঘর থেকে তাকে বের ক'রে দেয়নি, বরং দিনের পর দিন একই ঘরের তলায় তাকে নিয়ে বাস করছে। সেবা নিচ্ছে, হাতের ভাত খাচ্ছে তার, তার হাতেরই পাতা বিছানায় রাতের পর রাত অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আর মুখ বুজে মজা দেখছে মঙ্গলা, তার কাপুরুষতায় আড়ালে গিয়ে মুখ টিপে হাসছে।

রান্নাঘরের দোরের কাছে গিয়ে সুবল বলল, 'আজ থেকে আমার জন্য তোর আর চাল নিতে হবে না মঙ্গলা, রাঁধতে হয় নিজের জন্যই রাঁধিস।'

মঙ্গলা মুখ ফিরিয়ে শান্ত ভাবে বলল, 'কেন, আজ থেকে কি উপোস ক'রে থাকতে চাও না কি ?'

তর্কের সুযোগে উৎফুল্ল সুবল রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'কেন রে মাগী, আমি উপোস করব কোন দুঃখে। আমার চাল আমার ডাল আর গোবিন্দ বুঝি তোর।'

মঙ্গলা তেমনি মৃদু শান্তভাবে বলল, 'তবে যে বলছিলে রাঁধতে হবেনা তোমার জন্য।'

সুবল বলল, 'হ্যাঁ আমার জন্য তোকে আর রাঁধতে হবেনা। নিজের ভাত আমি নিজে রেঁধে খাব। তোর হাতে আর নয়।'

মঙ্গলা অদ্ভুত ম্লান একটু হাসল, 'কেন, এতদিন বাদে কি হোল আমার হাতে।'

শ্লেষে আর ব্যঙ্গে বিকৃত দেখাল সুবলের মুখ, 'তাতো বটেই। হাতের আর দোষ কি, ঠোঁট এঁটো হয়, মুখ এঁটো হয়, কিন্তু হাত তো আর মেয়ে মানুষের এঁটো হয়না। হাতেরও জাত যায় না, ভাতেরও জাত যায় না।'

ক্লান্ত করুণ দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে মঙ্গলা মুখ ফিরিয়ে আবার রান্নায় মন দিল।

কিন্তু ওই বলা মাত্রই। আলাদা রাঁধবার জন্য কোন আগ্রহই দেখা গেলনা সুবলের। অন্যদিনের মত আজও স্ত্রীর বাড়া ভাত সামনে নিয়েই খেতে বসল। কিন্তু ভাত তরকারি মেখে মুখে দেওয়ার আগে সস্নেহে পোষা বিড়াল ছানাটিকে বাঁ হাতে কাছে টেনে নিয়ে এল সুবল। তারপর ভাতের গ্রাসের খানিকটা, প্রত্যেক তরকারি থেকে কিছু কিছু পাতের নিচে নামিয়ে রেখে বিড়ালটিকে লক্ষ্য করে সুবল বলল, 'খা, তুই আগে খেয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখ। মরিস না হয় মরবিই, অত ভয় কিসের। তোর চেয়ে একটা মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশী।'

স্বামীর কাণ্ড দেখে মঙ্গলা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ক্ষীণ করুণ স্বরে তার সমস্ত সত্ত্বা যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'দিন রাত এমন করে দগ্ধে না মেরে আমাকে একেবারে মেরে ফেল, একেবারে মেরে ফেল, পায়ে পড়ি তোমার।'

সুবল অদ্ভুত উল্লাসে এবার গ্রাসের পর গ্রাস মুখে পুরতে লাগল। একেবারে না মেরে ফেললেও মঙ্গলাকে মৃত্যুযন্ত্রণা দেওয়া যায়। মারণাস্ত্র সুবলের তূণ থেকে এখনো তাহ'লে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

কিন্তু চরম মৃত্যুবাণ যে মঙ্গলার ভিতর থেকেও একটু একটু ক'রে প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে সুবলের অনভ্যস্ত চোখ এতদিন তা এড়িয়েই যাচ্ছিল, কিন্তু কাল এড়াতে পারল না।

সেদিন হাট থেকে ফিরবার পথে এতদিনের সহচর ফটিকই বলল কথাটা। খানিক ইতস্ততঃ করে বলল, 'খবরটা সত্যি নাকি সুবলদা?'

সুবল বলল, 'কি খবর?'

ফটিক বলল, 'আটকুঁড়ো নাম এবার নাকি ঘুচতে চলল তোমাদের ?'

সুবলের সমস্ত মুখে যেন রক্ত এসে ভিড় করল। কিন্তু অন্ধকারে ফটিকের তা চোখে পড়ল না।

দম নেওয়ার জন্য একটু যেন সময় নিল সুবল, তারপর ধমকে উঠল ফটিককে, 'কি যা তা বলছিস। নিজের বউ গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়োয় কিনা তাই পরের সম্বন্ধেও ওসব ঠাট্টাতামাসা ছাড়া আর কিছু আসে না তোদের।'

ধমক খেয়ে ফটিক কিন্তু মোটেই ভড়কে গেল না, বলল, 'সত্যি কথাই বলেছি সুবল দা। আমার বউটার আক্কেল পছন্দ ভারি কম। বছরের পর বছর কেবল বিয়োচ্ছে তো বিয়োচ্ছেই। কিন্তু গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেপুলে হওয়া পুরাণো পোয়াতী কিনা, তাই নতুন পোয়াতীর লক্ষণ দেখলেই চট ক'রে বুঝতে পারে, তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। জল আনতে গিয়ে বউঠানকে আজ সে নিজের চোখে দেখে এসেছে। কথাটা তার মুখেই আমার শোনা।'

সুবল কোন কথাই বলল না। নীরবে অন্ধকারের মধ্যেই পথ চলতে লাগল।

গলাটা কেসে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে নিতান্ত নিরীহ ভালোমানুষের মত ফটিক আবার বলল, 'তা তোমার এত লজ্জা কিসের সুবল দা। এতো শুভ সংবাদ। এতকাল পরে বংশের দুলাল আসছে যবে এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে। বেশ জাঁকজমক ক'রে বউএর সাধ দাও একদিন। নিমন্ত্রন ক'রে খাওয়াও আমাদের।'

সুবল বলল, 'সে জন্য ভাবনা কি। আর কাউকে না করতে পারলে তোদের নিশ্চয়ই বলব ফটিক, তোকে আর তোর বউকে।'

স্বামীর দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে আরক্ত মুখে চোখ নামিয়ে নিল মঙ্গলা, কিন্তু

পরক্ষণেই অদ্ভুত একটা ভয়ে মুখ তার ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে সুবল ডাকল, 'মঙ্গলা।' পুরুষের সেই বজ্র কঠিন কণ্ঠে মঙ্গলার সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল, সেই আহ্বানের উপযুক্ত সাড়া যোগালনা মঙ্গলার মুখে। কিন্তু তাই বলে চোখ দুটি মাটির দিকেও নিবদ্ধ রাখতে পারল না। চুম্বকের মত তার চোখকে সুবলের সেই রূঢ় রুক্ষ কণ্ঠ উর্ধে আকর্ষণ করে নিল। শঙ্কিত ভয়ার্ত চোখ তুলে স্বামীর দিকে তাকাল মঙ্গলা।

সুবল আর কোন কথা বলল না। কেবল তার চোখ থেকে চরম ঘৃণা আর বিদ্বেষের দুঃসহ হিংস্র জ্বালা মঙ্গলার সেই বিবর্ণ স্তিমিত চোখ দুটির উপর বিচ্ছুরিত হতে লাগল। পাড়া ভরে আবার কানা-কানি ফিসফিসানি উঠল। চোখ ঠেরে হাসাহাসি গা টেপাটেপি চলল মেয়ে মহলে। এতদিনে বন্ধ্যাত্বের দুঃখ ঘুচল মঙ্গলার। বাঁজা বলে আর কেউ তাকে খোঁটা দিতে আসবে না। মঙ্গলার শাশুড়ী বেঁচে থাকতে শত তাবিজ-কবচ মান্তি-মানত জলপড়া তেলপোড়ায়ও যা হয়নি, এতদিন পরে সেই অসাধ্য সাধন করেছে মঙ্গলা। শাশুড়ী বেঁচে থাকলে নিশ্চই ভারি খুশি হয়ে উঠত, দু'হাত তুলে বাহবা দিত বউকে।

সন্তানসম্ভবা হয়ে এতদিন পরে রঙ্গীও এসেছে বাপের বাড়ি। খবর পেয়ে মধু গিয়ে নিয়ে এসেছে মেয়েকে। স্ত্রীকে পাঠাতে এবার আর আপত্তি করেনি অজিত। আপত্তির আর কোন কারণও নেই। প্রথম প্রথম এ অবস্থায় মায়ের কাছেই রাখা ভালো। সেবাযত্ন মায়ের কাছে যেমন হয় তেমন আর কোথাও হয় না। অজিতের মা খুড়ীরা নিজেরাই বলেছে এ কথা।

পাড়ার বউ ঝিদের কথার বাঁকা বাঁকা ভঙ্গি দেখে রঙ্গীও মুখ টিপে একটু হাসল। ও বাড়ির বরুণসার স্ত্রী চম্পা তাকে আস্তে একটু ঠেলা দিয়ে বলল, 'হাসছিস কেন লো রঙ্গী, মিছে বলছি নাকি আমরা।

খবর শুনে খুশি হয়নি তোর স্বামী, খুশি হয়নি তোর শাশুড়ী? গয়না গাঁটি কে কি দিয়েছে একটু দেখাই না আমাদের।'

কিন্তু লজ্জায় চুপ করে থাকার মত মেয়ে রঙ্গী নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে জবাব দিল চম্পার কথায়। বলল, 'গয়না গাঁটির এখনই কি চম্পা বউদি, একেবারে কোলের উপর তুলে দিতে না পারলে কি পুরস্কার মেলে। এ তো আর আমাদের বরুণদা নয়।'

পারতপক্ষে আজকাল আর বাড়ির বার হয় না মঙ্গলা। কাজকর্ম বাড়ির কাছের পুকুরেই যেমন তেমন ক'রে সেরে নেয়। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে রাঁধবার জন্য আগের মত আর ডাক পড়ে না তার, কারো অসুখবিসুখ হলে রোগীর মাবোনেরা সেবা শুশ্রূষার জন্য তাকে ডাকতে আসে না, তবু মেয়েদের ভিড় হয় মঙ্গলার বাড়িতে। কৌতুক আর কৌতুহল ভরা চোখে তাদের অনেকেই মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে থাকে, কেউ কেউ এটা ওটা প্রশ্নও করে, গৃহিণী গোছের প্রৌঢ়ারা অযাচিত উপদেশ দিয়ে যায়, এ সময় খুব সাবধানে চলাফেরা করা উচিত মঙ্গলার, শত হ'লেও পোয়াতী তো নতুন। তাদের উপদেশ আর পরামর্শের মধ্যে বাঁকা শ্লেষটাই ফুটে বেরোয়, কিন্তু মঙ্গলা কোন জবাব দেয় না, প্রতিবাদ করে না কোন রকম।

বেশ একটু জাঁকজমক করেই রঙ্গীর সাধ দিল মধু। একমাত্র মেয়ের প্রথম সন্তান হতে যাচ্ছে। একটু কিছু না করলে তার শ্বশুর-বাড়ির লোকেই বা কি বলবে, মেয়েও ভাববে বাপটা একেবারেই কৃপণ। সাধ্য মত নিকট আত্মীয় দশ পনের জনকে এই উপলক্ষে মধু নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল।

কিন্তু সাড়া শব্দ নেই সুবলের বাড়িতে। কে কি বলছে না বলছে, ভাবছে না ভাবছে সেদিকে যেন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই সুবলের। সব সময়ই অন্যমনস্ক দেখায় তাকে, মনে হয় কি একটা মতলব আঁটছে মনে মনে।

১৭

খবরটা মনোরমাই নিয়ে এল স্বামীর কাছে, 'শুনেছ, ওবাড়ির মঙ্গলাদির নাকি ছেলেপুলে হবে।'

মুরলীর চমকে ওঠাটা মনোরমার দৃষ্টি এড়াল না। জোড়া ভ্রূর মাঝখানটা কুঞ্চিত হল একটু, অদ্ভুত একটু হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। মনোরমা বলল, 'বাঃ, চুপ করে রইলে কেন, এমন চমৎকার একটা খবর আমি আনলাম, পুরস্কার টুরস্কার কিছু দাও।'

মনোরমার কথার ভঙ্গিতে মুরলীর মুখটা একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আবদার তো তোমার মন্দ নয় সোনাবউ। পাড়া ভ'রে যত রাজ্যের পরের বউয়ের ছেলেপুলে হবে, আর সেই খবর শুনে শুনে নিজের বউকে পুরস্কার দিতে হবে আমার! খবরটা নিজের হলেও না হয় বুঝতাম।'

আঘাতে আর লজ্জায় মনোরমার মুখেরও রঙ বদলাল। তারপর মৃদু কণ্ঠে মনোরমা জবাব দিল, 'খবরটা কেবল কি পরেরই?'

জবাব শোনবার জন্য মনোরমা আর সেখানে দাঁড়াল না।

তার সেই মৃদু কণ্ঠ, তার সেই চলে যাওয়ার ভঙ্গিটি অনেকক্ষণ ধরে মুরলীর যেন চোখে লেগে রইল। কেমন একটু বেদনার ছোঁয়াচ লাগল মনে। মঙ্গলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার শুরু থেকেই মনোরমা জানে। তাকে কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারেনি মুরলী, ফাঁকি দিতে খুব চেষ্টাও করেনি। কিন্তু এই নিয়ে আগের মত কোঁদল করেনি মনোরমা, মাথা-খুঁড়ে, কেঁদে, চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে আসেনি স্বামীর সঙ্গে। এতদিনে সে যেন বুঝে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে স্বামীর এই স্বভাব কোন দিন শোধরাবেনা। মান অভিমান, কান্নাকাটি, তিরস্কার গঞ্জনা সব বৃথা, সব নিষ্ফল। কিছুতেই আর বদলাবার আশা নেই মুরলীর, ভালো

হবার আশা নেই। স্বামীর কাছে নয়, এতকাল পরে ভাগ্যের কাছে যেন সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রেছে মনোরমা। আত্মসমর্পণ করে স্থির শান্ত হয়ে গেছে।

স্বামীর সামনে খাবার এনে দিয়ে মনোরমা হয়তো কাছে দাঁড়িয়েছে, মুরলী অনুরাগসূচক কিছু একটা বলতে চেষ্টা করতেই মনোরমা স'রে গেছে সেখান থেকে, 'থাক থাক, ও সব কথা আমাকে কেন, আমার নতুন সতীনকে ব'লো।'

মুরলী বিস্মিত হবার ভান করেছে, 'সতীন সতীন করেই তুমি গেলে, নতুন সতীন আবার কে!'

মনোরমা যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে আবার অদ্ভুত একটু হেসেছে, 'নামটা আমার মুখ থেকে আর নাই শুনলে। তোমার মত অত সুন্দর ক'রে মোলায়েম ক'রে তো আর বলতে পারব না কথাটা, ভারি খারাপ শোনাবে আমার মুখে। শত হলেও সতীনই তো।'

ব'লে সেখান থেকে সরে গেছে মনোরমা। এই সামান্য ঈর্ষা সামান্য খোঁচা এইটুকুই তার সম্বল, এর বেশি আর মনোরমা আজকাল এগোয় না। মুরলী অনেক বার বিস্মিত হয়ে, ক্ষুব্ধ হয়ে ভেবেছে কেন এগোয় না মনোরমা! কেন পা জড়িয়ে ধরে বলে না, 'তোমাকে আর এক পাও আমি নড়তে দেবনা?'

গলা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেন আর বলে না মনোরমা, 'আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালো বাসতে পারবেনা তুমি, আর কারো কাছে যেতে দেব না তোমাকে।'

সেই উদ্দামতার বদলে মনোরমা কেবল আজকাল সামান্য একআধটু খোঁচা দিয়েই ক্ষান্ত হয়, সামান্য একআধটু শ্লেষ আর পরিহাস করেই সে সম্পূর্ণ নীরব, সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যায়। ঝড় নেই, তরঙ্গ নেই, যেন প্রাণও নেই আর মনোরমার মধ্যে।

কিন্তু মঙ্গলার সন্তান সম্ভাবনার খবরটুকু দিয়ে যে লজ্জা আর গ্লানি, যে ঈর্ষা আর নৈরাশ্য মনোরমা আজ প্রকাশ ক'রে গেল, তার যেন তুলনা নেই। সামনে থেকে সরে গেলেও মনোরমার মুখ, মনোরমার সরে যাওয়ার ভঙ্গি মুরলীর মনের মধ্যে কেমন একটু আলোড়নের সৃষ্টি ক'রে তুলল। তবু কথাটা কি সত্যি! তাহ'লে মঙ্গলা নিজেই কেন বলল না তাকে!

সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলার মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভেসে উঠল মঙ্গলার লজ্জায় আনত দুটি চোখ, মুখের আরক্ত আভাস, মুরলীর মনে হোল মঙ্গলাও তাকে বলেছে। আর সেই প্রকাশ এমন বেদনায় নয়, এমন জ্বালা আর হতাশের ভিতর দিয়ে নয়। সে প্রকাশের ধরণ আলাদা। তাতে সুস্পষ্ট ভাষা ছিল না, ইসারা ছিল। তাতে শঙ্কা ছিল, সঙ্কোচ ছিল, কিন্তু চাপা একটা আনন্দের আভাস গোপন ছিল না। মূর্খ মুরলী তা লক্ষ্য করেনি, খেয়াল ক'রে দেখেনি। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিল মুরলী। নিন্দা করল নিজেকে।

বিষয়টা যতই সে ভাবতে লাগল, খানিক আগের বেদনা, বিহ্বলতা ততই মিলিয়ে আসতে লাগল, অদ্ভুত একটা উল্লাসে মন ভ'রে উঠল মুরলীর। এর আগে অন্য অনেক ক্ষেত্রে প্রণয়ের এ ধরণের পরিণতিতে সে বিরক্ত হয়েছে, ভীত হয়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সেই সম্ভাবনাকে মুছে ফেলতে, না হয় বহু দূরে সরে এসেছে, সরিয়ে দিয়েছে নির্মমভাবে। সন্তানের মা তো ঘরেই আছে তার, বাইরে সে কেবল চায় প্রেয়সীকে। কিন্তু মঙ্গলার খবর শুনে আজ মন অন্যরকম হয়ে গেল মুরলীর, আনন্দের একটা তীব্র অনুভূতিতে অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। একথা যদি সত্য হয় তাহলে নতুন ক'রে মঙ্গলাকে পাবে মুরলী, সম্পূর্ণ ক'রে পাবে। এ সত্যকে যদি স্বীকার করে মঙ্গলা তাহ'লে এক নিগূঢ় অচ্ছেদ্য বন্ধনে মুরলীর সঙ্গে সারা জীবনের জন্য

জড়িয়ে পড়বে মঙ্গলা; সে বাঁধন কোন দিন খুলবে না, শিথিল হবে না।

কিন্তু এই সত্যের আর একটি দিকের কথা ভেবে মুরলী হঠাৎ চমকে উঠল, শঙ্কিত হয়ে উঠল মঙ্গলার জন্য। মঙ্গলার পক্ষে এই সম্ভাবনা কেবল আনন্দের নয়, গৌরবের নয়, পরম লজ্জার পরম অপমানেরও। এর পরেও স্বামীর সন্দেহসঙ্কুল দৃষ্টির তলে কেমন করে দিন কাটছে মঙ্গলার, ভেবে শিউরে উঠল মুরলী। পাড়া ভ'রে এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, কানে কানে এই নির্লজ্জ ফিস্‌ফিসানি, চোখে চোখে এই শানিত শ্লেষ, এর মধ্যে অসহায় মঙ্গলার জীবন পলে পলে কি ভাবে দুঃসহ হয়ে উঠেছে তা যেন মুরলী চোখের সামনে দেখতে পেল। কোন নারীর জন্য এমন বেদনাময় অনুভূতি মুরলীর জীবনে এই প্রথম। এতকাল নারী ছিল তার কাছে কেবল দেহসর্বস্ব, কেবল আঙ্গিক রূপের আধার, কেবল শারীরিক আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি, কিন্তু মঙ্গলার জন্য এই দুর্ভাবনা, এই বেদনার ভিতর দিয়ে সে যেন নতুন ক'রে দেখতে পেল নারীর হৃদয়, পরিচয় পেল নিজের হৃদয়ের। অশ্রুতে উল্লাসে জীবনে এক অনাস্বাদিত রসের যেন সন্ধান পেল মুরলী। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সমস্ত অন্তরের মধ্যে সেই রসকে সে সঞ্চারিত ক'রে নিল। তারপর এক সুস্পষ্ট দৃঢ় সঙ্কল্পে আরাম-কেদারা ছেড়ে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। দ্বিধা দ্বন্দ্ব, বর্তমান ভবিষ্যৎ, পরিণাম পরিণতি কোন কথাই আর তার মনে রইল না।

আজও সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। আকাশে শ্রাবণের মেঘ ঘনতর। খাল আর নদীর জল উপচে পড়ে প্লাবিত করে দিয়েছে সমস্ত পাড়াটিকে। প্রত্যেক বাড়ির নিচে জল। কোথাও কোথাও বা উপরেও উঠে এসেছে। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি যাওয়ার জন্য বাঁশের সাঁকো বানিয়েছে গৃহস্থেরা। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে

যাওয়ার জন্যও ছোট ছোট সাঁকো তৈরী হয়েছে কোন কোন বাড়িতে।

ঘাটের ছইয়ালা বড় নৌকাখানা আর চাকর নিয়ে গঞ্জে গেছে নবদ্বীপ। দোকানের বেচা-কেনার হিসাবপত্র সেরে ফিরতে রাত হবে তার। পাড়ার ব্যবসায়ীদের অনেকেই ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় গেছে চরকুসুমপুরের হাটে। এই বর্ষার সময় কুমারগঞ্জের চেয়েও বড় হাট মেলে সেখানে। বেশি দামে বিকায় মালপত্র। সব জিনিস ছোট হাটখোলায় ধরে না। বহু জিনিসের বেচা-কেনা হয় নৌকায় নৌকায়। নদীর সাত আটটি বাঁক বৈঠা টেনে হলুদ তেল লঙ্কা নুনের জন্য পান সুপারি নিয়ে এ পাড়ার সাহারাও যায় সেই হাটে। পড়তা বেশি পড়ে বলে কষ্টটা তেমন গায়ে লাগে না। শুকনোর সময় খাটে পা, বর্ষার সময় তারা বিশ্রাম পায়, হাত দুটির পালা হয় শুরু। বৈঠা টেনে টেনে হাতের গুলি ফুলে উঠে, কড়া পড়ে যায় তেলোতে, কিন্তু কষ্টটা খুব দুঃসহ বলে মনে হয় না কারো। বাপদাদার আমল থেকে এই চলছে। পয়সা রোজগার হয় এমনি করেই।

নৌকা পাড়ায় সকলের নেই। যাদের আছে তাদের খাতির বেশি ; মানমর্যাদা, আদর এই বর্ষার সময় তাদের বহুগুণ বেড়ে যায়। নৌকার মালিক মাঝখানে বসে জল সেঁচে, হুঁকো টানে আর ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গরসের কথা বলে। আরোহীরা সমস্ত পথ বৈঠা টেনে যায় আর বৈঠা টেনে ফেরে।

নৌকা নিয়ে সুবলও যে হাটে গেছে তা মুরলী জানে। হাট বাজারে যাওয়া আজকাল কমিয়ে দিয়েছে সুবল। মঙ্গলা বেশিক্ষণ যাতে তার অনুপস্থিতির সুযোগ না পায় সে সম্বন্ধে সুবল খুব দূরের কোন হাটে গঞ্জে বড় একটা যায় না। দৈনন্দিন বাজারে যাওয়ার সময়ও আলতার মাকে রেখে যায় পাহারায়। কিছুকাল ধরে

মঙ্গলার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সুযোগ পায়নি মুরলী। এর মধ্যে অনেকবার সুবলের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সুবলের ঠোঁটে, হিংস্রতায় জ্বলে উঠেছে চোখ। সুবল যে সব জানে তা সে মুরলীর কাছে গোপন রাখেনি, গোপন রাখেনি তার প্রতিহিংসার ইচ্ছাকে। সুবল তার ওপর আজও যে বাঘের মত লাফিয়ে পড়েনি, হাতের বৈঠা কোন না কোন সময় তার মাথা লক্ষ্য করে যে মেরে বসেনি, মুরলী তাতে বিস্মিত হয়েছে। সুবলের ভাবখানা এই, মুরলী তার হাতের মুঠোর ভিতরেই যেন আছে, যে-কোন সময়ে তাকে টিপে মারলেই হোল। সত্যি সত্যি না মেরে মারবার ভয় দেখিয়ে মুরলীকে মেরে রাখার দিকেই যেন তার ঝোঁক বেশি। চলতে ফিরতে শুতে বসতে কখনো যেন মুরলী স্বস্তিতে থাকতে না পারে। প্রত্যেকটি মুহূর্তে ত্রাসে আর শঙ্কায় যেন কাটাতে হয় মুরলীকে। কোন্ পথে কোন্ পদ্ধতিতে, দিন রাতের কোন্ মুহূর্তে সুবলের প্রতিশোধ মুরলীর ওপর উদ্যত হয়ে উঠবে তা বুঝতে না পেরে মুরলী যেন সর্বদা ভীত আর বিহ্বল হয়ে থাকে।

সুবলের চলাফেরা এবং চোখমুখের ভঙ্গি দেখে নবদ্বীপও যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে তা মুরলী জানে।

সেদিন গঞ্জ থেকে ফিরে এসে নবদ্বীপ তাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়েছিল। হুকো টানতে টানতে হঠাৎ যেন একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে এসে পৌচেছে এমনি ভঙ্গিতে ছেলেকে বলেছিল নবদ্বীপ, 'এখানে থেকে আর দরকার নেই, বিনিগদিতে চলে যা।'

বিনিগদি এখান থেকে বিশ ক্রোশ দূরে, অন্য মহকুমার মধ্যে নাম করা গঞ্জ। পাইকারী দরে তামাক কিনবার জন্য ছোট একটি আড়ত আছে সেখানে। বার মাস একজন কর্মচারী থাকে নবদ্বীপের, মাল

কেনে, চালানের ব্যবস্থা করে, দরের উঠানামা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রাখে নবদ্বীপকে।

মুরলী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কেন, বিনিগদি যাব কেন!'

নবদ্বীপ জবাব দিয়েছিল, 'ব্যবসাবাণিজ্য দেখবার জন্য নয়, তোর নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য। যে-সব কেলেঙ্কারীর কথা শুনছি তাতে কোন্ দিন যে অপঘাত টপঘাতে—। তার চেয়ে বিনিগদিতে গিয়ে কিছু দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই ভালো। সুবল যে রকম গোয়ার—'

পিতা পুত্র দুজনেই পরস্পর মুহূর্তকাল অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল।

একটু চুপ করে থেকে মুরলী জবাব দিয়েছিল, 'সেজন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। অপঘাতেই যদি মরি তাতেই বা আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি কি।' ফের হুকোয় টান দিতে দিতে নবদ্বীপ শান্তভাবে বলেছিল, 'সে কথা ঠিক।'

মুরলীর ছোট ডিঙিখানা যখন প্রায় নিঃশব্দে সুবলদের ঘাটে এসে ভিড়ল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। খানিকক্ষণ কান খাড়া করে রইল মুরলী। আলতার মার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেলনা। ছোট একটা কলসী নিয়ে মঙ্গলা ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে দেখতে পেল মুরলী। আনন্দে আর উত্তেজনায় বুকের রক্ত যেন উত্তাল হয়ে উঠল।

ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল মঙ্গলা, অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'তুমি!' মুরলী বলল, 'হাঁ।'

এই দু'টি অনাবশ্যক শব্দ বিনিময়ের পর দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল, যেন পৃথিবীর আর সমস্ত কথাই তাদের কাছে নিরর্থক এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে।

একটু পরে মুরলী জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

মনে হোল মঙ্গলা যেন একটু হাসল, বলল, 'খুব ভালো।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মুরলী বলল, 'তা হ'লে যাই এবার ?'

মঙ্গলার হাসি এবার স্পষ্ট অনুভূত হোল। সুমিষ্ট তরল কণ্ঠে মঙ্গলা বলল, 'অভিমান হোল বুঝি। যাবে কেন, এসো ঘরে।'

মুরলী বিস্মিত না হয়ে পারল না। কোন দিনই এত নিঃসঙ্কোচে এমন বিনা দ্বিধায় সরাসরি তাকে ঘরে যেতে বলেনি মঙ্গলা। ঘনিষ্ঠতম পরিচয়ের সান্নিধ্যের পরেও নয়। আজ হঠাৎ এমন নির্ভীক হোল কি ক'রে মঙ্গলা, এত সাহস তার এলো কোত্থেকে!

মাটির দীপটি নিবু নিবু ক'রে জ্বলছিল ঘরের মধ্যে। মঙ্গলা সলতেটা একটু সামনের দিকে সরিয়ে এনে উজ্জ্বল ক'রে দিল।

মুরলী একটু শঙ্কিত হয়ে উঠে বলল, 'ওকি করছ ?'

মঙ্গলা অদ্ভুত একটু হাসল, 'ভয় করছে না কি তোমার! করে তো করুক। যা হবার হোক। লুকোচুরি করতে আমি আর পারব না।'

মুরলী বলল, 'লুকোচুরি করবার আর জো'ও তো নেই।'

তার দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে মঙ্গলার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। চোখ নামিযে বলল, 'লোকে যে তোমাকে খারাপ বলে সে কথা মিথ্যা নয়।'

মুরলী বলল, 'তা হবে, কিন্তু সত্যই তোমাকে আজ অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে মঙ্গলা!'

মঙ্গলা আড়চোখে একবার মুরলীর চোখের দিকে তাকাল। মুরলীর মুগ্ধ কণ্ঠ আর মুগ্ধ চোখ যেন একই কথা উচ্চারণ করছে। মঙ্গলার মনে পড়ল আর দুটি চোখের কথা। মুগ্ধতা নয়, মাধুর্য নয়, সেই দুটি চোখ থেকে কেবল দুঃসহ ঘৃণা আর বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সে আগুন তাকে এখনো দগ্ধ ক'রে চলেছে। কিন্তু আজ

আর কোন ক্ষোভ নেই মঙ্গলার, কোন দুঃখ নেই। সমস্ত জ্বালা যেন আজ তার প্রশমিত, স্নিগ্ধ হয়ে গেছে। পৃথিবীতে কেবল অগ্নিবর্ষী চোখেই নয়, কেবল ঘৃণা নিন্দা ব্যঙ্গ শ্লেষে ঘোলাটে চোখেই নয়, আরও দুটি চোখ তার জন্য রয়েছে যারা মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি আর মাধুর্যে অন্তর পূর্ণ ক'রে নেয় এমন একটি পুরুষ পৃথিবীতে আজও তার জন্য আছে।

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে থাকার পর মুরলী বলল, 'লুকোচুরি করতে আমিও চাই নে। চল, চ'লে যাই এখান থেকে।'

মঙ্গলার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল, 'চলে যাব কোথায় বলতো ?'

মুরলী বলল, 'যে কোন জায়গায়। কিন্তু এখানে আর নয়। এই নিন্দা অপমান ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যে এক মুহূর্তও আমি আর তোমাকে থাকতে দেবনা। এখানে তুমি বাঁচবে না মঙ্গলা, এখান থেকে তোমাকে আমার সরিয়ে নিতেই হবে।'

গভীর আবেগে মুরলীর গলা রুদ্ধ হয়ে এল।

কিন্তু এর জবাবে অত্যন্ত তরল লঘুকণ্ঠে বলে উঠল মঙ্গলা, 'কিসে ক'রে সরাবে বল দেখি। তোমার ওই ডিঙি নৌকায় কি দুজনে আমরা ধরব ? বড় বড় নদীনালা পার হতে পারব ওতে ক'রে ?' মঙ্গলার এই লঘু ভঙ্গিতে অত্যন্ত আহত হোল মুরলী বলল, 'যাওয়ার তোমার যদি মত থাকে মঙ্গলা, তাহ'লে ডিঙির বদলে ঘাসী নৌকার ব্যবস্থাও যে হতে পারে তা তুমি জানো। আর মনের যদি জোর থাকে, তেমন যদি তেজ থাকে মনে, তাহ'লে ডিঙি ছাড়া দু'জনে কেবল সাঁতারেও তো পারাপার হতে পারি।'

তরল এক ঝলক হাসি যেন উছলে উঠল মঙ্গলার দুই ঠোঁটে, 'না মুরলী ঠাকুরপো, তুমি পারলেও আমি পারব না। এ অবস্থায় সাঁতরাতে গেলে ডুবে মরতে হবে।'

মুরলী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর ক্ষুব্ধ আহত কণ্ঠে বলল, 'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে চাও না। তুমি ভেবেছ তোমাকে ডুবে মরতে দিয়ে আমি সাঁতরে উঠে আসব।'

মঙ্গলার তরল কণ্ঠ অকস্মাৎ ভারি গভীর শোনাল, 'ছিঃ! মুরলী ঠাকুরপো। তা নয়, অবিশ্বাস তোমাকে আর আমি এক ফোঁটাও করিনে। কিন্তু তোমার বউ রয়েচে, মেয়ে রয়েচে, কারবার বিষয় সম্পত্তি রয়েচে তোমার বাবার। কেবল আমার জন্যই এসব তুমি ছেড়ে আসবে কোন্ দুঃখে।'

মুরলী ম্লান একটু হাসল, 'নিজের জন্য একটুও আমার দুঃখ নেই মঙ্গল বউঠান, কিন্তু সব ছেড়ে আসতে তোমারই বোধ হয় দুঃখ হচ্ছে।'

হঠাৎ মঙ্গলা দুই ঠোঁটের উপর তর্জনীটা চেপে ধরে অস্ফুট স্বরে বলল, 'চুপ।'

তারপর এক মুহূর্ত কান খাড়া ক'রে থেকে বলল, 'তুমি যাও, এক্ষুনি যাও। ওরা আসছে, ওরা এক্ষুনি এসে পড়বে। খালের মুখ থেকে বৈঠার শব্দ পাচ্ছি, তুমি আর দেরি কোরো না।'

মুরলী বলল, 'আসে তো আসুক। লুকোচুরি আমারও আজ ভালো লাগছেনা মঙ্গলা। জীবন ভ'রে তো কেবল লুকোচুরিই করলাম।'

কিন্তু শেষের কথাগুলিতে মোটেই যেন কান দিল না মঙ্গলা, দ্রুত কণ্ঠে বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! শিগগির ওঠো, শিগগির। ডিঙি নিয়ে এক্ষুনি বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে চলে যাও।'

মুরলী বলল, 'না'।

'এস,' শঙ্কিত ভাবে হঠাৎ মুরলীর দুখানি হাত ধ'রে বলল মঙ্গলা,

ব্যাকুল স্বরে বলল, 'না নয় মুরলী ঠাকুরপো, মাথা খাও, কথা শোন আমার, ওঠো ডিঙি নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও।'

দু'হাত ধ'রে মুরলীকে জোর ক'রেই যেন তুলে দিল মঙ্গলা। ভেজান দরজার পাল্লা খুলে দিয়ে কাতর স্বরে ফের বলল, 'আর দেরি কোরো না, কথা শোন আমার।'

মুরলী বলল, 'কিন্তু তুমি—'

মঙ্গলা বলল, 'আমার কথা পরে বলব, শিগগির—'

ডিঙিতে ওঠে অন্ধকারের মধ্যে বৈঠার খোঁচ দিতে দিতে মুরলী ভাবল, এবার তার বাপের কথাতেই রাজী হয়ে যাবে সে। থাকবে গিয়ে সেই বিনিগদির গঞ্জে। এখানে বসবাসের সমস্ত প্রয়োজন যেন তার শেষ হয়ে গিয়েছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সশব্দে সুবলের ডিঙি এসে ঘাটে ভিড়ল। ধক ক'রে উঠল মঙ্গলার বুক।

একটু একটু বৃষ্টি শুরু হয়েছে। হাতের বড় শাল কাঠের বৈঠাখানা ঠক ক'রে দাওয়ার বেড়ায় ঠেকিয়ে রেখে ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল সুবল।

মাটির দীপ তেমনি জ্বলছে। দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েচে মঙ্গলা।

ঘরে ঢুকে সুবল আজও তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, রূঢ় কর্কশ স্বরে বলল, 'নাগর বুঝি আজও এসেছিল তোর?'

একটু ঢোক গিলে মঙ্গলা বলল, 'ও ছাড়া বুঝি আর কোন কথা নেই তোমার?'

সুবল হঠাৎ দু'হাতে মঙ্গলার দুই বাহুমূল চেপে ধ'রে দেহের সমস্ত শক্তিতে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কথার অত ঘোরপ্যাচ আমি শুনতে চাইনে। সত্যি ক'রে বল, এসেছিল কিনা?'

মঙ্গলা বলল, 'এসেছিল'।

সুবল দৃঢ় মুষ্টিতে মঙ্গলার দুটো কাঁধ ধরে রেখে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এমন স্পষ্ট কথাই চাই আমি।'

তারপর আস্তে আস্তে স্ত্রীর বাহুমূল থেকে নিজের বজ্রমুষ্টি শিথিল ক'রে এনে মঙ্গলার দিকে তাকিয়ে সুবল অদ্ভুত একটু হাসল, 'ভেবেছিলি, এখনই বুঝি গলা টিপে ধরব। খুব ভয় হচ্ছিল না?' মঙ্গলা বলল, 'গলা টিপে তুমি যে, কোন সময়ই ধরতে পার, কিন্তু তা ব'লে ভয় হবে কেন আমার?'

আগেকার সেই জেদ, সেই তেজ মঙ্গলার মনে যেন আবার ফিরে এসেছে। বাঁশের ছিটে ক'ঞ্চির মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে। সুবল তাকে ভেঙে ফেলতে পারে, কিন্তু নোয়াতে কিছুতে পারবে না।

সুবল সম্পূর্ণ ভাবে স্ত্রীকে এবার ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা যা। সাহসের বহর কতখানি সময়কালেই দেখব।'

আজও নিঃশব্দে মঙ্গলা রান্নাবাড়া সারল, খেতে দিল স্বামীকে, সামান্য কিছু নিজেও খেয়ে এল, তারপর পান মুখে দিয়ে মেঝেয় আলাদা একটা বিছানা ক'রে শুয়ে পড়ল। সুবল চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল স্ত্রীকে। সে দৃষ্টিতে কোন মোহ নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতি নেই। নিতান্ত নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে সুবল কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মঙ্গলার দিকে। কিন্তু সেই নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হোলনা। চেয়ে থেকে থেকে তীব্র ক্রোধে আর হিংসায় চোখ দুটো জ্বালা ক'রে উঠল সুবলের. জ্বলে যেতে লাগল বুকের মধ্যে। একই ঘরের ভিতর একই চালার নিচে থেকেও মঙ্গলা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে তার কাছ থেকে, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এই ভালো। কাছে থাকলেও সুবল তাকে স্পর্শ করতে পারত না। ছুঁতে গেলে গা ঘিনঘিন করত। এমন কি, ভিন্ন বিছানার মধ্যে

মঙ্গলার শিথিল অবসন্ন দেহভার সুবলের কাছে দুঃসহ রকমের অশুচি আর অপবিত্র মনে হতে লাগল। এই ঘরে তার উপস্থিতিটুকুও যেন সুবল আর সহ্য করতে পারবেনা। মঙ্গলার মৃদু শ্বাসপ্রশ্বাসেও যেন ঘরের বাতাস বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

অথচ একদিন দু'দিন নয়, আঠার বছর ধ'রে দিনের পর দিন মঙ্গলা এই ঘরের মধ্যে তার পাশে পাশে রয়েছে। তার গায়ের গন্ধে ভ'রে উঠেছে বাতাস, পায়ে পায়ে রূপার মল ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। ঘুম ভাঙবার পরেও চোখ বুজে উৎকর্ণ হয়ে সেই মলের শব্দ শুনেছে সুবল। তারপর কওয়া নেই, বলা নেই, মঙ্গলা একদিন ছিঁড়ে ফেলল সেই মলের তোড়া। বলল 'মল উঠে গেছে।' তখন কত হবে তার বয়স, দশ এগারর বেশী নয়। সুবলের মনে পড়ল সেই বয়স থেকেই কি রকম ঝগড়াই না করত মঙ্গলা। সুবলই ইচ্ছা ক'রে ঝগড়া বাধাত। আম জামের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি করত, দুধের সর চুরি করেছে বলে মিথ্যা বদনাম দিত বউয়ের। রেগে চটে মঙ্গলা অস্থির হয়ে উঠত, অস্থির ক'রে তুলত স্বামী আর শাশুড়ীকে। গায়ের রাগে চুল ছিঁড়ত নিজের, দাঁতে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলত নতুন শাড়ির পাড়। সুবল দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখত আর হাসত। আসল ঝগড়ার বদলে বানানো ঝগড়া এমন মধুর ছিল তখন। সুবলের মা বউয়ের পক্ষ নিয়ে ছেলেকে ধমকাত, বকত। আঁচলে চোখের জল মুছিয়ে দিত বউয়ের।

তারপর এমন দিনও এসেছে যখন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সুবলের মাকে চোখের জল ফেলতে হয়েছে। সুবল দিনের বেলায় মার পক্ষ নিয়ে বউকে বকত, গাল দিত অশ্লীল ভাষায়, এমন কি মার ধোরও করত কোন কোন দিন। কিন্তু রাত্রে মতিগতি একেবারে উল্টে যেত সুবলের। নিজে যেচে শতবার ক'রে অপরাধ স্বীকার

করত, গায়ে পিঠে পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিত, বউকে খুশি করবার জন্য মায়ের অসংখ্য রকম নিন্দা আর বদনাম শোনাত তার কানে কানে। সুবলের অনুশোচনার ভঙ্গি দেখে মঙ্গলা শেষ পর্যন্ত না হেসে পারত না। স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলত, 'থাক, আর পাপ বাড়িয়ো না আমার।'

আজ আর সেদিন নেই। আজ আর কোন পাপের ভয় নেই মঙ্গলার। সুবলের পৌরুষকে সে যেন দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁৎলে দিয়েছে। এত জেদ, এত স্পর্ধা মেয়ে মানুষের! ধিক্কারে গ্লানিতে সমস্ত মন ভ'রে উঠল সুবলের। ছি ছি ছি! আজ স্বামীর ঘরের মধ্যে পরপুরুষকে ডেকে আনে মঙ্গলা, তবু আড়াল রাখে চোখের। কিন্তু দু'দিন বাদে তার সন্তান যখন এই ঘরের মধ্যেই নড়ে চড়ে বেড়াবে তখন সেই আড়ালটুকুও আর থাকবে না। সুবলের চোখের সামনেই তাকে আদর করবে, সোহাগ করবে মঙ্গলা, নাওয়াবে খাওয়াবে ঘুম পাড়াবে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খাবে অসংখ্যবার, তারপর হয়তো এক সময় সুবলের কোলের মধ্যেই ঝুপ ক'রে বসিয়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসবে। বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে সুবলের, কিন্তু মুখ ফুটে একটি কথাও বলতে পারবে না, পাছে পাড়াপড়শীর কারো কানে যায়। ছি ছি ছি! এত ভীরু, এতই কি কাপুরুষ সুবল যে দিনের পর দিন নিজের ঘরের মধ্যে এই অনাচার সে সহ্য করবে, জীবন ভর এই অশুচি, অন্যের উচ্ছিষ্ট অস্পৃশ্য এক নারী দেহকে নিঃশব্দে বয়ে বেড়াবে? রক্ত কি এমনই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সুবলের, বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি এমনই অসাড় পঙ্গু হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য? অদ্ভুত এক বিদ্বেষ আর আক্রোশে হাতের মুঠি বজ্রের মত কঠিন হয়ে উঠল সুবলের, বুঝি তার চেয়েও নির্মম হয়ে উঠল হৃদয়।

ঘুম মঙ্গলার চোখেও আজ ছিল না। অন্ধকারে চুপচাপ ঘুমের ভান ক'রে শান্ত ভাবে প'ড়ে থাকলেও নানা উল্টোপাল্টা অসংলগ্ন ভাবনায় মন তার উদ্বেল হয়ে উঠছিল। কেবল আলাদা বিছানা নয়, সুবলের কাছ থেকে সে যেন সব দিক থেকেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। বছরের পর বছর এই মানুষটির সঙ্গেই যে সে একটানা ঘরসংসার করেছে তা যেন আর বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না মঙ্গলার। কোন বন্ধন নেই, কোন আকর্ষণ নেই, স্বামীর কাছ থেকে জ্বলন্ত ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছাড়া মঙ্গলা আর কিছু আশা করতে পারবে না জীবনে। যা ঘটেছে এর পর সুবল আর তাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না, বিশ্বাস করতে পারবে না, ভালো-বেসে নিজের কাছে ডেকে নিতে পারবে না। মঙ্গলা নিজেই কি ফিরে যেতে পারবে? তবু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই ঘরের মধ্যেই কাটাতে হবে মঙ্গলাকে। সুবলের দু' চোখের আগুন তাকে তিলে তিলে দগ্ধ করবে, তার প্রতিটি কথা বিষ ঢেলে দেবে কানের মধ্যে। দিন রাত ছটফট ক'রে মরবে মঙ্গলা, তবু সত্যি সত্যি মরতে পারবে না। কেন, মৃত্যু কি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর! এই জীবনের চেয়েও দুঃসহ?

কিন্তু তার মুখ না দেখেই মরবে? এতকাল ধ'রে গোপনে গোপনে যার প্রতীক্ষা করছে, মনে মনে হাজার রকমে যার গড়ে তুলেছে চেহারা, তাকে একবার চোখের দেখা না দেখেই চোখ বুজবে মঙ্গলা? কেমন হবে তার হাত পা'র গড়ন, কেমন হবে রঙ, কেমন হবে মুখের ভোল তা একবার নিজের চোখে দেখে যাবে না? কেন মরবে মঙ্গলা, কার ভয়ে, কিসের দুঃখে? সুবল না ডাকুক আর একজন তো আজ সন্ধ্যায় তাকে ডাক দিয়েছিল। ডিঙি এনে বেঁধেছিল ঘাটে। সে ডিঙিতে যে-কোন মুহূর্তেই তো উঠে বসতে

পারে মঙ্গলা, ভেসে যেতে পারে যেদিকে চোখ যায়। তারপর কোথাও না কোথাও, কোন না কোন দিন সে 'ড ঙ আর এক ঘাটে এসে ভিড়বেই। ঘাটের পারে বাঁধা হবে এমনি ঘর, আঙিনায় লাউ কুমড়োর মাচাং এমনি খাড়া হয়ে উঠবে, চার পাশে থাকবে এমনি পাড়া পড়শীর দল, তাদের মধ্যেও এমনি আদর, এমনি সম্মান আর শ্রদ্ধার পাত্রী হবে মঙ্গলা আর তাদের মধ্যেও এমনি মাতব্বরি করবে মঙ্গলার স্বামী। স্বামী! কথাটা মনে হ'তেই মঙ্গলার সারা গা যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। ছি ছি ছি, না না না, মুরলী কোন দিন মঙ্গলার স্বামী হ'তে পারে না। ভাবতে যেন কেমন লাগে, কেমন যেন বিসদৃশ শোনায় কথাটি।

কিন্তু নিজের মনোভাবে পরক্ষণে নিজেরই হাসি পেল মঙ্গলার। যত অদ্ভুত আর যত বিসদৃশই শোনাক, এর পর থেকে স্বামী বলেই স্বীকার করতে হবে মুরলীকে। কোন জানাশোনা চেনা জায়গায় তো তা সম্ভব হবে না, তার জন্য খুঁজে নিতে হবে অচেনা অজানা এক দেশ, মুখ-না-চেনা, নাম না-জানা মানুষের দেশে ঘর বাঁধতে হবে তার জন্য। ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে হবে পাছে লোকে তাদের বেশী রকম চিনে ফেলে, পাছে দু'জনের আসল সম্পর্ক তাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে সব সময়। কিন্তু সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও একদিন যদি সেকথা বেরিয়ে পড়ে, মঙ্গলার নিজের ছেলেরই যদি কানে ওঠে একদিন সেকথা।— তা হ'লে? তা হ'লেও ছেলের মুখের দিকে তাকাতে পারবে মঙ্গলা, তা হ'লেও কি ছেলে তার মুখ দেখবে, মধুর কণ্ঠে মা মা বলে ডাকবে মঙ্গলাকে? গ্লানি আর অপমানের যে কালি এখন থেকেই তার মুখে মেখে রেখেছে মঙ্গলা, এর পরেও কি সে মুখ দু' চোখ মেলে মঙ্গলা দেখতে পারবে? মুখ দেখাতে পারবে না বলে আজ মঙ্গলা

স্বামীর কাছ থেকে পালাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে আবাল্যের পরিচিত পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে, সেদিন নিজের সন্তানের কাছ থেকেই ফের পালিয়ে আসতে হবে। এই পালাবার পালা একবার যদি শুরু করে মঙ্গলা, জীবনে তা আর শেষ করতে পারবে না। তার চেয়ে এমন ভাবে কি পালানো যায় না যার শুরুতেই শেষ? এক অদ্ভুত মাদকতায় মঙ্গলার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সেই ভালো, সেই ভালো। সেখানে পাড়াপড়শীর নিন্দা অপবাদ, তেরছা চাউনি আর বাঁকা কথা নাগাল পাবে না মঙ্গলার, সুবলের অগ্নিবর্ষী চোখ মিথ্যাই তাকে খুঁজে মরবে, সকলের অলক্ষ্যে কেবল একজনের চোখ ছল ছল ক'রে উঠবে, দামী পালঙ্কে সযত্নে পাতা পুরু আর নরম বিছানায় রূপসী স্ত্রীকে পাশে নিয়ে শুয়েও তার সেই ছলছল করা চোখ থেকে জলের ধারা রাতের পর রাত নিঃশব্দে বয়ে নামবে। তার কথা ভেবে মৃত্যুতেও সুখ মঙ্গলার, মৃত্যুতেই সুখ।

'মঙ্গলা!'

সুবলের গলা শুনে মঙ্গলা চমকে উঠল। কিন্তু সাড়া দিল না। এ যেন আর কারো গলা। এমন মোলায়েম স্বরে অনেক কাল মঙ্গলাকে ডাকেনি সুবল। হঠাৎ কি হোল তার। মন না বদলালে কি মানুষ এমন ক'রে স্বর বদলাতে পারে।

আরও বার দুই ডাক শুনবার পর মঙ্গলা মৃদুকণ্ঠে সাড়া দিয়ে বলল, 'বলো।'

সুবল তেমনি শান্ত মধুর স্বরে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি?'

মুহূর্তকাল চুপ ক'রে রইল মঙ্গলা, তারপর একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'হ্যাঁ।'

সুবল মনে মনে হাসল। একবার যদি মিথ্যাচার শুরু করে মেয়েমানুষ ভুলেও সে আর সত্যের ধার দিয়ে যায় না। কারণে

অকারণে অসত্য আপনিই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তার জন্য চেষ্টা করতে হয় না, তার জন্য সচেতন থাকতে হয় না সব সময়।

কিন্তু সুবল তো মেয়ে মানুষ নয়। তাই খানিকক্ষণ তাকে একটু চেষ্টা করতে হোল, মনে মনে বেশ গুছিয়ে নিতে হোল কথাগুলি। সুবল বলল, 'আমিও ঘুমিয়েছিলাম। কিন্তু এই মাত্র অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম।'

মঙ্গলা বলল, 'কি স্বপ্ন!'

তেমন যেন ঔৎসুক্য আর আগ্রহ ফুটে উঠল না স্ত্রীর গলায়। কিন্তু সুবল ভ্রূক্ষেপ করল না, বেশ একটু উৎসাহের সঙ্গেই বলল, 'দেখলাম, তুই আর আমি আমাদের ডিঙি নৌকোয় বুড়ো শেওড়াতলায় পূজো দিতে চলেছি।'

মঙ্গলা চুপ ক'রে রইল।

সুবল বলে চলল, 'স্বপ্ন দেখব তার আর আশ্চর্য কি। মা তো মানত করেইছিলেন। পাঁচ সাত দশ ক্রোশের মধ্যে কোন দেবদেবতা আর ফকির দরবেশ তো তাঁর বাকি ছিল না। কিন্তু শেওড়াতলার বুড়োবাবার কাছে আমি নিজে যে কিছুদিন আগেও মানত ক'রে রেখেছিলাম এ কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।' মঙ্গলা আস্তে আস্তে বলল, 'কিসের জন্য ?'

সুবল মধুর ভঙ্গিতে বলল, 'আঃ, কিচ্ছু যেন জানেন না। কিসের জন্য আবার, ছেলের জন্য।'

অন্ধকারে সমস্ত মুখ মঙ্গলার আরক্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে লজ্জায় কোন কথাই বেরোল না তার মুখ দিয়ে। একটু বাদে মঙ্গলা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, 'কিন্তু তা তো তোমার এখনো হয়নি।'

'তোমার' কথাটা খট ক'রে কানে বাঁধল সুবলের। কেবল মিথ্যাই নয়, নির্মম নিষ্ঠুর সত্যও মেয়ে মানুষের মুখ থেকে অজান্তে

অনায়াসে বেরিয়ে আসে। তারা জানতেও পারে না, ভ্রূক্ষেপও করে না তাদের মুখের কথা কত তীক্ষ্ণ, আর একজনের বুকে তা কত নৃশংস ভাবে তা গিয়ে বিদ্ধ হ'তে পারে।

ঠাণ্ডা মেজাজটা আর রাখতে পারল না সুবল, কঠিন শ্লেষে জবাব দিল, 'আহা আমার না হয় নাই হোল, তোর তো হতে যাচ্ছে। এমনই বা কজনের হয়। এর জন্তও তো মানত পুজোটা আমাদের দিয়ে আসা দরকার। বিপদ আপদের কথা বলা তো যায়না।'

মঙ্গলা স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক আগের কণ্ঠের মধুরতা তাহলে ভান, ওটা কেবল সুবলের গলারই, মনের নয়। এরপর এরকমই হবে, এমনি চলবে। বিনা কারণে কথায় কথায় সেই কথাটা খুঁচিয়ে তুলবে সুবল, একমুহূর্তও সে স্থির থাকতে দেবেনা, ভুলে থাকতে দেবেনা। তবুও কি বেঁচে থাকতে হবে মঙ্গলাকে ? অসহায়ের মত মুখ বুজে প্রতি-মুহূর্তে এমনি করে সবকিছু সহ্য করতে হবে তাকে ? সুবল তাকে অনাহারে রাখবেনা, কিন্তু প্রতি গ্রাসের সঙ্গে তার এই কুৎসিত শ্লেষের বিষ মিশিয়ে দেবে। সুবল তাকে ঘরেই ঠাঁই দেবে, মুখ ফিরিয়ে নেবেনা, বরং রোজ দুবেলা তার মুখোমুখিই দাঁড়াবে মঙ্গলার মুখে থুথু ছিটিয়ে দেওয়ার জন্ত। মঙ্গলা মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবেনা, একটুও আপত্তি করতে পারবেনা, কারণ অপরাধ তারই, আর সেই অপরাধের জন্ত দুঃসহ শাস্তি জীবন ভর স্বামীর কাছ থেকে তার মাথা পেতে নিতে হবে। এর পরও কি বেঁচে থাকতে চায় মঙ্গলা, বেঁচে থাকতে পারে! কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবল মঙ্গলা, তারপর তার কণ্ঠে যেন অপূর্ব এক উৎসাহের জোয়ার নেমে এল।

মঙ্গলা বলল 'ঠিক বলেছ, বিপদ আপদের কথা কিছু বলা যায়না, ছেলে হওয়ার সময়ও তো মরে যেতে পারি, বেশি বয়সে এ সব হলে নাকি তার খুবই আশঙ্কা থাকে। বাবা যখন স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন

চল দুজনে মিলে একটা ডাব-নারকেল অন্তত দিয়ে আসিগে সেখানে, ঘটা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে পুজোটা না হয় পরেই দিয়ো।'

ঠোঁট টিপে মঙ্গলা নিজের মনেই অদ্ভুত একটু হাসল।

কথাটা সুবলই তুলবে তুলবে করছিল। কিন্তু মঙ্গলা নিজেই কথাটা পাড়ায় সে ভারি কৌতুক বোধ করল। ওষুধে ধরেছে তা'হলে। মৃত্যুর ভয়ই মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে।

সুবল জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাল। সারারাত টিপ টিপ করে বৃষ্টি নেমেছে। বাতাস বয়েছে উল্টোপাল্টা। কে জানে কোথাও হয়তো তুমুল ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, সাইক্লোন হচ্ছে হয়তো, বন্যায় ভেসে যাচ্ছে না জানি কতদেশ। সে বন্যা, সেই ঝড় এখানেও কি আসতে পারল না। কেবল কি তা সুবলের বুকের মধ্যেই তোলপাড় করতে থাকবে, বাইরে একবারও তার দেখা মিলবেনা।

কি একটু চিন্তা করে সুবল বলল, 'কিন্তু বাইরে এখনো টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে শুনতে পাচ্ছিস? সারারাত ধরে এমনি চলছে, তবু আকাশটা পরিষ্কার হোলনা।'

মঙ্গলা বলল, 'ও, ওইটুকু বৃষ্টিতে কি হবে। ওর জন্য ভেবনা, একটু বাদেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

সুবল বলল, 'তাহলে তাই চল্। ছইটা তুলে নিচ্ছি ডিঙিতে। ছইয়ের তলায় দিব্যি আরামে বসে বসে যাবি। বৃষ্টির একটা কোঁটাও গায়ে লাগবেনা। এ আমার নিজের হাতের বাঁধা ছই। সেই ভালো মঙ্গলা। স্বপ্ন যখন দেখলাম, বুড়োকে আজই গিয়ে প্রণামটা সেরে আসি, এরপর কবে সময় হয় না হয়, দোষ ফুরিয়ে রাখা ভালো। রাত প্রায় ভোর ভোর হয়ে এল। বেতীবাগের শেওড়া তলা আর কতটুকু পথ। মাত্র দুটো বাঁক ঘুরলেই তো গিয়ে পৌঁছব। তারপর রোদ উঠতে উঠতে ফিরে আসব দুজনে, কেউ জানতেও পারবেনা।'

মঙ্গলারও মনে হোল, ঠিকই বলেছে সুবল। এই যথার্থ সময়। কেউ জানতে পারবে না, কারো চোখে পড়বার ভয় নেই। তারপর যা হয় হবে, মঙ্গলা আর দেখতে আসবেনা।

বৃষ্টির জলে ডিঙি প্রায় ডুবুডুবু হয়ে রয়েছে। সুবল উঠে গিয়ে জল সেঁচে ফেলল নৌকার। ছোট ছই খানা মাথায় করে বয়ে নিয়ে ডিঙির ওপর রেখে দিল, মঙ্গলাও ততক্ষণে তৈরী হয়ে নিয়েছে। বাসি কাপড় ছেড়ে পরেছে সেই লাল পেড়ে গরদের শাড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে মোটা রেখায়, কপালে সুগোল করে দিয়েছে আলগা সিঁদুরের ফোঁটা। ছোট্ট পিতলের রেকাবিতে একটু রক্তচন্দন, কয়েকটা ঝুমকো জবা, আর বেলপাতাও তুলে নিয়েছে, শেওড়াতলায় পূজা দিতে যাচ্ছে সে স্বামীর সঙ্গে। ভরা কলসীটির সামনে দাঁড়িয়ে মঙ্গলা একটু ইতস্তত করল। কোন না কোন ছলে এটাও কি সঙ্গে নেবে? পরে ভাবল দরকার নেই। এই ভরা বর্ষায় যে স্রোত চলেছে খালে তাতে হাতীকে পর্যন্ত ভাসিয়ে নিতে পারে। শেওড়াতলায় যেতে একটা ঘোলাজলের ঘূর্ণিও পড়বে পথে, মঙ্গলার মনে পড়ে গেল। তাতেও যদি না কুলোয় শেষ সম্বল মঙ্গলার মনের জেদ আর শাড়ির আঁচল তো সঙ্গেই রইল।

সুবল মঙ্গলার দিকে আড়চোখে একটু তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। নিতান্ত মন্দ দেখাচ্ছে না তো? তা দেখাবেই বা কেন। বেশেবাসে ভুলাবার স্বভাবটা ওরা মরলেও ছাড়তে পারে না। এই ওদের আনন্দ, এই ওদের নেশা। কোন একজনকে ভুলাতে পারলেই ওরা খুশি। সে দেবই হোক আর দুর্বৃত্তই হোক। কিন্তু সুবল আর ভুল করবে না।

কোমর থেকে বড় একটা চাবি বের ক'রে সুবল নৌকোর তালা খুলল, শিকলটা সশব্দে ফেলে দিল নৌকার খোলের মধ্যে। ঝন্‌ঝন্

শব্দে একটু যেন চমকে উঠল মঙ্গলা, তারপর নিঃশব্দে গিয়ে বসল ছইয়ের ভিতর। ডাঙায় বৈঠা দিয়ে জোরে একটা খোঁচা দিল সুবল, ডিঙি নৌকা ন'ড়ে উঠে বেশি জলের দিকে ভেসে পড়ল।

কেবল ভোব-ভোর হয়েছে। বৃষ্টি আর পড়ছে না। কিন্তু আকাশের এখনি অবস্থা যে-কোন সময় প্রবল ধারায় বৃষ্টি নেমে পড়তে পারে। সারাটা পাড়া যেন সংজ্ঞাহীনের মত পড়ে আছে, কোন সাড়াশব্দ নেই। চারদিকে থই থই করছে জল, মাঝে মাঝে এক একখানা বাড়ি সেই জলের মধ্যে টিলার মত কোন রকমে ভেসে রয়েছে। অনন্ত সমুদ্রে যেন শান্ত ঘুমন্ত এক একটি দ্বীপ। অনন্ত মাষ্টারের প্রাইমারী স্কুলের 'সরল ভূ-বিজ্ঞানের' কথা সুবলের মনে পড়ল। কি চমৎকার ছিল সেই পাঠশালার ছেলে-বেলার দিনগুলি। কেবল ভূ-বিজ্ঞানটা সুবলের ভালো লাগত না, কিছুতেই মুখস্থ হ'তে চাইত না সংজ্ঞাগুলি। মানচিত্রের সামনে বেত হাতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষার সময় বেতের ডগার মতই থর থর ক'রে কাঁপত, একটা নগরও চোখে পড়ত না, সমুদ্রের মধ্যে সবগুলি দ্বীপ একসঙ্গে জড়িয়ে যেত, হারিয়ে যেত। হাতের বেত কেড়ে নিয়ে মাষ্টারমশাই পিঠের উপর দিয়ে সপাসপ চালাতেন। সুবল ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত।

এখন কিন্তু আর ভুল হয় না, এখন প্রত্যেকটি দ্বীপই সুবল স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে। এখন দ্বীপ দেখাতে বললে দেখিয়ে দেবে সে এখানকার মানুষগুলিকেই। দেখাবে নিজেকে, দেখাবে মঙ্গলাকে, দেখাবে মুরলী আর নবদ্বীপকে। সবাই স্বার্থপরতায় ঘেরা, স্বার্থ চিন্তায় এক থেকে অন্যে বিচ্ছিন্ন। সে ভাবছে নিজের কথা, মঙ্গলা ভাবছে তার কথা। এই ভাবনার সমুদ্র সাঁতরে একজন আর একজনকে ছুঁয়ে আসতে পারে না, ছুঁয়ে আসবার প্রবৃত্তিও নেই

সুবলের। কত কাছে রয়েছে মঙ্গলা, তবু কত দূরদূরান্তরে। দুজনের মাঝখানে থই থই করছে জল, তল নেই তার।

স্রোতের বেগ বেড়েছে নদীতে। বাতাসের ঝাপটা আসছে উল্টোপাল্টা। এখানেই হাল ছেড়ে দেবে নাকি সুবল। নৌকার মুখ চড়কিবাজির মত কেবল ঘুরবে আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে জল উঠবে ডিঙিতে, গাঙের সমস্ত জল তার নৌকার খোলে এসে ঢুকবে। ভয়ে কি চেঁচিয়ে উঠবে মঙ্গলা। মুখে হাতখানা কিছুক্ষণ চেপে রাখলেই হবে। তারপর ডুবন্ত ডিঙির ছইয়ের ভিতর থেকে শত চেষ্টাতেও আর মঙ্গলা বেরুতে পারবে না। যত ছটফট করবে, যত হাত পা নাড়বে, চুলেতে শাড়ীতে তত জড়িয়ে যাবে। কিন্তু এখানেই নয়, এখনই নয়, আসুক সেই ঘোলা জলের ঘূর্ণি। সেখানে আপনা থেকেই সব হবে। নিজের হাতে সুবলকে আর কিছুই করতে হবে না।

মঙ্গলাও অপেক্ষা করছে সেই আবর্তের। বেতীবাগের মেলায় নৌকোয় ক'রে যাতায়াতের পথে কতবার দেখেছে এই সর্বনাশা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীকে। অন্যসব মেয়েরা দেখে চোখ ফিরিয়েছে, কিন্তু ঝুঁকে পড়ে অপলক চোখে ঘূর্ণির দিকে চেয়ে রয়েছে মঙ্গলা। চেয়ে চেয়ে দেখেছে ঘূর্ণ্যমান জলের কুণ্ডলী। যেন নীচে কেউ একজন অসহ্য যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করছে। কি হয় দেখবার জন্য মঙ্গলা কোন বার বা ফেলে দিয়েছে একটা সুপারি, কোন বার বা একটা নারকেল। দুইই পাকে পাকে জলের টানে কোথায় অতলে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তারপর বহুদূরে গিয়ে হয়তো ফের ভেসে উঠেছে। মা গঙ্গা, মঙ্গলাকে যেন আর ভেসে উঠতে না হয়।

সুবলও কি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়বে তার পিছনে, বোধ হয় না। খানিকক্ষণ সে হয়তো অবাক হয়েই তাকিয়ে থাকবে, কি ঘটল কিছুই বুঝে উঠতে পারবে না। ততক্ষণে একেবারে অথৈ জলে তলিয়ে গেছে

মঙ্গলা। তারপরেও কি সুবল লাফ দিয়ে পড়বে তাকে টেনে তুলবার জন্য? তার ওপর এখনো এতই কি দরদ আছে সুবলের যে তার জন্য নিজের জীবনকে সে বিপন্ন করতে যাবে? বয়ে গেছে সুবলের। সুবল বরং রেহাই পাবে, নিষ্কৃতি পাবে চিরদিনের জন্য। কে জানে এই জন্যই সুবল তাকে টেনে এনেছে কি না। না হলে দেবদ্বিজে হঠাৎ সুবলের ভক্তি এত প্রবল হয়ে উঠল কেন যে এই বৃষ্টি বাতাসের মধ্যে শেওড়াতলার বুড়ো বাবাকে প্রণাম করবার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে এমন ছোট্ট ডিঙিতে সে ভেসে পড়ল। এমন ভক্তি তো কই তার আর কোন দিন দেখা যায়নি। কে জানে আরো কি মতলব আছে সুবলের। কে জানে আরো কি ভেবেছে সে, মঙ্গলার মত একই কথা সে ভাবছে কিনা তাই বা কে জানে। কিন্তু যে যাই ভাবুক, যার যত রকম মতলবই থাক সব মতলবকে আজ ভণ্ডুল ক'রে দিয়ে যাবে মঙ্গলা। চিরকাল নিজের মতলব নিজের জেদ সে বজায় রেখেছে, আজও তাই রাখবে। তার ওপর দিয়ে আর কাউকে সে জিততে দেবে না।

ঠক্ করে কি একটা শব্দ হোল হঠাৎ। চমকে উঠল মঙ্গলা, চমকে উঠল আত্মমগ্ন সুবল। দুজনেই সমস্বরে বলল, 'কি হোল।' তারপর নিমেষের মধ্যে সুবল বুঝতে পারল ব্যাপারটা। তলা ফুটো হয়ে নৌকার মধ্যে জল উঠছে বগ বগ ক'রে। না বুঝবার কিছু নেই। এদিক ওদিক না দেখেই নৌকা বেয়ে চলেছিল সুবল। চোখা খুঁটা জলের মধ্যে উঁচু হয়েছিল। শুকনোর সময় এদিক দিয়ে যে সাঁকো বাঁধা হয়েছিল খালের এপার ওপারে বোধ হয় তারই কোন জলমগ্ন খাড়া খুঁটির উপর উঠে পড়েছিল নৌকা। গাব আর আলকাতরার পোঁচ লাগালেও ডিঙির বহুকালের জীর্ণ তক্তাগুলি সে খোঁচা সহ্য করতে পারেনি।

দু'হাতে বৈঠা টেনে পারের কাছে আসতে না আসতেই ডিঙি

প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে পড়ল। কত বড় ছেঁদা হয়েছে কে জানে। নৌকার সমস্ত খোলটা জলে ভরে গিয়েছে, পাটাতনের তক্তাগুলো ভাসছে তার উপর। পিছনের শাড়ী ভিজে উঠেছে মঙ্গলার, আর হয়তো এক মুহূর্তও তর সইবে না। ছইয়ের ভিতর থেকে কোন রকমে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে মঙ্গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল সুবলকে, অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, 'ওগো বাঁচাও।'

অনেককাল পরে সুবলের সর্বাঙ্গ যেন আবার শিউরে সাড়া দিয়ে উঠল, কিন্তু মুখে কোন কথা ফুটল না।

বাতাসের ঝাপটা তেমনি উল্টোপাল্টা বয়ে চলেছে। স্রোতের টানে নৌকা কিছুতেই ঠিক রাখা যাচ্ছে না, এই ডুবন্ত নৌকাকে পারে নিয়ে যাওয়ার কোন আশাই আর নেই। বৈঠা ফেলে দিয়ে মঙ্গলাকে সুবল আঁকড়ে ধরল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন, সাঁতার তো একটু একটু জানিসই। আমার পিঠে সামান্য একটু ভর দিয়ে থাকতে পারবি না খানিকক্ষণ। এটুকু সাঁতরে যেতে কত সময়ই বা লাগবে।'

মঙ্গলা কোন কথা বলল না। আঁঠার মত সে লেগে রয়েছে সুবলের দেহের সঙ্গে। সুবল ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। জলের মধ্যে মানুষের ভার কমে যায়—এমন কি গর্ভিনী নারীকেও মনে হয় সোলার মত হালকা।

এই লেখকের অন্যান্য বই

অসমতল

হলদে বাড়ি

উল্টোরথ